পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

রাজনীতিক, কূটনীতিক ও আইনজ্ঞ কামরুদ্দীন আহ্‌মদের জন্ম ১৯১২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার ষোলঘর গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বিএ ও এম এ পাস করে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। তরুণ বয়সে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেন। মুসলিম লীগের সামন্ত প্রভাবিত ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণ-তুর্কিদের একজন ছিলেন তিনি। পাকিস্তানোত্তরকালে এদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে গণ-আজাদী লীগ গঠন ও ১৯৪৮ সালে ওয়ার্কার্স ক্যাম্প আয়োজনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়েও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ১৯৫০-এর দশকে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। জড়িত ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গেও। কূটনীতিক হিসেবে কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার ও মায়ানমারে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। স্বাধীনতোত্তরকালে ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর *A Scocio Political History of Bengal*, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ* (২ খণ্ড), *বাংলার এক মধ্যবিত্তের কাহিনী* প্রভৃতি বইগুলি আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।
মৃত্যু : ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ ঢাকায়।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

www.nagorikpathagar.org

অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলা হয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা ছাত্রের জন্য কামরুদ্দীন আহ্‌মদের A Socio Political History of Bengal বা তার বঙ্গানুবাদ *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। বিশ শতকের শুরু থেকে ষাট দশক পর্যন্ত এতদ্‌ঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের এমন বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ আর লিখিত হয়নি বললেই চলে। যে কাল-খণ্ডটিকে লেখক এখানে উপস্থাপন করেছেন বহুলাংশে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী, অনেক ঘটনার সাক্ষী, এমনকি শরিকও। বর্ণনার পাশাপাশি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঘটনার মূল্যায়ন বা বিচার-বিশ্লেষণও করেছেন। তবে লেখকের মতামত বা সিদ্ধান্ত কোথাও রচনার বস্তুনিষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ন করেনি। গতানুগতিক বা অন্যান্য ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস পুস্তকের সঙ্গে তুলনায় এ-বইটিকে যা বিশিষ্টতা দিয়েছে তা হল লেখকের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমগ্রতাবোধ। লেখকের নিজের কথায় "আমি চর্চিত-চর্বণ করিনি। আমি নভোচারীর মত চাঁদের উল্টো দিকের রূপ[ও] উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চাঁদ সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তার সাথে নভোচারীদের দেখা চাঁদের চেহারার কোন মিল নেই বলেই নভোচারীদের দেখা চাঁদ মিথ্যে আর যারা চাঁদ সম্বন্ধে কল্পনার ফানুস এঁকেছেন তাদের কথা সত্য—একথা বলা যায় না।" সকল শ্রেণীর পাঠককে যা অতিরিক্ত আকর্ষণ করবে তা হল লেখকের সরল, নিরলঙ্কার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি।

মাঝে দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকার পর বইটির এই পুনঃপ্রকাশ রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ও আগ্রহী পাঠকদের এক বড় অভাব পূরণ করতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

ISBN 984 410 297 9

www.nagorikpathagar.org

পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি

[The Social History of East Pakistan গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

মাওলা ব্রাদার্স

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৭০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাঁধন কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 297 9

PURBA BANGLAR SAMAJ O RAJNITI : by Kamruddin Ahmad. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Two Hundred Fifty only.

www.nagorikpathagar.org

কৈফিয়ত

এক

বন্ধুবান্ধব ও পরম হিতৈষীদের একান্ত অনুরোধে আমার পূর্ব-প্রকাশিত ইংরেজি বই 'The Social History of East Pakistan-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদে ভূমিকাটি বাদ দেয়া হয়েছে। বাংলা সংস্করণের কলেবর ছোট করে কম মূল্যে বইটি যাতে পাঠকসাধারণের ক্রয়শক্তির মধ্যে রাখা যায়—তারই জন্যে এ ব্যবস্থা। ইংরেজি সংস্করণ পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করেছে আশাতীতভাবে। আশা করি, বাংলা সংস্করণও তেমনি সমাদর লাভ করবে।

বর্তমান শতাব্দীতে রাজনীতি এবং সমাজের উপর তার ছায়াপাত আমি যে-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, তা-ই সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেছি। ধরাবাঁধা নিয়ম ও বিশ্বাস আমি অনুকরণ করিনি। কারণ, অনেক রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে পূর্বের লেখকেরা যা লিখেছেন, তার সঙ্গে আমার দেখা ঘটনাপুঞ্জের কোনো মিল নেই। এর ফলে কোনো কোনো সমালোচক আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছেন সেসব কথা, যা তাঁরা গতানুগতিক ইতিহাস-লেখকের পুস্তকে পাঠ করেছেন এবং সেগুলিকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, আমার পুস্তকের অনেক তথ্য ভ্রান্তিপূর্ণ। কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে চেষ্টা করেননি যে, আমি চর্বিতচর্বণ করিনি। আমি নভোচারীর মত চাঁদের উল্টো দিকের রূপ উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চাঁদ সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, তার সাথে নভোচারীদের দেখা চাঁদের চেহারার কোনো মিল নেই বলেই নভোচারীদের দেখা চাঁদ মিথ্যে আর যারা চাঁদ সম্বন্ধে কল্পনার ফানুস এঁকেছেন তাঁদের কথা সত্য—একথা বলা যায় না। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়ার থেকে কিট্‌সের মতো মহাপুরুষগণ চাঁদ সম্বন্ধে যা ভেবেছেন, তাকে আজ আর কেউ চাঁদের বাস্তব ছবি বলে স্বীকার করবেন না।

www.nagorikpathagar.org

দুই

এই বইখানির ইংরেজি সংস্করণ সম্বন্ধে সমালোচকদের অভিমত এই যে, বইখানার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়-বিশ্লেষণ। অনুবাদে অনেকাংশ বাদ দেয়ার ফলে সে দৃষ্টিকোণটি তেমন পরিস্ফুটিত হয়নি। বাংলা সংস্করণের জন্যে তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। তবু যতটা সম্ভব মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাহত করা হয়নি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত সকল বই মুসলিম লীগপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা ; তাই এই বইটিতে বিষয়-বিশ্লেষণ স্বাভাবিকভাবেই নূতন মনে হবে পাঠকের কাছে।

যাঁরা অখণ্ড ভারতবাদী, তাঁরা তদানীন্তন সমাজবিকাশে মুসলিম বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভাবধারার যে ভূমিকা ছিল তাকে উপেক্ষা করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। আর যাঁরা মুসলিম বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে বিচার করেছেন, তাঁরা তদানীন্তন সমাজের অগ্রগমনের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহগুলো, সন্ত্রাসবাদ, মানবতাবাদ, বুদ্ধি-মুক্তি আন্দোলনসমূহের যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছেন। কাজেই আমার মনে হয়েছে যে, সকল দিক থেকেই বাংলাদেশের বর্তমান শতাব্দীর ঘটনা-বিশ্লেষণ হয়ে পড়েছে আংশিক সত্য। এ ধরনের বিশ্লেষণের ক্রটিগুলিকে মূলধন করে আধুনিক মুসলিম বুর্জোয়া চিন্তানায়করা দেশ ও দশকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁরা যা বলেন—সেটাই একমাত্র সত্য। আমি চেষ্টা করেছি—পূর্ববাংলার সমাজবিকাশের একটি সত্যরূপ ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে। আলোচ্য বইখানিতে যেহেতু মানবতাবাদী বিশ্লেষণ অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেহেতু বইখানা শুধু তদানীন্তন সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ নয়, শুধু বিভিন্ন মতবাদের বা আদর্শের বিশ্লেষণ নয়, অথবা শুধু বুর্জোয় জাতীয়তাবদী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের চিত্রণও নয়। তদানীন্তন সমাজের কাঠামোকে ভিত্তি করে সেদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন যে বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছিল তার বিশ্লেষণ্ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে এই সমাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মানসক্ষেত্রে যে প্রতিফলন হয়েছে, তার বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচনার ভিত্তি হিসাবে এই বইখানি যদি গৃহীত হয় এবং পাঠক ও তাত্ত্বিকদের আরও সমালোচনার মাধ্যমে এই বইয়ের সিদ্ধান্তগুলি যদি আরও সুনির্ণীত হয়, তবে লেখকের ইংরেজি পুস্তক 'The Social History of East Pakistan'-এর বঙ্গানুবাদ সার্থক হয়েছে বলে লেখক মনে করবেন।

অনুবাদে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ না দিলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সবাইকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব মুখলেছুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ফয়েজুন্নেছা বেগমের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হবে।

কামরুদ্দীন আহ্মদ

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

ইতিহাসের সার্থকতা তখনই যখন তার সাহায্যে সমাজের বাহ্যিক রূপরেখাগুলি আমাদের বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা তার কাছে পাই উপায় ও উপকরণ। Soren Keirkegard-এর অভিমতে "জীবনকে উপলব্ধি করা সম্ভব কেবল অতীতের পৃষ্ঠা থেকে, কিন্তু তাকে অতিবাহিত করার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পানে।"

পূর্ব পাকিস্তান অথবা পূর্ববাংলার ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না ; আমাদের জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস লেখারও কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, কিন্তু মানব-ইতিহাসের চিরন্তন গতির প্রতি আমার কৌতূহলই আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে তার গুরুত্বপুর্ণ ঘটনাবলীকে যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট করার জন্যে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানবসমাজ এগিয়ে চলেছে বিরুদ্ধবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এ দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সমাজ অবিরাম অগ্রসর হতে বাধ্য সুসঙ্গতির দিকে। আমার প্রচেষ্টা হবে আমাদের সমাজের উপর ইতিহাস ও রাজনীতির ভাবকে বিশ্লেষণ করা।

পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাকে বাঙালিদের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। কারণ, কোনো জাতির ইতিহাসকে রাজনীতি-বিবর্জিত করা কঠিন, বিশেষ করে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাঙালিদের। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশের উপর রচিত প্রায় সমস্ত পুস্তকে সামাজিক পরিবেশ নামমাত্র স্থান পেয়েছে, ইতিহাসের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে ঐ রীতির পরিবর্তন শ্রেয় বলে আমার বিশ্বাস। ঐতিহাসিক Toynbee-এর মতে "ইতিহাস পর্যালোচনায় যা বুদ্ধিগ্রাহ্য একক মাত্রাখণ্ড (Unit), তা কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অথবা সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানবজাতিও নয়, তা হচ্ছে মানুষ নিয়ে গঠিত কতগুলি সমষ্টি, যাকে আমরা সমাজ আখ্যা দিয়েছি।"

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ইতিহাসের এলাকার বিষয়ে আমি বরং উদ্ধৃতি দেব বিখ্যাত সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা Trevelyan থেকে : "সামাজিক ইতিহাস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে শুধু যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন করে তা-ই নয়, তার রয়েছে নিজস্ব সুনিশ্চিত মান, স্বাতন্ত্র্যসূচক সম্পর্ক। এর উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা যেতে পারে দেশের অধিবাসীদের অতীত যুগের দৈনন্দিন জীবন বলে। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরস্পরের মধ্যকার মনুষ্যোচিত এবং অধিকন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পরিবার এবং গৃহস্থালি-জীবনের প্রকৃতি, জীবনের এই সাধারণ কারণ থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি এবং ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, শিক্ষা এবং চিন্তার সদাপরিবর্তনশীল রূপ।" অনেক সামাজিক ইতিহাস লেখক অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত নন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক ইতিহাস হল সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস এবং তার লক্ষ্য কোনো একটি বিশেষ সমাজের জীবনের ধারার মধ্যে সীমিত নয়।

বর্তমান শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কালেরও উপর যে-ব্যক্তি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁর পক্ষে নির্লিপ্ত মন বজায় রাখা সম্ভব নয়। তবু আমি অবশ্যই চেষ্টা করেছি বিষয়মুখী হতে। কারণ আমি জানি, আমি হয়তো ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের জন্যে নজির হয়ে পড়ব। অর্ধ দশকেরও বেশি কাল রাষ্ট্রদূতের চাকুরি উপলক্ষে দেশের বাইরে আমার অবস্থিতি আমাকে অন্তর্দর্শন এবং বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে। আমার কৌতূহল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলাতে সীমিত হলেও, ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাসের যেসব অধ্যায়ের প্রভাব বাংলার জীবনের উপর পড়েছে, তাঁদের উল্লেখ না করে আমি পারিনি। যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক কর্মী এখনও জীবিত, তাঁদের মধ্যে যে কয়জনের নাম না করলেই নয় তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য কারোর নাম ইচ্ছাপূর্বক উল্লেখ করিনি। আমি আশা করি, আমি সত্য ঘটনা এবং ব্যক্তি-চরিত্রের যে অকপট বিশ্লেষণ করেছি, তার জন্যে কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না ; কারণ, আমি তা করেছি সৎ অভিপ্রায়েই।

প্রীতি কুটীর
৫৪৩/এইচ, রোড নং ১৩
ধানমণ্ডি, ঢাকা ২

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

www.nagorikpathagar.org

বিষয়-নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বাংলাদেশ ২৩

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পাকিস্তান আন্দোলন ৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রথম দশক : পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবন ৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশক : পূর্ববাংলার সামাজিক বিবর্তন ১৩৭
শিল্পায়ন ও নাগরিকীকরণের প্রভাব ১৩৯
পূর্ববাংলার গ্রামের মেহনতি মানুষের বিবর্তন ১৪৪
পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের আজাদি উত্তর মনস্তত্ত্ব ১৪৯
সামাজিক বিবর্তন ও আইনের প্রতিক্রিয়া ১৫৪
পূর্ববাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ১৬২
নতুন সমস্যা ১৬৩
আইয়ুব সরকারের দশ বৎসর—সাধারণ ফলাফল ১৬৫
ভারত-পাকিস্তান বিরোধ ১৬৭
বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা ১৬৮
ব্যবসায়ে বাঙালি মুসলমান ১৭০
শোষক ও শোষিতের দার্শনিক ভিত্তি ১৭০
শিল্পায়নের সামাজিক সমস্যা ও জীবনের নতুন গতিধারা ১৭২
দ্বিতীয় দশকের শিক্ষাব্যবস্থা ১৭৫

পরিশিষ্ট

(ক) ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোরে গৃহীত মুসলিম লীগের প্রস্তাব যা পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে পরিচিত—১৭৮

(খ) ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট পাকিস্তান গণ-পরিষদে কায়েদে আযম এম. এ. জিন্নাহ্ সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ—১৭৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ

[১৯০০—১৯১৯]

১৯০০ সালের প্রারম্ভেই ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারা হলেন দু'দলে বিভক্ত। সৃষ্টি হল উদারপন্থী আর চরমপন্থী দু'টি দলের। ১৮৭৯ সালে আমদানি রফতানির উপর শুল্ক রহিত করে তার পরিবর্তে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর ১৮৯৫ সালে শতকরা পাঁচ টাকা হারে যে আবগারি কর ধার্য করা হল, তাকে বিবেচনা করা হল ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের প্রতি উলঙ্গ পক্ষপাতিত্ব বলে। শাসনবিভাগের ভারতীয়করণ ছিল আর একটি গোলমেলে বিষয়, যাকে উপলক্ষ করে মধ্যবিত্ত সমাজ ও সরকারের মধ্যে সৃষ্টি হল বিভেদের। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে লর্ড রিপনের সংস্কারমূলক ব্যবস্থায় উৎসাহিত হল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিশেষ করে ইলবার্ট বিল উপস্থাপনের জন্যে। কারণ এর দরুন বাংলাদেশে ভারতীয় এবং ইংরেজ বিচারপতিরা হলেন একই পদমর্যাদাভুক্ত।

এই সময়ে লর্ড কার্জন ভাইসরয় নিযুক্ত হলেন। কার্জনের দৃষ্টিতে ব্রিটেন ছিল ভারতের অতীত কৃষ্টির রক্ষক আর ভবিষ্যতের গুরু। ১৯০৪ সালে পাশ হল বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইন, অসংখ্য বেসরকারি কলেজগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণকে আরও জোরদার করার জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজ এই আইনকে দেখল সন্দেহের দৃষ্টিতে। ক্রমে ক্রমে তাদের প্রতিবাদ হয়ে উঠল অধিকতর মুখর। কোনো কোনো নেতার মনে হল—এই আইনের প্রতিবাদ করা হবে আইনানুগ ; অনেকে চিন্তা করতে লাগলেন অশাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের।

ব্রিটিশরাজ অতি সহজেই এই মনোভাব আঁচ করতে সক্ষম হলেন এবং লর্ড কার্জন সিদ্ধান্ত করলেন তদানীন্তন অতি বৃহৎ বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য আসাম ও পূর্ববঙ্গকে একত্র করে নূতন আর একটি প্রদেশ সৃষ্টি করার।[১] ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ ব্রিটিশরাজের এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা করার

---

১ ১৮৫৩ সালে স্যার চার্লস গ্রান্ট বাংলাকে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলাদেশ হতে পৃথক করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। ঠিক হল, মুসলমানদের এ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হবে। লর্ড কার্জন ঢাকায় এলেন মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বিশেষ করে স্যার সলিমুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে এবং তাঁদের দ্বারা তাঁর পরিকল্পনাকে গ্রহণ করাবার জন্যে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "নূতন প্রদেশের রাজধানী খুব সম্ভব ঢাকা-ই হবে এবং তাদের শক্তি ও কৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করবে। নূতন প্রদেশের আয়তন হবে ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল, আর এর লোকসংখ্যা হবে ৩,২০০,০০০০, যার শতকরা ৪০ ভাগ হবে মুসলমান এবং তারাই হবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ।" বাংলা বিভাগ ঘোষিত হয় ১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৬ই অক্টোবর তারিখে নতুন প্রদেশের শাসনব্যবস্থা চালু হয়। অনেক বৃদ্ধ মুসলমান বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরাজ ভারতীয় মুসলমানদের উপর যে অবিচার করেছিলেন বঙ্গবিভাগ করে তারই প্রায়শ্চিত্ত করলেন তাঁরা। কিন্তু সর্ব-ভারতীয় মুসলমান নেতারা যেহেতু বঙ্গবিভাগের প্রতি তেমন জোর সমর্থন জানাননি, তাই সরকার এ বিভক্তি রহিত করেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে স্যার সলিমুল্লাহ্‌ পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেও তাদের তরফ থেকে তেমন সাড়া পেলেন না। সমগ্র আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত ঢাকা শহর ও তার আশেপাশেই সীমিত হয়ে থাকল। অবশ্য বিভিন্ন জেলাগুলির সমর্থন পর্যবসিত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান জমিদার ও তালুকদারের সহযোগিতায়। সেকালে মুসলিম নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ বলে বিবেচিত ব্যারিস্টার আবদুর রসুল একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন স্যার সলিমুল্লাহ্‌র এই আন্দোলন সম্পর্কে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তিনি বললেন, কোনো রাজত্বকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সহায়তা করা হচ্ছে সকল প্রকার রাজনৈতিক নীতিবিরোধী, আর তাদের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করা চূড়ান্ত বোকামির নামান্তর। তাঁর এই হুঁশিয়ারি গুরুত্ব না পেলেও অর্ধদশক অন্তে প্রমাণিত হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণী বলে।

বঙ্গদেশের বর্ণ-হিন্দুরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আরম্ভ করে দিল এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন। কারণ, তাদের অস্তিত্বই হয়ে পড়েছিল বিপদগ্রস্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনের কৃপায় হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বণিক-সম্প্রদায়ের, তারা লাভ করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃত্ব, সরকারি চাকুরি এবং জমিদারি। তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এবং শহর কলকাতার কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এই বহুমুখী দানব ব্রিটিশরাজেরই সৃষ্টি। তাদের স্বার্থরক্ষা না করে ব্রিটিশ সরকারের কোনো উপায়ও ছিল না। বহু বর্ণ-হিন্দুর জমিদারি ছিল পূর্ববঙ্গে, কিন্তু তাদের বাসস্থান ছিল কলকাতা। হিন্দু লেখক, গ্রন্থকার বা সাংবাদিক যাঁরা আদিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতা এসেছিলেন, তাঁদের পক্ষে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। এঁদর অনেকেরই নির্ভর করতে হত সেখানকার পৈতৃক সম্পত্তির উপর। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের নির্ভর করতে হত পূর্ববঙ্গের মক্কেলের উপর। সরকারি অফিস-আদালতের কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের লোক। এ ছাড়াও উভয় বাংলাতেই বাঙালি হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। এমনকি, পশ্চিমবাংলায়ও বাঙালি হিন্দুদের

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যা বিহারী ও উড়িয়াদের তুলনায় ছিল অনেক কম। কাজেই তারা চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশ-পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য বদ্ধপরিকর হল। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার ও প্রথা—এসবের দোহাই দিয়ে তারা যে আবেদন করল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জনসাধারণের কাছে, তার প্রচণ্ড প্রভাব শুধুমাত্র যে হিন্দু-সম্প্রদায়কেই অভিভূত করল তা নয়, মুসলমানদেরও সহানভূতি লাভ করল। এই অবস্থায় স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলমানদের বিভ্রান্ত, বড়জোর নিরপেক্ষ করে তোলার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারলেন না। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা গণ-আন্দোলনরূপে প্রবল আকার ধারণ করল এবং শেষ পর্যন্ত শুধু বিলেতি দ্রব্য বর্জনই নয়, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেরও সূত্রপাত হল। এই আন্দোলনকে সমর্থন করে গোখেল ও তিলক প্রস্তাব করলেন—কর দেওয়া বন্ধ করার জন্যেও সংগ্রাম চালানো হোক।

এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ সত্ত্বেও বঙ্গদেশ বিভক্ত হল ; কিন্তু লর্ড কার্জন ও ইংরেজ সরকারের দুর্ভাগ্যক্রমে দূরপ্রাচ্যের একটি ঘটনা এই সুসম্পাদিত বিভক্তিকরণকে উলটে ফেলার কাজে আন্দোলনকারীদের বিশেষভাবে সহায়তা করল। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গ-বিভাগ ঘোষিত হয়, সেই বৎসরই জাপান রাশিয়াকে আক্রমণ করে প্রবলপরাক্রান্ত রুশ সেনাদলকে পরাস্ত করল। এই সর্বপ্রথম একটি শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী জাতি পরাজয় বরণ করল। সেই বিজয়ের উল্লাস বজ্রনির্ঘোষের মতোই প্রতিধ্বনিত হল প্রাচ্যের সর্বত্র। এশিয়ার দেশগুলি জেগে উঠল। শতাব্দীর ঘুম আর অলসতা ঝেড়ে ফেলে তারা শপথ-গ্রহণ করল—ইউরোপীয় প্রভুত্বের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার। জাপান যেভাবে আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে রাশিয়াকে পরাভূত করেছিল, তেমনি চীন ও ভারতবর্ষের নেতারাও সিদ্ধান্ত করলেন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করার জন্যে। কংগ্রেস তার পূর্বমত বর্জন করে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে যে আন্দোলন শুরু করল তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। উদার ও চরমপন্থী বিপ্লবীর কন্ঠ হল মুখর ও তীক্ষ্ণ, জনগণের দাবি হল অধিকতর স্পষ্ট ও সুগঠিত।

জাপানের বিজয়লাভ ছাড়াও এশীয় দেশগুলিতে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস ছিল এই মহাদেশের তিনজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের রচনা। তাঁরা হলেন, বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাপানের ওকাকুরা এবং সিংহলের আনন্দ কুমার স্বামী। নূতন জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এশিয়ার জন্য সৃষ্টি করলেন এক নব দর্শন। তাঁরা অনাস্থা প্রকাশ করলেন ইউরোপের অতি জাতীয়তাবাদিতায়। এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি পরিচালিত হবে একমাত্র এশীয় ভাবধারায়, যা এশিয়ার অধিবাসীদের পরিচালিত করবে সমগ্র মানবতার জন্য সংগ্রাম করতে।

এঁদের রচনাবলী থেকে জন্ম হল একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার, যার প্রভাবে বাঙালিদের বিক্ষোভ রূপ নিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনের। ব্রিটিশরাজের দুর্ভাগ্যক্রমে দিল্লিতে আর একটি ব্যাপার ঘটল, যার সঙ্গে জড়িত ছিল সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা নিরূপণের প্রশ্ন। জঙ্গি লাট কিচেনার ভাইসরয়কে তাঁর উপরস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে

www.nagorikpathagar.org

অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি দাবি করলেন, তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী এবং তাঁর উপর ভাইসরয়ের কোনো প্রভুত্ব খাটবে না। এ ব্যাপারে লর্ড কার্জন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু কোনোরকম সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করলেন। তিনি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের উপর বেসামরিক বিভাগের কর্তৃত্ব হচ্ছে একটি নীতিগত প্রশ্ন—তা বিলাতেই হোক বা ভারতবর্ষেই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

নির্বাচনে উদারনৈতিক দলের সাফল্য এবং ভারত-সচিবরূপে জন মর্লির নিয়োগের দরুন পূর্বমত পরিবর্তিত করে লর্ড কার্জনের অভিমত স্বীকার করে নেওয়া হল। জন মর্লি বুঝতে পারলেন, চরমপন্থীরা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তার সাথে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দখল করে নিচ্ছে। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোকে তিনি বলেন কংগ্রেসের উদারপন্থীদের সহায়তা করার জন্য—যাতে চরমপন্থীদের পাল থেকে বাতাস সরে যায়। লর্ড মিন্টোও তাঁর সাথে একমত হলেন ; কারণ সন্ত্রাসবাদীদের বুলেট ও বোমাসহযোগে যে আন্দোলন, অহিংস বিক্ষোভের তুলনায় তা জনসাধারণের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

কঠিন আইন জারি করা হল ; বিক্ষোভকারীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্যে চালানো হল আরও অত্যাচার, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর জবরদস্তি ও জুলুম। কিন্তু এতে দেশের যুবশক্তির সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পেল, তারা হল আরও বেপরোয়া। তরুণ-তরুণীরা উৎসাহিত হল সন্ত্রাসবাদী কর্মে, দেশের জনসাধারণ জানাল তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি। পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের কাছে ছিল একপ্রকার ঘৃণিত জীব; কারণ প্রশাসনিক অবিচার আর পুলিশের জোর-জুলুমে তারা হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো প্রশাসনিক আইন চালু হবার পর অবশ্যই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ অনেকটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, কিছুদিন সবাই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং সাধারণ লোক এই পরিবর্তনের সুফল সম্বন্ধে আশান্বিত হল।

১৯০৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী প্রমথনাথ মিত্র ও দেশবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদী সমিতি স্থাপিত হয়। কলকাতা ছিল এর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এটা পরিচিত ছিল অনুশীলন সমিতি নামে। বাহ্যত এই সমিতির কাজ ছিল পাঠাগারসহ লাইব্রেরি স্থাপন, শরীরচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে যুবক-যুবতীদের নানারূপ ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া ; ছুরি, তলোয়ার আর লাঠিখেলা শেখানো। কিন্তু এর পিছনে ছিল গোপন বিপ্লবাত্মক কাজকর্মে তাদের সুশিক্ষিত করে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এদের কাজের ধারা ছিল প্রথমে চাঁদা তুলে একটি ছোট লাইব্রেরি খুলে পড়বার জন্য বই ধার দেওয়া এবং তরুণ-তরুণীরা লাইব্রেরি সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠলে, বিশেষ করে যারা রাজনীতি চর্চায় বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত বলে বিবেচিত হত, তাদের নিষিদ্ধ পুস্তক পড়তে দেওয়া। একপক্ষ অন্তর বসত আলোচনা সভা, সেখানে তাদের শোনানো হত বিপ্লবীদের কাহিনী। নিষিদ্ধ পুস্তকাদি, প্রচারপত্র বা গোপন চিঠিপত্র, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র যথানির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার কাজে লাগানো হত মেয়েদের।

www.nagorikpathagar.org

সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভাব ছিল এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা। কেবলমাত্র চাঁদার উপর নির্ভর করে এজাতীয় প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব ছিল না। কাজেই অর্থসংগ্রহের জন্য এদের অবলম্বন করতে হল ডাকাতির পথ। নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অনুশীলন দল প্রায় তিরিশ বছর ধরে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল; কারণ, তারা সকলেই ছিল বিদেশী প্রভুত্বের কবল থেকে নিজ মাতৃভূমি উদ্ধারের কাজে উৎসর্গীকৃত এবং এজাতীয় কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল নয় বলেই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সক্ষম গেরিলাবাহিনী সৃষ্টি করার ধারণা তখনও জন্মায়নি। গেরিলাদের মতো সন্ত্রাসবাদী দলগুলির কোনো সহযোগী দল বা জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল না। মার্কস্‌বাদীদের মতো তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বা তার দ্বারা অনুষ্ঠিত গুপ্তহত্যার বিরোধী ছিল না। উন্নত ধরনের শিক্ষাদান প্রাণালীর জন্য ও জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার জন্য গেরিলাবাহিনীর কার্যকারিতা আজকাল বহুলাংশে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সন্ত্রাসাবাদী দলগুলির বিপরীত পন্থায় ধনীদের উপর কর বসিয়ে তাদের দখলীকৃত এলাকায় গেরিলারা অর্থ সংগ্রহ করে। ঢাকা ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র, যার নীতি নির্ধারণ করতেন পুলিন দাস, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিরা। তাঁদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল কুমিল্লা।

১৯০৬ সালে সন্ত্রাবাদীদের দ্বিতীয় দল স্থাপিত হয় কলকাতায় অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে। এর নাম হল 'যুগান্তর' দল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলকাতায় যুগান্তর পত্রিকার দফতরে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি তৈরি করার জন্য নেতারা মিলিত হতেন। সেজন্যই দলের নামকরণ হয় 'যুগান্তর'। যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে একই মতাবলম্বী ছিলেন। দুই দলের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও তাদের কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে সন্ত্রাসাবাদী কার্যকলাপের বড় ঘাঁটি। এখানে সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে।

যুগান্তর ও অনুশীলন উভয় দলেরই আন্দোলন ছিল মুখ্যত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন, আর এদের অধিকাংশ কর্মীই ছিল বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তবু কিছুসংখ্যক মুসলমান ছাত্র, শিক্ষক ও যুবক এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই আন্দোলন কখনও সমাজের মূল পর্যন্ত পৌছায়নি এবং জনসাধারণের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গণ-সাম্যবাদী সাহিত্য যা এদের কাছে এসে পৌছত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে, তা-ই ছিল এদের প্রেরণার উৎস। এজাতীয় পুস্তকাদি গোপনে চালানো হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রধানত আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে, কোনো কোনো সময় সমুদ্রগামী জাহাজে করেও। জার্মানি ও জাপান থেকেও তারা আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিল। ক্রমে ক্রমে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হতে আরম্ভ করল। নিয়ম করা

www.nagorikpathagar.org

হল—ভয়াল ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির সামনে গোপনতা রক্ষার আর সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার। সন্ত্রাসবাদিতায় দীক্ষিত মুসলিম কর্মীরা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করায় তারা ক্রমে ক্রমে সক্রিয় বিপ্লববাদ ত্যাগ করল। তাদের উপর ন্যস্ত হল অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব এবং প্রয়োজন হলে এজন্য ডাকাতি করাও হল তাদের কর্তব্যের অন্তর্গত।

বিপ্লববাদের আদর্শ গড়ে তোলা হয়েছিল তিনটি রঙিন ধারণার উপর—শপথ, প্রতিহিংসা আর সন্ত্রাস। প্রত্যেক সভ্যকে শপথ নিতে হত শর্তহীন আনুগত্যের, দলের বিরোধিতা বা সহকর্মীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করার। সভ্যদের আনুগত্যকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে চালু করা হয় গুপ্তহত্যা ও বিভীষিকা সৃষ্টির কাজ। আনুগত্যের শপথের মধ্যেই ছিল বিশ্বাসঘাতক সহকর্মীকে হত্যার সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ। ১৯০৮ সালে নরেন গোঁসাইকে এবং ১৯১৪ সালে রামদাসকে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করা হয়।

বাংলার মুসলমানদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের প্রভাবিত করার মানসে স্যার সলিমুল্লাহ্ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আলিগড় আন্দোলনের নেতাদের নির্দেশে ঢাকায় ভারতীয় মুসলিম নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। কিন্তু এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল ব্যর্থ, যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের জন্যে এখানে প্রস্তাব পাশ করা হল একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের, যার পরবর্তীকালে নাম করা হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ও আদর্শের মধ্যে ছিল :—

(ক) মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভক্ত ও অনুগত করে তোলা এবং সরকারের কার্যকলাপের জন্যে মনে কোনো সংশয় উদয় হলে তার নিরসন করা।

(খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকারকে রক্ষা করা এবং তাদের দাবিদাওয়া সরকারের গোচরীভূত করা।

তিন মাস আগে লর্ড মিন্টোর কাছে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে এমনি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল।

এই পর্যায়ে মুসলমানেরা বিদেশী শাসন থেকে তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভের জন্য সাম্প্রদায়িক অধিকার ও স্বার্থ বজায় রেখে হিন্দুদের সহিত সম্মানজনক সমঝোতা ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিল। আলীগড় কলেজের কৃতী ছাত্র এবং আলীগড় আন্দোলনের ব্যাখ্যাতা মৌলানা মুহম্মদ আলী ১৯১১ সালে তাঁর 'কমরেড' পত্রিকায় লেখেন : 'ভারতবর্ষ একতাবদ্ধ হয়েছে, এই ধ্বনিতে আমাদের কোনো আস্থা নেই। ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি প্রায় আন্তর্জাতিক। জাপানের চার কোটি সমাদর্শী লোকের অনুরূপ দেশপ্রেমের উৎসাহ ও তীব্র জাতীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে আজ হয়তো সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু ক্যানাডার আদর্শে একই মতৈক্যবিশিষ্ট শাসন-সরকার গঠন সম্ভাব্য কার্যকারিতার বহির্ভূত নয়।"

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ রাজশক্তি অবশেষে হিন্দু-বিক্ষোভের কাছে নতি স্বীকার করল এবং ১৯১১ সালে তদানীন্তন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র মহামান্য আগা খাঁ এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানালেন। নতুন বাংলাদেশ গঠিত হল বাংলা ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ নিয়ে। এর আয়তন হল সত্তর হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা দাঁড়াল চার কোটি বিশ লক্ষে এবং মুসলমানরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই ঘোষণায় আসাম হল চীফ কমিশনারের অধীন একটি প্রদেশ, আর কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী সরিয়ে নেয়া হল দিল্লিতে। রাজধানী পরিবর্তনের কারণ ছিল দুটো—প্রথমত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বাংলাদেশে শাসকবর্গের নিরাপত্তা হচ্ছিল বিঘ্নিত এবং দ্বিতীয়ত নৌশক্তির উপর নির্ভর করে সমুদ্রোপকূলবর্তী জায়গায় রাজধানীর অবস্থানও কালোপযোগী ছিল না। 'বেঙ্গল আর্মির' উপর বিশ্বাস শিথিল হওয়ায় এবং উত্তর ভারত সেনা-সংগ্রহের উপযুক্ত ক্ষেত্র বিধায় সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মত হল স্থলবাহিনীর উপর অধিকতর নির্ভর করা। তা ছাড়া, উত্তর ভারতে রাজধানী স্থাপন করা হবে ঢের বেশি নিরাপদ। সবার উপর ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার কৃত্রিম জৌলুসকে প্রতিফলিত করার জন্যেও প্রয়োজন ছিল দিল্লির প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক পটভূমিকার।

রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশের গুরুত্ব হ্রাস পেল না। গোখেল একদা উক্তি করেছিলেন : "আজ বাংলা যা ভাবে বা চিন্তা করে, আগামীকাল সমগ্র ভারতবর্ষ তা ভাববে এবং তা চিন্তা করবে।" ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ সালে সি. ভি. রমনের এ পুরুস্কার পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই বিপুল সম্মানের অধিকারী।

ভারতীয় মুসলমানরা এ অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তাদের উদ্ধার করার জন্য এ সময় এগিয়ে এলেন ব্রিটিশরাজের অকৃত্রিম বন্ধু মহামান্য আগা খাঁ। ১৯১২ সালে তিনি হলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি। এই প্রতিষ্ঠান পেল সরকারি সমর্থন ; স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে এর দাবি পূর্বেই গ্রাহ্য হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের দরুন সংগ্রামশীল রাজনীতি ছিল স্থগিত, কিন্তু বাংলাদেশের নৈরাজ্যবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতে থাকল বিক্ষিপ্তভাবে। মহাযুদ্ধের সময় বিক্ষোভমূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপ না থাকলেও রাজনীতির সুকৌশল প্রয়োগ ছিল অব্যাহত। ১৯১৬ সালে স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে জনাব জিন্নাহ্ সাহেব ও বাল গঙ্গাধর তিলক-এর প্রচেষ্টায় একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। হিন্দু ও মুসলিম সম্পর্কের বেদনাদায়ক ইতিহাসে এ হল একমাত্র মতৈক্যের নজির। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট নামে সুপরিচিত এই চুক্তিতে দেশের বিভিন্ন আইনসভায় সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচনের পন্থা এবং তাদের সংখ্যা-নিরূপণের প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট-এর শর্ত অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের মুসলমানরা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে বেশি প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পেল, আর তার পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের করা হল সর্বনাশ। কারণ যদিও তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৪ জন—তারা প্রতিনিধিত্ব পেল শতকরা ৪০ জন। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে কোনো বাঙালি মুসলমান নেতার দস্তখত নেই। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ভারতীয় মুসলিম নেতাদের প্রতি সেই যে আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়েছিল তা কোনোদিনই সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হয়নি। চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তাঁদের অধুনা প্রকাশিত পুস্তক দুটোতে বলতে চেয়েছেন যে, জনাব ফজলুল হক সাহেবের মত নিয়ে এটা করা হয়েছিল। এটা একটা মিথ্যে উক্তি ; কারণ জনাব হক সাহেব এই চুক্তির বছর পাঁচেক আগে সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং তখনও তিনি দেশের নেতা হয়ে ওঠেননি। তা ছাড়া যে উনিশজন কেন্দ্রীয় পরিষদ-সদস্য এতে দস্তখত করেছিলেন তার মধ্যে হক সাহেবের দস্তখত নেই। ভারতীয় মুসলমান নেতাদের পক্ষে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' ছিল সবচেয়ে বড় ভুল—কারণ পরবর্তীকালে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর গুরুত্বে সমাজের কোনো লাভ হয়নি, পরন্তু বাংলাদেশে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ সরকার গঠনে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষকে ভাগ করে হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারত দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি করার ধারণা কোনো কোনো ব্যক্তি করেছিলেন মহাযুদ্ধের সময়ই। ১৯১৭ সালে স্টকহলমে সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ যোগদানের পরে আলীগড়ের দু'জন ছাত্র ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভাগের এক পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। ১৯২০ সালে মোহাম্মদ আব্দুল কাদির বিলগ্রামী নামক জনৈক ব্যক্তি বাদাউন থেকে প্রকাশিত জুলকারনাইন নামক সংবাদপত্রে গান্ধীজীর নিকট প্রেরিত এক খোলা চিঠিতে অনুরূপ প্রস্তাব করেন।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রত্যাগত গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। এরপর ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা দিল সুস্পষ্ট পরিবর্তন। তিনি করলেন কতগুলি মতবাদের প্রবর্তন ; যথা—অহিংসা, অসহযোগ, আইন অমান্য আর বিলেতি দ্রব্য বর্জন করা। চরকা হল স্বাধীনতার প্রতীক। গান্ধীজীর জীবন ছিল প্রাচীনকালের সন্ন্যাসীর মতো। তিনি দেখেছিলেন ভারতে রাম-রাজত্বের স্বপ্ন। সাধারণ হিন্দুরা তাঁর এই আদর্শে আকৃষ্ট হল, তারা গান্ধীজীকে দেখল অবতার হিসাবে ; কিন্তু মুসলমানেরা ক্রমশ হয়ে উঠল বিরূপ। গান্ধীজী চাইলেন মুসলমানেরা হবে খাঁটি মুসলমান, হিন্দুরা হবে প্রকৃত হিন্দু। কিন্তু এজাতীয় ধারণাকে মুসলমানরা, সম্ভবত তারা সংখ্যালঘু বলেই, দেখল সন্দেহের দৃষ্টিতে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যদিও গান্ধীজী মুসলিম সম্প্রদায়ের খিলাফত নেতাদের প্রবুদ্ধ করতে পেরেছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক দেশব্যাপী বিক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্যে এবং আন্তরিক সহযোগিতাও পেয়েছিলেন মৌলানা মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ কিচ্‌লু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মুসলিম দেশপ্রেমিকদের, কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তুরস্কের দুর্ভাগ্যে স্তম্ভিত হলেও খিলাফত আন্দোলন ছিল মুসলিম জনসাধারণের কাছে একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। কারণ তাদের সমস্যার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কামাল আতাতুর্ক যখন খিলাফতের বিলোপ- সাধন করলেন, এদেশীয় মুসলমানরা হল বিভ্রান্ত আর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা হারালেন তাঁদের

www.nagorikpathagar.org

প্রতি মুসলিম সমাজের আস্থা। গান্ধীজী অবশ্যই একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। এমনকি, তাঁকে সে যুগের একজন ঋষিও বলা যায়, কিন্তু সেকেলে পুনরভ্যুদয়ের মতবাদ প্রচার করে জাতীয় সংগ্রাম থেকে মুসলমানদের সরিয়ে দেবার জন্যে তিনিই দায়ী।

যখন জহরলাল নেহরু সেই রাজনীতিতে যোগদান করলেন তখন কংগ্রেসের রাজনীতিতে আর একটি পর্বের সূচনা হল। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী এবং মার্কস্-লেনিনের মতবাদ দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত। তিনি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবর্তন করতে সাহায্য করলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল বিরাট এক বিশ্বশক্তির পতন হিসাবে পরিগণিত হল। পাশ্চাত্যের দীর্ঘাস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন মোহমুক্তি, যুদ্ধের জন্য ঘাটতি জিনিসপত্রের অতিরিক্ত মূল্য, কমিউনিস্ট বিপ্লবের ঝলকানিতে এবং আমেরিকার গণতান্ত্রিক অধিকার আর আত্মনিয়ন্ত্রণের বুলিতে হতচকিতাবস্থা প্রভৃতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল অশান্ত। গান্ধীজী বা নেহরু কেউই বিশ্বাস করতেন না যে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভবপর ; উভয়েই গণআন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁদের সাথে একমত হতে পারলেন না এবং ১৯১৯ সালে সংস্কার আইন পাশ হবার পর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন।

বঙ্গবিচ্ছেদ রদ করা হলে স্যার সলিমুল্লাহ্ অন্তরে গুরুতর আঘাত পেলেন এবং কিছুদিন পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি ব্রিটিশ সরকারের উপর আস্থা হারান। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতার আবির্ভাব হল রাজনীতিক্ষেত্রে, যাঁরা কমবেশি সকলেই কাজ করেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ-রক্ষার জন্যে। নবাব আলী চৌধুরী, স্যার এ. কে. গজনভী, স্যার আবদুর রহিম প্রমুখ মুসলিম নেতারা বঙ্গদেশের অখণ্ড রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, প্রদেশের মুসলমানদের বা মুসলিম-বাংলার নায়কত্বই ছিল তাঁদের কাম্য। ফজলুল হক ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলিম নেতা, যিনি জনগণের অন্তর বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর নেতৃত্বস্থাপনে ব্রিটিশ রাজশক্তির চেয়ে মুসলিম জনসাধারণের উপর তিনি বেশি নির্ভর করতেন। বাংলাদেশকে তিনি কম ভালবাসতেন না ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল আরও গভীর। এটা প্রচলিত মতবিরোধী হতে পারে, কিন্তু ফজলুল হক ছিলেন সে-যুগের পরস্পরবিরোধী গুণের প্রতিরূপ।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বের ব্যর্থতা, এবং তাঁর মৃত্যুতে জন্ম নিল বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক যৌথ নেতৃত্ব। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি উদাসীন থাকা তাঁদের পক্ষে আর যে সম্ভব নয়, এ সম্বন্ধে সচেতন হলেন বাংলার মুসলিম উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁরা তাঁদের ছেলেদের মাদ্রাসা থেকে এনে ভর্তি করলেন ইংরেজি স্কুলে। মোল্লারা যে এর চরম বিরোধী ছিলেন, সেটা তাঁরা জানতেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর মোল্লারা ক্রমশ তাঁদের আধিপত্য হারাতে বসলেন। জোতদার, তালুকদার ও হিন্দু জমিদারদের অধীনস্থ বড় তালুকদারদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু এঁদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদারদের অধীনস্থ কোনো-না-কোনোরূপ প্রজা, কাজেই এঁরা যে-প্রতিষ্ঠানটি গঠন করলেন, তা পরিচিতি হল প্রজা-পার্টি নামে। ১৯১১ সালে ব্রিটিশরাজ কর্তৃক বঙ্গবিভাগ রদ হওয়ায় নেতৃস্থানীয় একদল মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস হল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত নয় ; এবং যা কিছু কাম্য, তা হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা আদায়ের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের ব্যবহার করা। অতএব তাদের ধারণা হল, মুসলমানরা হবে আত্মনির্ভরশীল এবং তারা কাজ করবে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে। ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জিলায় প্রথম 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহাযুদ্ধের দরুন এরপর আর সম্মেলন ডাকা সম্ভব হয়নি। স্যার আব্দুর রহিম, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন, এ. কে. ফজলুল হক, মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রমুখ প্রজা-পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রজা আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা না থাকলেও, তাঁরা চেষ্টা করলেন অর্থনৈতিক কর্মসূচিভিত্তিক একটি অনাধ্যাত্মিক আন্দোলন সৃষ্টি করার, যা ছিল খিলাফত আন্দোলনের মতো অবাস্তব চিন্তার বিপরীত। প্রজা আন্দোলন পরিচালিত হয় জমিদারদের বিরুদ্ধে, কিন্তু এর নেতৃত্ব মুসলমান তালুকদার আর জমিদারদের হাতে থাকায় আন্দোলনটি কখনও বিশেষ প্রগতিশীল হতে পারেনি। তাঁরা যা অর্জন করতে চাইলেন, তা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং বর্ণ-হিন্দুদের সমকক্ষ হবার অধিকার। প্রকৃতপক্ষে প্রগতিশীল না হলেও এর নেতৃবর্গের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার দরুন আন্দোলনটির পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা এড়িয়ে চলা সম্ভবপর হয়েছিল। এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক কলহ-বিবাদ উৎসাহিত করেনি, যদিও এর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, আন্দোলনটি মুসলিম-সমাজের খেদমতের কাজেই ব্যবহৃত হয়েছিল। অসঙ্গত মনে হলেও, বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই বেশ কিছুসংখ্যক বিত্তশালী মুসলমান তদানীন্তন সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন একযোগে প্রজা-পার্টি, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি, এমনকি আঞ্জুমান-ই-ইসলামের সভ্য। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিরাপত্তার জন্যে।

১৯১৫ সালে গোখেল মারা যান। কারামুক্তির দু'বছর পর রাজনীতিতে যোগদান করে তিলকও মারা যান। তাঁর কর্মসূচির মাধ্যমে মুসলিম লীগের সমর্থন লাভ করে তিনি কংগ্রেস দখল করেন। এতে উদারপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিলকের নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাহস এবং দক্ষতার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিপক্ষে ভারতীয় সম্প্রদায়কে পরিচালনা করার পর গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করলেন ১৯১৮ সালে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে যে কৌশল তিনি উদ্ভাবন করলেন, তা হল অহিংসার মাধ্যমে সত্যাগ্রহ। তিনি জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও স্বার্থের বিরোধিতা করার জন্যে আহ্বান করলেন। প্রার্থনা আর উপবাসের মাধ্যমে হিংসাত্মক আইনের প্রতিবাদকল্পে তিনি প্রবর্তন করলেন ধর্মঘট। তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন সাধারণ ধর্মঘট ও বিলেতি দ্রব্য বর্জনকে অস্ত্র

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে ব্যবহার করতে।

১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ব্রিটেনের কোয়ালিশন সরকার ভারত-সচিব এডুইন মন্টেগুর মারফত ঘোষণা করলেন :

"মহামহিম সম্রাটের সরকার, যার সঙ্গে ভারত সরকার একমত, তার নীতি হল প্রশাসন বিভাগের প্রতি শাখায় ভারতীয়দের যোগদান এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমোন্নতি। সাম্রাজ্যের অখণ্ড অংশ হিসাবে ভারতের জন্য একটি দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা আদায় করে নেওয়া হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।"

১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারের পর বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৩৯ জন করা হল। ঠিক হল, এর শতকরা ৭০ জন হবেন নির্বাচিত। এর ফলে বাংলাদেশের লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেল। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম যুব-সম্প্রদায় আলীগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পেল। প্রজা-পার্টির অধিকাংশ নেতা ছিলেন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যৌথ নির্বাচনব্যবস্থার পক্ষে, আর আলীগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা।

মুসলিম সম্পাদিত সংবাদপত্র 'মিহির' এবং 'সুধাকর' উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং তারও পরে 'মোহাম্মদী', 'সুলতান', 'দি মুসলমান' প্রভৃতি সংবাদপত্র বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করে। এইসব এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকা মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলার চেষ্টা করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি সাম্প্রদায়িকতায় আগুন ছড়ানোর কোনো চেষ্টা করেনি। যে-সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ দেশশাসনের কাজে ভেদনীতি অবলম্বন করতে যাচ্ছিল এবং আলীগড় আন্দোলনের নেতারা হয়ে পড়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী আর কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতের ক্রীড়নক, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলভী মুজিবর রহমান, মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ বিখ্যাত সম্পাদকের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল।

প্রজা আন্দোলনের একটি দুঃখজনক দিক ছিল—বর্ণ-হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য নকল করার দিকে তাদের প্রবণতা। সেই সময়ের বিশেষ পটভূমিকায় এই মানসিকতা সহজবোধ্য। প্রজা আন্দোলন প্রধানত মর্যাদালাভের লড়াই হওয়ায় এর উদ্যোক্তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে চেষ্টা করলেন মুসলিম চাষী, তাঁতি, মিস্ত্রি, মজদুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর উপর, ঠিক যেভাবে বর্ণ-হিন্দুরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের তুলনায়। তাঁরা তাঁদের উচ্চশ্রেণীভুক্ত বলে দাবি করতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা—তাঁরা হলেন কোনো আরব, মুগল বা পাঠান বা তুর্কি বা অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের কোনো বহিরাগত ব্যক্তির বংশধর। এঁরা তাদের ছেলেমেয়েদের আরবি, ফারসী ও উর্দু শেখাতে আরম্ভ করলেন। এসব ভাষাশিক্ষার আড়ালে যে মনোভাব ছিল—তা হল, এঁরা বাংলাদেশের অধিবাসী নন, এঁরা এখানে এসেছিলেন বহিরাগত বিজয়ীর বেশে।

প্রায় সকল গ্রামেই তখনকার দিনে মহানবী, খলিফা, মুগল বা পাঠান বাদশাহের বংশধর গজিয়ে উঠেছিল। তাঁরা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—

www.nagorikpathagar.org

পাছে লোকে তাঁদের ধর্মান্তরিত মুসলমান অথবা অনার্য বলে ঘৃণা করে। এভাবে তাঁরা এক নূতন জাতের সৃষ্টি করলেন। শেখ, সৈয়দ, মুগল, পাঠান প্রভৃতির বংশধর হিসেবে নিজেদের প্রচার করলেন শরীফ বলে ; আর চাষী, জোলা, মালী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের তারা 'আতরাফ' বা নিম্নজাতি বলে অভিহিত করলেন। এই তথাকথিত আভিজাত্য বোধের দ্বারা বিবাহ-সম্বন্ধও নিরূপিত হতে লাগল। অনেকে আবার যেসব অবাঙালি মুসলমান ব্যবসাসূত্রে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং যাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁদের আদি বাসস্থানের নাম, সেইসব লোকদের অনুকরণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের আত্মপ্রবঞ্চনার পিছনে যে-যুক্তিই থাকুক না কেন, তাঁদের এই মনোভাবের জন্য বাঙালি মুসলমানকে দিতে হয়েছিল এবং আজও দিতে হচ্ছে অতি উচ্চ মূল্য। তাঁদের অন্তর আবেগ ও আনুগত্যবিহীন হয়ে পড়েছিল, তাঁরা বাংলাদেশকে জন্মভূমি বলে মেনে নিতেও পারেননি এবং বাংলা ভাষাকেও মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। কাজেই তাঁরা দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হননি, যার ফলে তাঁরা সৃজনশীল হতে পারেননি এবং সক্ষম হননি মৌলিক কিছু দান করতে, এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ; কারণ সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির জন্য চাই বলিষ্ঠ পটভূমিকা এবং তাদের প্রেরণার উৎস হতে হবে স্বদেশের মাটি।

যেসব মুসলিম কবির মধ্যে কিছু সম্ভাবনা লক্ষ করা গিয়েছিল—তাঁরা নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন, কারণ তাঁদের বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ নয়, আরব বা পারস্য। তাঁদের কাব্যে থাকত না বাংলাদেশের নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা লোকজনের কথা ; তাতে থাকত কারবালা, ইস্পাহান বা দিল্লিতে কি ঘটেছিল তারই কাহিনী। এই কবিরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ফারসি কবিতা বা আরবি কিস্‌সা কাহিনীর অনুবাদক। কোনো মুসলমান ফারসি বয়েৎ আওড়াতে না পারলে, গজল বা উর্দু কাওয়ালির রসগ্রহণে অসমর্থ হলে, তাকে সম্ভ্রান্ত বা শিক্ষিত ব্যক্তি মনে না করার রেওয়াজ বহুদিন বলবৎ ছিল। সুখের বিষয় এই যে, মুসলিম সম্প্রদায় এই হীন মনোভাবকে উপলব্ধি করতে পেরেছে—সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় নয় ; সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যক্তিগত। জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক সভ্যতা সম্ভব হলেও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

কখনও কখনও সংস্কৃতি কথাটিকে আলাদা ও অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন ইউরোপীয় বা এশীয় সংস্কৃতি। আর এশিয়াবাসীরা বলাবলি করে চৈনিক সংস্কৃতি বা পাকিস্তানী তমদ্দুনের কথা। আবার পাকিস্তানে দেখা যাবে—মুসলিম সংস্কৃতি আর হিন্দু সংস্কৃতি। পাকিস্তানী মুসলিমরা চাষী সংস্কৃতি, মজদুর সংস্কৃতি এবং শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্তেরা কালচার বা কৃষ্টির কথা উল্লেখ করে থাকেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিবার-বিশেষে সংস্কৃতির মানের তারতম্য ঘটে থাকে। বিশেষ কোনো পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের আবার থাকে নিজস্ব একটি 'কালচার'। এইভাবে দেখা পাওয়া যাবে নানা ধরনের, যথা—মহাদেশীয়, জাতীয়, সাম্প্রদায়িক, নির্বস্তুক, ধোঁয়াটে শ্রেণীগত কালচারের। প্রগতিশীল সংস্কৃতি হচ্ছে একক এবং মহত্ত্বলাভের মতোই একে অর্জন করতে হয় সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধির মাধ্যমে—মনকে সতত সংস্কৃত করে, আর নিজের ব্যক্তিত্বকে মনোহর করে তুলে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বাংলাদেশ

(১৯২০—১৯৩৯)

উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মুসলিম নেতাদের মধ্যে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের কোনো জনপ্রিয় কর্মসূচি ছিল না। আগা খাঁ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার পর থেকে কোনোপ্রকারে এর বাইরের চেহারাটি টিকিয়ে রাখা হয়। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব যদিও ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন কিন্তু মুসলিম লীগ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের রাজি করালেন—কংগ্রেস যে-সভামঞ্চে তাঁদের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করবেন, সেই সভামঞ্চে মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে। তাঁর আশা ছিল, এতে দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এতে আশানুরূপ ফল হল না। আদর্শগত প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও নেতারা সর্বদাই একে অপরের উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীজীর যোগদানের পর থেকে তাদের মধ্যে বিভেদ আরও গভীর হল।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রবর্তনের পর গান্ধীজী ১৯২০ সালের ৮ই আগস্ট আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় জনতার আক্রমণে ২১ জন পুলিশ কর্মচারীর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ঐ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। তাঁর অনুগামীদের অনেকেই তাঁর এই কাজকে শোচনীয় আত্মসমর্পণ বলে মনে করলেন। গান্ধীজী ঠিক করলেন, তখনকার মতো রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে তিনি তাঁর সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর অহিংসা আদর্শের প্রচারে আত্মনিয়োগ করবেন।

বাংলাদেশের উপর অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার করল বিরাট প্রভাব। মদের দোকানের সম্মুখে সত্যাগ্রহীদের পিকেটিং, বিলেতি বস্ত্র ও সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন, তাঁতের কাপড় ব্যবহার প্রভৃতি কাজ স্বাধীনতার প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করল। বাংলার

www.nagorikpathagar.org

অনেক মুসলমানই যোগদান করল এই আন্দোলনে। অনেক ছাত্র স্কুলে-কলেজ একেবারে ছেড়ে দিল। স্বদেশপ্রেমের ধারণা জেগে উঠল জনসাধারণের মনে। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, এ আন্দোলনে বর্ণ-হিন্দুদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। কিন্তু সেটা সাধারণ লোকের অন্তর স্পর্শ না করে পারেনি। বাংলাদেশের গৃহিণীদের মধ্যে চরকায় সুতো কাটা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করল। মুসলমান মহিলারাও এ কাজে অংশগ্রহণ করতে বিরত রইল না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি দল গান্ধীজীর আইনসভা বর্জনের বিরোধিতা করলেন ; এঁরা ১৯২৩ সালে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ-গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বরাজ্যদল স্থাপন করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারকে ভিতর থেকে বানচাল করা। বাংলা ও বোম্বের বিধানসভায় স্বরাজ্যদলের যথেষ্টসংখ্যক আসনপ্রাপ্তিতে এই দুই প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে বাধা সৃষ্টি হল ; আবার কেন্দ্রীয় বিধানসভার নির্বাচনে ১০৬টির মধ্যে ৪৫টি আসন লাভ করে কেন্দ্রেও তাঁরা একটি শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করতে সক্ষম হন। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করেও শেষ পর্যন্ত দেশের কোনো উপকার হল না। ১৯২৫ সালে প্রখ্যাত নেতা দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল পুনরায় গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করল।

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এ. কে. ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং অন্যান্য বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন—যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল—বিধান পরিষদসহ সকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব তাদের সংখ্যানুপাতে হবে এবং সমতা লাভ না করা পর্যন্ত সরকারি এবং অন্যান্য সংস্থার চাকুরিতে মুসলমানদের নিয়োগ করা চলতে থাকবে। দেশবন্ধুর অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও নিপুণ নেতৃত্বের দরুন বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। এই বিরাট প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলার অগণিত নরনারীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গান্ধীজীর গণআন্দোলনভিত্তিক কর্মসূচির তিনি সমর্থক ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেসকে ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলের আদর্শে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতামত কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মুসলিম নেতাদের মোকাবিলা করেন। তাঁর স্বরাজ্যদল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তানুযায়ী সর্ববিষয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সমকক্ষতা লাভ করে। বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে এই দল প্রায় পঞ্চাশটি আসন লাভ করে। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যের সংখ্যা হয় প্রায় সমান সমান। যখন ফজলুল হক দেশবন্ধুর আপত্তি অগ্রাহ্য করে ১৯২৪ সালে বাংলা সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি খুবই নিরাশ হয়ে পড়েন। বিধানসভায় বিরোধিতার দরুন ফজলুল হকের পক্ষে মন্ত্রীপদে সামান্য কয়েক মাসের বেশি অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্বরাজ্যদল মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। কলকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধু আর

www.nagorikpathagar.org

সোহ্‌রাওয়ার্দীর একত্রে কাজ করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আবার সম্ভব হয়েছিল।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যবশত দেশবন্ধুর মতো মহান নেতা তাঁর আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ১৯২৫ সালে মারা গেলেন। এর ফলে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ব্যাহত হল। ১৯২৬ সালে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে ঢাকায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর অনুসৃত ঐক্যনীতির ভিত্তিমূল কেঁপে উঠল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা অবশ্য এই মহাদেশে নতুন নয়। ১৭৩০ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে দোলখেলা উপলক্ষ করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছিল। অবশ্য বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম ছিল। দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা ছিল এসব দাঙ্গার মূল কারণ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিপ্রেত বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশকে এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কবল থেকে রক্ষা করেছিল। বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল তাঁর বিরাট প্রতিভাকে; তাই তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্টি হল এক শূন্যতা। তারপর নেতৃত্ব লাভ করলেন দেশপ্রীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণের বহুবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মুখ থেকে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হল। দুর্ভাগ্যবশত 'বেঙ্গল প্যাক্টের' অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সুভাষবাবু সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না।

বাংলার মুসলমান নেতারা প্রজাদের অধিকার সম্বন্ধে উৎসাহিত হলেও হিন্দু নেতারা, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার শ্রেণীর, প্রজাদের জন্য কোনোকিছু করার ব্যাপারে ছিলেন নারাজ। এর ফলে ১৯২৮ সালে প্রজাদলের সদস্যদের বাধা সত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হল এবং জমিদারদের অধিকার আরও বৃদ্ধি করা হল। মুসলিম নেতারা হিন্দুদের মনোভাব বুঝতে পেরে নিরাশ হলেন এবং এর ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯২৯ সালে স্থাপন করলেন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'। এই সময়ে ইংরেজ সরকার ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে সম্প্রীতির বদলে আরও বিদ্বেষের সৃষ্টি হল। ১৯২৭ সালে স্ট্যাটুটরি কমিশন ঘোষিত হল, যা সাধারণত সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন ভারতে পদার্পণ করলেন ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাঁরা শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনসংক্রান্ত বিষয়সমূহ ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন, কিন্তু কমিশনে কোনো ভারতীয় সভ্য না থাকায় এই কমিশন বর্জন করা হল। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা হল। ঐ বৎসরেই জনাব জিন্নাহ্ সাহেব তাঁর ' চৌদ্দ দফা' উপস্থাপিত করলেন, যা গোড়ার দিকে কংগ্রেস সমর্থন করলেও গান্ধীজী ও মতিলাল নেহরুর নির্দেশে পরে অগ্রাহ্য করল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে সকল দলের মুসলিম নেতারা তাঁদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এক বৈঠকে বসেন। লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে বাংলার মুসলমানদের উপর যে অবিচার করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করলেন। অন্যান্য প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ছিল—ভারতে ফেডারেল সরকার

www.nagorikpathagar.org

স্থাপন করা, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে তাদের কিছুতেই সংখ্যালঘুতে পরিণত না করা ইত্যাদি। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, এর কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় একটি সর্বদলীয় 'কনভেনশনে' মাননীয় আগা খাঁ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন। এই বৈঠকের প্রস্তাবসমূহ ১৯২৯ সনে মুসলিম লীগ কাউন্সিলে পেশ করা হয়। মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জনাব জিন্নাহ্ সাহেব। তিনি ঐ প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতে চৌদ্দটি দফা আকারে একটি প্রস্তাব মুসলিম লীগ অধিবেশনে উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবই জিন্নাহ্ সাহেবের 'চৌদ্দ দফা' নামে পরিচিত।

১৯২৯ সালে মার্চ মাসে নেহরু রিপোর্ট প্রকাশিত হল এবং স্বতন্ত্র নির্বাচননীতিকে আগ্রাহ্য করার দরুন তা মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিদ্বেষ অর্জন করল, যদিও বাংলার মুসলমানদের জন্য এ প্রস্তাব লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের প্রস্তাব থেকে ভালই ছিল। ১৯২৪ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল জনসাধারণের অপ্রিয় লবণ করের বিরোধিতাকল্পে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে সমুদ্রোপকূলের দিকে লবণ তৈরি করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ১৯২০ সালে গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, কংগ্রেস ও খিলাফত নেতাদের ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশবিরোধিতার দরুন তা তখন মুসলমানদের সমর্থন পেয়েছিল, কিন্তু এবার মুসলমানদের ডেকে নেবার জন্যে তাদের মধ্যে প্রচেষ্টার অভাব দেখা গেল।

বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষতিজনক এক গণ-আন্দোলনের পরীক্ষা মাত্র। এটা ছিল অনেকটা দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণকে নিয়ে তাঁর পরীক্ষার উন্নত সংস্করণ। এই সময়েই মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশ জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রতি আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মৌলানা আজাদের জন্ম হয় হিরাতে, তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তি এবং শিক্ষালাভ হয় মধ্যপ্রাচ্যে। এই ছিন্নমূলতা, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর অনুভূতিগত সাদৃশ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তিনি লক্ষ করেছিলেন, এসব কারণে তাঁকে স্বভাবতই করে তুলেছিল গান্ধীজীর একজন সহকর্মী ও অনুরাগী। গান্ধীজী মৌলানা আজাদ ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের এজাতীয় মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। বাঙালি মুসলমানদের জন্যে গান্ধীজীর এ পরীক্ষা হল বিরাট বিপর্যয়। প্রজা আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক, প্রধানত হিন্দু ভূস্বামীদের স্বার্থবিরোধী। গান্ধীজী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করে প্রজা-পার্টির নেতাদের নিজ আন্দোলন মুলতুবি রাখতে বাধ্য করলেন। তুরস্কে খিলাফতকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থতা, গাজী মুস্তফা কামাল পাশা কর্তৃক খিলাফতের অবসান ঘোষণা এবং খলিফা আব্দুল মজিদের নির্বাসন মুসলমানদের নিকট শুধুমাত্র আঘাতরূপেই আসেনি, খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর তাদের বিশ্বাসকেও কমিয়ে দিয়েছিল। নেতারা এভাবে তাঁদের অনুগামীদের নিকট হতে বিচ্যুত

www.nagorikpathagar.org

হয়ে পড়ায় কংগ্রেসে যোগদান ব্যতিরেকে তাঁদের গত্যন্তর রইল না। মুসলমানরা হতবুদ্ধি ও নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়ল। তারা ভাবল, তাদের নেতারা গান্ধীজীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার যে কারণ, তা হল—খিলাফত আন্দোলনের বিপক্ষে তাঁর প্রতিরোধমূলক মনোভাব, আর নিজেদের ভাগ্যনির্ণয়ে ভারতীয় মুসলমানদের নির্ভর করতে হবে নিজেদেরই উপর এবং এজাতীয় নির্বোধ আন্দোলনে নিজেদের জড়িয়ে না ফেলবার জন্যে তাঁর দৃঢ় উক্তি।

প্রায় এই সময়েই উগ্রপন্থীরা পুনরায় কংগ্রেসসমর্থক হলেন। ব্রিটিশের তরফ থেকে গান্ধীজীসহ কংগ্রেস নেতাদের কারাগারে প্রেরণ এবং কংগ্রেসকে বেআইনি প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করা ও তাদের দমননীতিমূলক সংকল্প এর জন্য দায়ী ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এই সময়ে এখানে-সেখানে ঘটছিল। এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত করেছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হবার পর থেকে তাদের কার্যকলাপকে বাধ্য হয়ে গোপনভাবে পরিচালিত করতে হল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মোজাফফরপুরের জেলা জজ কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিংসফোর্ড গাড়িতে ছিলেন না। তাঁর বান্ধবী মিসেস কেনেডি সেই বোমার আঘাতে নিহত হন। ধরা পড়ার ভয়ে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ১৯০৮ সালে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগে[১] অসংখ্য ভারতীয়দের হত্যাকাণ্ড এবং ১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় গণ-হাঙ্গামার পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারে উগ্রপন্থীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রদানে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু তাদের ধারণা হল, গান্ধীজীর অহিংসা নীতি—ইংরেজ সরকারের দমননীতি জনসাধারণের উপর কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। তারা দেখতে পেল, কিভাবে দেশীয় পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে জনসাধারণের উপর তাদের শাসনদণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। কেবল ব্রিটিশ কর্মচারীদের নয়, যেসব দেশীয় কর্মচারী এই অত্যাচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরও শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করল উগ্রপন্থীরা। তারা ক্লাব, ব্যায়াম সমিতি, স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি থেকে বহু তরুণ-তরুণী দলভারী করার জন্যে সংগ্রহ করল। দেশের ছেলেমেয়েরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রঙিন কল্পনা আর দলের নেতাদের সাহস ও নির্ভীকতায় আকৃষ্ট হল। দলের গোপনীয় কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন উভয়ই ছিল তাদের নিকট সমান আকর্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদীরা বেশ কয়েক শত অনুগত যুবক-যুবতীকে তাদের দলে টেনে নিতে সক্ষম হল। এইসব যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় দেশের জন্যে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত

১ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সম্রাটের দেওয়া 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন।

www.nagorikpathagar.org

ছিল। ১৯৩১ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ত্রাসবাদী যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুবরণ দেশবাসীর কাছে অসীম সাহস ও ধৈর্যের উদাহরণস্বরূপ হয়ে রইল। পিস্তল, বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহারে তাদের শিক্ষিত করে তোলা হল। এ ছাড়া শরীরকে কর্মক্ষম রাখার জন্যে তাদের নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতে হত। ডাকাতিলব্ধ টাকা-পয়সায় অস্ত্রশস্ত্র কেনা হত। ঐ টাকা-পয়সায় সমিতির অন্যান্য ব্যয়ও নির্বাহ করা হত। গোয়েন্দা বিভাগের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার ব্যাপারে সরকার সাফল্য লাভ করতে পারলেন না।

অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কার্যকলাপ বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ায় সুভাষচন্দ্র বসু 'নিউ ভাওলেন্স পার্টি' স্থাপন করলেন। এর সভ্যদের কাজকর্ম কলকাতা শহরেই সীমিত রইল। পরবর্তীকালে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ারস্' নামে এ প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ল বাংলার বিভিন্ন জেলায়। ঢাকা শহর হয়ে উঠল তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল। অনিল রায় ও লীলা নাগ (পরবর্তীকালে লীলা রায়) পরিচালিত শ্রী-সংঘ দলটিও সুভাষচন্দ্রের দলে যোগদান করে। চট্টগ্রামের যুগান্তর দলের একটি অংশও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টান্ত দেশের তরুণ-তরুণীদেরও অনুপ্রাণিত করল। দেশের জনসাধারণ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হল। প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা শহরের রাজপথে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণ হারালেন। তিনজন সন্ত্রাসবাদী রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে কারাগারসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মিঃ সিম্পসনকে হত্যা করল। শান্তি ও সুনীতি নামে দু'জন স্কুলের ছাত্রী কুমিল্লার জেলা-শাসককে হত্যা করল। বরিশালে এক স্কুলের ছাত্র জেলা-শাসক মিঃ ডোনোভানকে গুলি করল, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। ঐ জেলারই এক থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে এক স্কুলের ছাত্র মেরে ফেলল। উক্ত দারোগার দোষ ছিল—একটি দোকানের সম্মুখে পিকেটিং-এ রত কয়েকজন কর্মীকে তার বুটের তলে ফেলে দলন করেছিল। কামাখ্যা সেন নামে জনৈক পুলিশ কর্মচারী বিক্রমপুরের কয়েকজন স্বদেশকর্মী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর অত্যাচার করার দরুন কালিপদ মুখার্জী নামক এক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় তাকে গুলি করে মেরেছিল। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় ১৯৩৩ সালে তার ফাঁসি হয়। দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদণ্ড দেওয়ায় বিমল গুপ্ত দায়রা জজ মিঃ গার্লিককে গুলি করে হত্যা করে।

চট্টগ্রামে মাস্টারদা নামে সুপরিচিত সূর্য সেনের নেতৃত্বে একদল দুঃসাহসী সন্ত্রাসবাদী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য সংকল্প করে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডের রাত্রিতে তাদের ঈপ্সিত আক্রমণ মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হয়। কারণ তারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে পাহাড়ের অন্তরালে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দলীয় কোনো লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় তারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি। কল্পনা দত্ত ও অন্যান্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইতিপূর্বে ছাব্বিশ বর্ষীয়া তরুণী প্রীতিলতার নেতৃত্বে আর একটি দল ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ করে। সেই সময় ক্লাবে ইউরোপীয়দের প্রমোদ অনুষ্ঠান চলছিল। উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রীতিলতা ধরা পড়েন। অত্যাচার এড়ানোর জন্যে তিনি তাঁর কানের গহনার ভিতরে লুকানো বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

বাংলাদেশের অন্যান্য অংশেও দুঃসাহসিকতামূলক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় বক্তৃতাকালে প্রদেশপাল জ্যাকসনকে বীণা দাস নামে একজন ছাত্রী গুলি নিক্ষেপ করে। প্রদেশপালের গায়ে গুলি লাগল না, কিন্তু তাকে বাঁচাতে গিয়ে উপমহাধ্যক্ষ কর্নেল হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী আহত হলেন। এই বীরত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। দার্জিলিং-এ ঘোড়দৌড়ের ময়দানে পরবর্তী প্রদেশপাল স্যার জন অ্যান্ডারসনকে লক্ষ্য করে ভবানী মুখার্জি গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু ধরা পড়ে তার ফাঁসি হল ১৯৩৪ সালে। বড়লাটের গাড়িতেও হাতবোমা নিক্ষেপ করা হল। সন্ত্রাসবাদীদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে হরিপদ ভট্টাচার্য নামে একজন পনেরো বছরের কিশোর আহ্‌সানউল্লাহ নামে একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরকে গুলিতে নিহত করে। ইংরেজ সরকার এই ঘটনার উপর সাম্প্রদায়িকতার রং দিলেন এবং এর সুযোগ নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ককে বিষিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। এর ফলে শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অগ্রগতিকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করল।

আমাদের ঐতিহাসিকরা উপরোক্ত যুবক-যুবতীদের বীরোচিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ একদিন লিপিবদ্ধ করবেন। রাজনীতিক পণ্ডিতেরা বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ করবেন। ঐ আন্দোলন কতখানি অপরিণত ছিল বা এ আন্দোলন পরিচালনায় আবেগ, মানসিক চাঞ্চল্য এবং ভাবপ্রবণতা কতখানি সক্রিয় ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। এজাতীয় হিংসাত্মক কাজের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে রাজনীতিবিদেরা একে অপরের সঙ্গে একমত হবেন না ঠিকই, কিন্তু এর সবখানিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের কাজকর্ম মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯২৯ সালে ভারতকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের মর্যাদা দেবার জন্যে সুপারিশ করে বিবৃতি দিলেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ফলে ১৯৩১–৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠকগুলি ডাকা হল। ১৯৩৩ সালে শ্বেতপত্র এবং ১৯৩৪ সালে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল ; ১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন আইন পাশ হল। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতার জন্যেই কেবল এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন সম্ভব হয়নি— অন্যান্য কারণও ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল। বিলেতি দ্রব্য বর্জন করায় ইংরেজ সরকার স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলেন। এর ফল হল ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন, যা

www.nagorikpathagar.org

বলবৎ হয় ১৯৩৭ সালে।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আরও দু'জন বিপ্লবীর দ্বারাও বাংলাদেশের যুব-সম্প্রদায় প্রভাবান্বিত হয়। এঁরা হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় ও কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ।

মানবেন্দ্রনাথ রায় 'কমিউনিস্ট' পার্টির সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' সংগঠনের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তিনি একজন মস্ত বড় তত্ত্ববাদী ছিলেন এবং নিখিল বিশ্বের 'কমিউনিষ্ট' আন্দোলন তাঁর কাছে বহুলাংশে ঋণী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হল আর্য ব্রাহ্মণত্বের এবং তিনি ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক দার্শনিক হয়ে পড়লেন। কমিউনিস্ট মতবাদ সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তি হবার পর তিনি একটি নূতন মতবাদের জন্ম দিলেন, যা 'নয়া মানবতা' নামে পরিচিত হল। তাঁর নয়া মানবতার ধর্মে মানুষ কল্পিত হল প্রাকৃতিক আইন-শাসিত এমন এক জগতের অধিবাসীরূপে, যেখানে তার ভূমিকা হচ্ছে সক্রিয়। এই মানবতাবাদ নিঃসন্দেহে সমাজমুখী, এর আবেদন হল শাসন বা বন্ধনমুক্ত সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক পুনর্গঠন। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে না জড়ালেও এর উদ্দেশ্য হল বন্ধন-মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে পরিচালিত করা। এই মতবাদ ফলপ্রসূ সমাজের ধারণাকে ব্যাপক অর্থে সম্প্রসারিত করে। এই মতবাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক—উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিভূস্বরূপ এক আদর্শ রাষ্ট্রের ওকালতি করে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পূর্বেও মানবতাবাদ প্রচারিত হয়েছে বহুদেশে, বহু লোকের দ্বারা। কিন্তু তিনি হলেন প্রথম মানবতাবাদী যাঁর মতবাদ মার্কস্‌বাদ থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় মানবতাবাদে। স্বভাবতই তাঁর মানবতাবাদ হল এক নূতন মতবাদ, যার সঠিক সংজ্ঞা মানুষের মৌলিক মানসিক শক্তির কাছে আবেদন করে ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে জীবন ও নিখিল জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত হল, মানুষের অস্তিত্ব কল্পিত হবে কেবলমাত্র মানবসমাজের বিস্তৃতিরূপে—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত মানবীয়তা।

মানবেন্দ্রনাথ দাবি করলেন, স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মী এবং সচেতন নাগরিককে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সংগ্রাম করতে হবে স্বাধীনতার জন্যে। কোনো দেশের স্বাধীনতা বলতে কেবলমাত্র অধীনতার অবসানই বোঝাবে না ; বোঝাবে সে-দেশের সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে সহিষ্ণুতা ভিন্ন কোনোপ্রকার স্বাধীনতা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্যই নয়, সংখ্যালঘুদের জন্যেও বটে। ন্যায়পরায়ণতা ভিন্ন জীবন ও স্বাধীনতার নিরাপত্তা সম্ভব নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যভাবে কাজ করা হবে প্রত্যেক সুস্থ নাগরিকের ধর্ম। তিনি বলতেন, সকল প্রকার অবিচারের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হবে ; যে-আইন পক্ষপাতিত্বমূলক সমাজগঠনে সহায়তা করে, তাকে প্রতিহত করার জন্যে জনসাধারণকে

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা দেওয়া হবে অবশ্যই কর্তব্য। তিনি মনে করতেন যে, সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি নাগরিকের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে রাজনৈতিক দলগুলির দেশবাসীকে শিক্ষিত, সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। নিপীড়িত জনসাধারণের পক্ষাবলম্বন করে সকল প্রকার জুলুম, অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। নিপীড়িতদের সপক্ষে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ; কিন্তু ঘৃণা করা চলবে না কোনো মানুষকে। মানবসমাজকে বাঁচাতে হলে আমাদের সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে।

ভারত, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক ও শ্রমিক সমিতি গঠনকারীদের উপর এক সময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অপরিসীম প্রভাব ছিল। মুসলিম সাংবাদিক ও শ্রমিক সমিতির নেতাদের উপরও তাঁর ছিল বিশেষ প্রভাব। তদানীন্তন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের নিকট তিনি জনপ্রিয় হন তাঁর লেখা বই 'The Historical Role of Islam'-এর মাধ্যমে। কমিউনিস্ট মতবাদকে ভয় করে, অথচ সাধারণ মানুষের সেবার্থে যারা কাজ করতে চায়, তারা তাঁর চারিপার্শ্বে এসে জমায়েত হল।

কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ প্রারম্ভে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতোই বিপ্লবী সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এখনও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করেছেন বহুকাল এবং তিনি ছিলেন উভয়ত সরেজমিনে কাজ করার পক্ষপাতী এবং তত্ত্ববাদী। চাষীদের সঙ্গে তিনি যখন আলোচনা করতেন তখন মনে হত তাদের মতোই তিনি একজন, কখনও মার্কস্‌বাদী তত্ত্ব নিয়ে তাদের সাথে কোনো কথা বলতেন না। যুক্তি-কৌশলের উল্লেখ না করে তিনি মার্কসীয় পদ্ধতিতে বস্তুর বিশ্লেষণ করতেন। তিনি কৃষকদের যেমন চিনতেন, তারাও তেমনি তাঁকে চিনেছিল। তিনি তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাতেই কথা বলতেন এবং তাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন। তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজাপার্টির নেতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, শ্রেণী-সংগ্রামে যদি তাদের আস্থা না থাকে তা হলে তাঁরা রায়ত ও ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্যে কিছুই করতে পারবেন না। তিনি তাঁদের আরও বলতেন যে, তাঁরা যেন শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন ; তা না হলে এদের মুক্তি কোনোদিন হবে না। প্রজা নেতাদের তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশের উপর নির্ভর করে তাঁরা যেমন একবার ১৯১১ সালে ঠকেছিলেন, তেমনি কংগ্রেসের উপর নির্ভর করলেও তাঁদের ঠকতে হবে। কৃষক প্রজাদের আত্মনির্ভরশীল না করলে তাদের মুক্তি হবে না। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ বাংলার প্রজা আন্দোলনকে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি এমনও দাবি করেন যে, নিজ সমাজের নিরাপত্তার জন্যেই বুর্জোয়াসম্প্রদায় সামাজিক অভিযোগের প্রতিবিধান দাবি করে। তারাই হয় সাধারণত লোকহিতৈষী, মানবতাবাদী এবং সংস্কারক। সমাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা, তাঁর মতে, কোনরূপ সংগ্রাম বা বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চায়। বিপ্লবাত্মক ও ভঙ্গুর

www.nagorikpathagar.org

উপাদান বাদ দিয়ে সমাজের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটা হচ্ছে তাদের কাম্য। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শ্রমিক- শ্রেণীর চোখে বিপ্লবাত্মক যে-কোনো আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা তারা করে। তাদের প্রতিপাদ্য হল, তাদের উপকার বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তনেই সম্ভব, কোনো রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে নয়। তারা বিশ্বাস করে সেইসব সংস্কারে যা কোনোপ্রকারেই পুঁজিবাদী ও শ্রমিকের সম্বন্ধকে প্রভাবান্বিত করে না ; বড়জোর উৎপাদনের খরচ কমায় এবং বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসন-ব্যবস্থা সহজ করে দেয়। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ আজ বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জনক বলে স্বীকৃত। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র তাঁর অনুরাগী ভক্তদের দেখা যায়। এই উপমহাদেশে আধুনিক সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন আর কৃষক আন্দোলন উভয়ই হচ্ছে প্রধানত তাঁর অবদান। দিনাজপুর ও রংপুরের সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন এবং স্বাধীনতালাভের অনতিপূর্বে শস্যের ভাগের বৃহদাংশ দাবি করে জোতদারদের সঙ্গে কৃষকরা যে তে-ভাগা আন্দোলন করেছিল, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের মতো লোকের দ্বারা একত্রিত ও সংগঠিত হলে কৃষকেরাও কতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

জনাব আবুল হোসেন ও অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদের নেতৃত্বে কতিপয় নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক আর কয়েকজন শিক্ষক ১৯২৬ সালে একটি সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে পরিচিত হয়। এঁদের আদর্শ ছিল বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তির জন্যে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করা এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে যুক্তিবাদী মননশীল সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করা। এর উদ্যোক্তারা ধর্মপ্রচারকদের অনুরূপ উদ্দীপনা, সাহস আর বিশ্বাস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। নিছক যুক্তিবাদী আন্দোলন হলেও এর নেতারা ঢাকার নবাবের নির্দেশে পরিচালিত মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। একথা অবশ্য সঠিক জানা যায়নি যে, উপরোক্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদার "Declaration of Independence of the Spirit"-এর দ্বারা কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল :—

"We serve truth alone which is free with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste. Of course, we shall not dissociate ourselves from the interests of Humanity. We shall work for it, but for it as a whole. We do not recognise nations, we recognise people—one and universal—the people who suffer, who struggle, who fall and rise again, and who ever march forward on the rough road drenched with sweat and blood, the people comprising all men, all equally our brothers."

[Rolland and Tagore]

১৯১৯ সালের উপরোক্ত ঐ ঘোষণাটিতে রমাঁ রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি, লেখক এবং কতিপয় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষীরা স্বাক্ষর করেন।

এইসব আন্দোলনের যুগে কংগ্রেসও অলস ছিল না। গান্ধীজী ছিলেন কুটিরশিল্পে বিশ্বাসী ; অতএব কংগ্রেস খাদি আন্দোলন আরম্ভ করল। তাঁর অনুরক্ত ভক্তেরা বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। বিলেতি মিহি সুতার কাপড় বর্জন করে স্বহস্তে বোনা দেশীয় কাপড় ব্যবহার করতে সকলকে উৎসাহিত করা হল। অনেক কংগ্রেসকর্মী জাপান থেকে বস্ত্র বয়নসংক্রান্ত শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে দেশে ফিরে এলেন। তাঁরা বাংলাদেশে প্রায় এক ডজন কাপড়ের কল স্থাপন করলেন এবং বহু লোক—যাঁরা স্বদেশপ্রেমের অপরাধে সরকারি চাকুরিতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তাঁরা ঐসব মিলগুলিতে চাকুরি পেলেন। ১৯২০ সালে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা এখন সমাজগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁদের দলগত বাণী হল "গ্রামে ফিরে যাও"। বহুলোক শিক্ষাদানের কাজে নিজদিগকে উৎসর্গ করলেন। গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন এবং নিজেদেরকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত রাখলেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের সপক্ষে তাঁরা ওকালতি করলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রবর্তন করলেন। পাশ্চাত্যের লোকের মতে এসব ছিল প্রগতিবিরোধী আন্দোলন। কারণ, আধুনিক যুগের প্রবণতা হচ্ছে নাগরিকীকরণ, শিল্পায়ন এবং কেন্দ্রীয়করণের দিকে। বৃহদাকার কলকারখানায় আস্থাহীন গান্ধীজী ভারী শিল্পের চেয়ে কৃষিকাজ এবং কুটিরশিল্পের প্রতি নজর দেওয়া উচিত মনে করতেন।

এই সময়ে শ্রেণীগত সংস্থাগুলি, যথা—জমিদারদের সমিতি, বণিকসভা, শিক্ষক সমিতি, আইনজীবীদের সংস্থা প্রভৃতিরও উদ্ভব হচ্ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ স্বার্থের নিরাপত্তাবিধানে সচেষ্ট হল। যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে সাহায্য করল।

হিন্দু উগ্রপন্থীরা কংগ্রেস বা কমিউনিস্টদের পিছনে পড়ে রইল না, তারা আর্যশুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন শুরু করল, যার প্রচেষ্টা হল তাদের নিজের ধর্মে মুসলমান বা অনান্য ধর্মাবলম্বীদের দীক্ষা দেওয়া। এর ফলে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯২৬ সালে শুরু হল, তা বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় চলতে থাকল। এজাতীয় উগ্রপন্থী আন্দোলনের দরুন স্পষ্টতই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের মধ্যে পুনরভ্যুদয়ের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করা হল। মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো, দোলপূজার সময় মুসলমানদের কাপড়ে রং ছড়ানো আর গো-বধ উপলক্ষ করেই বাংলার প্রতিটি শহরে প্রতি বছর দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগত।

১৯২৯ সালে স্থাপিত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠনের কাজ আরম্ভ করল। ক্রমশ এটা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল, কিন্তু ১৯৩৪ সালে এর সভাপতি স্যার আবদুর রহিম কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্পীকারের

www.nagorikpathagar.org

পদ গ্রহণ করার পর সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। তাঁর এই পদত্যাগে প্রতিষ্ঠান অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ল। বর্ধমানের খান বাহাদুর আবদুল মোমেন এবং এ. কে. ফজলুল হক উভয়েই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ চাইলেন। মৌলানা আকরম খাঁ-সহ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ প্রতিনিধি খান বাহাদুর আবদুল মোমেনকে সমর্থন করলেন, আর পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা ফজলুল হককে সমর্থন করলেন। ১৯৩৫ সালে সমিতির অধিবেশন ময়মনসিংহে ডাকা হল। তাঁর অনুগামীদের প্রচেষ্টায় ও দক্ষতায় ফজলুল হক সভাপতিত্ব লাভ করলেন। এর ফলে মৌলানা আকরম খাঁর সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্ক শুধু যে তিক্ত হল তা-ই নয়, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরাও একে অপরকে ভুল বুঝলেন।

১৯৩৫ সালে প্রজা সমিতির মধ্য থেকে আর একটি আন্দোলন গজিয়ে উঠল। সমিতির বামপন্থীরা দাবি করলেন—প্রতিষ্ঠানে ঢোকাতে হবে প্রকৃত কৃষকদের আর সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখতে হবে কৃষক প্রজা পার্টি। এই দাবি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং কুমিল্লার প্রতিনিধিরা সমর্থন করলেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে মতবিরোধ এড়ানোর জন্য ১৯৩৬ সালে এ দাবি মেনে নেওয়া হল। "জমি কার? যে চাষ করে তার"—এই হল বামপন্থী সভ্যদের বুলি। জমিদার ও তালুকদারেরা ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ফজলুল হক একজন তালুকদার হওয়া সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টিতেই থাকলেন এবং সাধারণ নির্বাচনে ঐ দলের নেতা হিসাবেই থাকবেন সিদ্ধান্ত করলেন। তাঁর দলের রাজনীতিবিদরা জিদ করলেন, কৃষকদের অসুবিধা দূর করার জন্যে তিনি যে যে পন্থা অবলম্বন করবেন—তার বিবরণসহ একটি কর্মসূচি তাঁকে ঘোষণা করতে হবে। তিনি তাঁদের কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন যে, বাংলার মুসলমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা—দু'বেলা দু'মুঠো ডালভাতের যোগাড় ; তাই তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রজাসাধারণের জন্যে ডালভাতের ব্যবস্থা করা। কৃষকশ্রেণীর সমর্থন ব্যতিরেকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়—একথা উপলব্ধি করে তিনি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেয়ে কৃষকদের উপর বেশি নির্ভর করলেন। মুসলিম জনসাধারণের উপর অন্যান্য নেতাদের তুলনায় তাঁর প্রভাব অনেক বেশি ছিল, কারণ অন্যান্যরা যেখানে ইসলামের উপর বক্তৃতা দিতেন, তিনি সেখানে আলোচনা করতেন গরিবের ডালভাতের সমস্যা নিয়ে।

১৯৩০ সালে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত একটি মুসলিম অঞ্চলের ছবি তুলে ধরলেন। ইকবাল একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব আদৌ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন নিরপেক্ষ ভারতীয় স্থল ও নৌবাহিনী কর্তৃক রক্ষিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের জন্য অধিকতর পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন। এলাহাবাদে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি নিরপেক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা মুসলিম সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি করবে এবং দেশ আক্রান্ত হলে ভারতীয় মুসলিমরা সীমান্তপারের স্বধর্মীদের সঙ্গে

www.nagorikpathagar.org

যোগ দিতে পারে—এমন কোনো সন্দেহ থাকলে তারও শেষ পর্যন্ত নিরসন হবে।" ইকবাল একথাও সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যে, তাঁর পরিকল্পিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা রাজনীতি পরিচালনা বন্ধ হবে, যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান একই রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করবে। এরপরে চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৩ সালে 'Now or Never' পুস্তিকায় পাকিস্তান পরিকল্পনা পেশ করেন। পাকিস্তান নামের উৎপত্তির মূলে ছিল পাঞ্জাব, আফগানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু, তুখারিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি নামের প্রথম অক্ষর এবং বেলুচিস্তানের শেষ অক্ষর। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার স্বায়ত্তশাসনে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশকে গণনার মধ্যে আনা হয়নি। ইকবাল তাঁর ১৯৩৭ সালের ২১শে জুন তারিখে জিন্নাহ্ সাহেবের নিকট লেখা পত্রে বাংলাদেশের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করে বলেন, "অন্যান্য জাতির মতো ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও বাংলার মুসলমানেরা কেনই বা জাতিসমূহ হিসাবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে না?"

ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের মধ্যে এক দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে সক্ষম হলেন যে, স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণে বাংলার মুসলিম নেতারা যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম। প্রতিভাবান ও খাঁটি লোক নিয়ে গঠিত একটি দল হিসাবে কাজ করে বাংলার মন্ত্রিসভা আশ্চর্যরকম সাফল্য লাভ করে। দলবদ্ধভাবে কাজ করার দরুন কৃষকদের উপকারের জন্যে কয়েকটি আইন পাশ করা সম্ভব হয়েছিল, যার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই সময়েই (১৯৩৭-১৯৪১) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন, বঙ্গীয় ভূমিহীন প্রজা আইন, বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন, মহাজনী আইন, শ্রমিক মঙ্গল আইন ইত্যাদি পাশ হয়।

১৯৩০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম গোলটেবিল বৈঠক জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের পক্ষে নৈরাশ্যজনক হল, যেমন হয়েছিল গান্ধীজীর জন্য দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক। গান্ধীজী বলেছিলেন, যে সকল প্রতিনিধিরা গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরা কেউ দেশবাসীর দ্বারা নির্বাচিত নন, তাঁরা মহামান্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভদ্রলোক যাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশের তাঁবেদারি করার জন্যে ব্যস্ত। বিভ্রান্ত মন নিয়েই অবশ্য জিন্নাহ্ সাহেব জাতীয় নেতার ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা করে জিন্নাহ্ সাহেব ব্যর্থ হলেন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে ভুল বুঝল। মুসলমানেরা ভাবল—তিনি হিন্দুদের পক্ষে, আর হিন্দুরা মনে করল যে তিনি ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ছেন। তিনি ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং দেশীয় রাজন্যবর্গকে গালি দিলেন, কিন্তু মুসলমানদের দাবি পূরণ না করে তাদের হতাশ করলেন। এর ফলে তিনি একান্তই একা হয়ে পড়লেন। তিনি এত হতাশ হয়ে পড়লেন যে, তিনি স্থির করলেন—আর তিনি দেশে ফিরবেন না, বিলাতেই চিরদিনের জন্য থেকে যাবেন। বাংলার মুসলমানেরা দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ফজলুল হক ও হুসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতিনিধিত্ব দাবি করলেন, যদিও এঁদের সাথে তখন কোনো রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

দলের সম্পর্ক ছিল না।

ব্রিটেন কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৩২ সালের ৪ঠা আগস্টের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর ঐ বৎসরই ২৪শে সেপ্টেম্বর 'পুনা প্যাক্ট' সম্পাদিত হল। এই প্যাক্টে নিশ্চিতভাবে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে অনুন্নত বা তপসিলী সম্প্রদায়ের সাধারণ ও বিশেষ প্রতিনিধিত্ব আদায় করা হল। এই প্রতিনিধিত্বের জন্যে গান্ধীজী যারবেদা জেলে ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশনের ভয় প্রদর্শন করেন। পুনা প্যাক্ট গান্ধীজীর জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য। কারণ ১৯৪৭ সালে তাঁর উক্তি হতে জানা যায় যে, ঐ প্যাক্ট তখন স্বাক্ষরিত না হলে ভারত ধ্বংস হয়ে যেত, তপসিলী বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা এই উপমহাদেশে পৃথক এক রাষ্ট্রের দাবি করতে তাদের পরিচালিত করত। গান্ধীজী তাঁর অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে অনুন্নত সম্প্রদায়কে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর ভিতর নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন।

১৯৩৫ সালে নূতন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসম্বলিত এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত অনুবিধি ও তাদের রক্ষাকবচের শর্তাবলীসহ ভারত-শাসন আইন পাশ হল। নূতন গঠনতন্ত্রটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয়। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম তালিকায় ক্ষমতাবণ্টনের তিনটি বিস্তারিত তালিকা রইল, তার সঙ্গে রইল আইনের ব্যাখ্যা ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। কিন্তু নূতন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা হবে দেশীয় রাজ্যসমূহের সংযোজনের উপর নির্ভরশীল এবং যতদিন তা না হবে, ততদিন পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাই কার্যকর থাকবে। আপাতত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থা হল দায়িত্বশীল প্রাদেশিক সরকার স্থাপন, ১৯১৯ সালে সৃষ্ট দ্বৈতশাসনের বিলোপ এবং প্রদেশপাল কর্তৃক নিযুক্ত অথচ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এরপর ১৯৩৪ সালের শেষদিকে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে জিন্নাহ্ সাহেব দেশে ফিরলেন। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ব্যর্থতার সঙ্গেই জাতীয় নেতা হবার স্বপ্ন তাঁর শেষ হয়েছিল। তিনি অবশেষে স্থির করলেন, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকার নিচে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঙ্গঠিত করবেন। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত-শাসন আইন পাশ হল। জিন্নাহ্ সাহেব মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ভূমি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলেন এবং ভারতের সর্বত্র মুসলিম নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মহামান্য আগা খাঁর সভাপতিত্বে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম নেতাদের এক বৈঠকে যোগদান করলেন। তিনি সেখানে শুধু বিভিন্ন নেতার বক্তব্য শ্রবণ করলেন কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। স্যার ওয়াজির হাসানের সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। জিন্নাহ্ সাহেব এক বক্তৃতায় ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের সমালোচনা করলেন। কিন্তু তিনি মুসলিম লীগকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

সমাধানের জন্য ১৯২৯ সালে তাঁরই সভাপতিত্বে গৃহীত মুসলিম লীগের ১৪ দফা সম্ভবত এর ভিত্তি ছিল। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় অবশ্যই লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ছুরিকাঘাত থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থতা অনুভব করল। কিন্তু তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতই রইল—এজন্যে যে, তাদের জন্যে এই রোয়েদাদ অনুসারে শতকরা ৪৮টি আসন সংরক্ষিত হল। কিন্তু তাদের আসনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল শতকরা ৫৫টি।

নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার ব্যবস্থা করার জন্যে একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হল। স্বয়ং জিন্নাহ্ সাহেব এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রথম কাজ হল—ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে সর্বশ্রেণীর মুসলিম নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। তিনি সমগ্র ভারত, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলিতে সফর করলেন।

ইস্পাহানি পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে তিনি কলকাতায় এলেন। প্রকৃতপক্ষে তখন বাংলাদেশে মুসলিম লীগের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর কলকাতা আগমনের অনতিপূর্বেই বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে 'বেঙ্গল ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ্ এর নামমাত্র নেতা ছিলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন এই দলের প্রাণস্বরূপ। ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টিতে রয়ে গেলেন। তিনি ছাড়া অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম নেতারা এই সম্মিলিত মুসলিম দলে যোগদান করলেন। কেন্দ্রীয় লোকসভায় সরকারি দলের সহায়তায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাবকে নাকচ করে জিন্নাহ্ সাহেব মুসলিম ভারতের ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হলেন। অতএব তিনি বাংলাদেশে আগমন করলে নেতারা তাঁর সঙ্গে প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করলেন। তাঁর উপদেশ ও সনির্বন্ধতায় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি মুসলিম লীগে পরিণত হল। ফজলুল হক কিছুদিন আলোচনা চালালেন। অবশেষে তিনি স্থির করলেন, কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হিসাবে তিনি নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবেন।

কিছুদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের এক সভায় ফজলুল হক আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। বাঙালি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্যে তিনি অবাঙালি মুসলিম বণিক সম্প্রদায়কে দায়ী করলেন। তিনি বললেন, কলকাতার অবাঙালি ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যে বাঙালি মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। তারাই তাঁর নিজের এবং তাঁর পার্টির তরফ থেকে সংযুক্ত পার্লামেন্টারি বোর্ডে যোগদান করা অসম্ভব করে তুলল। সর্বোচ্চ তিরিশ জন সভ্য নিয়ে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করার আহ্বান থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়, যাতে তার মধ্যে মুসলিম মজলিশ এবং এরূপ ধরনের কলকাতা-ভিত্তিক দলগুলিকে স্থান দেওয়া যায়। প্রথমে যদিও তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

তিনি শীঘ্রই তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে সিদ্ধান্ত করলেন, মুসলিম ঐক্যের নাম দিয়ে বাংলার মুসলিম জনসাধারণ আর বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রভুত্ব করতে এবং তাদের শোষণ করার জন্যে তাদের তিনি কোনো সুযোগ দেবেন না। ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি পার্লামেন্টারি বোর্ডের জন্যে ছয় জনকে মনোনীত করলেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন—ঢাকার নবাব, স্যার নাজিমুদ্দিন ও খাওজা শাহাবুদ্দিন একই পরিবারের লোক ছিলেন। অপর তিনজন—সোহ্‌রাওয়ার্দী, স্যার এ. এফ. রহমান, মৌলানা আকরাম খাঁ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আরও বললেন, তিনি যে ছয়টি নাম দিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন মুসলিম জনসাধারণের মনোনীত প্রকৃত নেতা এবং এদেশেরই সন্তান। তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন সৈয়দ নওশের আলী, তমিজুদ্দিন খন, শাসুদ্দিন আহ্‌মদ, সৈয়দ হাসান আলী, সৈয়দ বদরোদ্দোজা এবং তিনি স্বয়ং। কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা হল না। কারণ, পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভ্যরূপে এম. এ. ইস্পাহানি, হাসান ইস্পাহানি, আজিজ আনসারী, খাওয়াজা নুরুদ্দীন, আব্দুল্লাহ্ গাঙ্গী আর সিকান্দর দেহ্‌লভী মনোনীত হলেন। এঁদের নাম উল্লেখ করার পর ফজলুল হক ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন—তারা এসকল মনোনীত সভ্যদের চেনে কি না। তাঁর প্রশ্ন হল, তাদের (ছাত্রদের) কি বলা উচিত হবে যে, তিনি বাংলার মুসলমানদের উপর অবাঙালি ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেবেন?

এই সময়ে জিন্নাহ্ সাহেবও ঢাকায় আগমন করেন, কিন্তু ঢাকার কম লোকই তাঁকে চিনত এবং ঢাকা রেল-স্টেশনে যারা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল—তাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কার্জন হলে ছাত্রসভায় তাঁকে নিয়ে আসার জন্য যে মাত্র একখানি গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল, তা সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের প্রভোস্টের ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের প্রধান এম. আই. বোরাহ্ কার্জন হলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। জিন্নাহ্ সাহেব সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের ছাত্রদের সম্মুখেও বক্তৃতা করেন। এই উভয় সভাতেই তিনি মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির ব্যাখ্যা করেন এবং তা পুরোপুরি একটি জাতীয় কার্যক্রম—একথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন। কার্জন হলে মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে বললেন :—

মুসলিম লীগের দাবি হল—ভারতবাসীদের জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ঐক্য সম্পাদন এবং হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনকভাবে বিরোধের নিষ্পত্তিকরণ। তিনি বললেন, আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর জাতীয় স্বায়ত্তশাসন এরই উপর গঠন করা এবং বজায় রাখা যেতে পারে। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, দু'দলের আদর্শ হল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। কোনো আত্মসম্মানী ভারতবাসীই বিদেশী প্রভুত্বকে মেনে নিতে পারে না।

এরপর বাংলাদেশে একটি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয় এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী এর সম্পাদক হলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী একজন অতি দক্ষ সংগঠক ছিলেন। পার্টি সংগঠনের জন্যে কলকাতাত্যাগে অনিচ্ছুক, অনড়, কিন্তু ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নির্বাচনে সাফল্য লাভ করতে উদ্‌গ্রীব—এইসব দলীয় নেতাদের সহযোগিতায় নির্বাচনে

www.nagorikpathagar.org

জয়লাভ করবেন, এ আশা তিনি কখনোই করেননি। মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাঙালি মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে কোনো সংযোগ ছিল না। একমাত্র দৈনিক আজাদ সম্পাদক মৌলানা আকরাম খাঁ ব্যতীত এঁদের কেউই অধিকসংখ্যক বাংলাভাষী মুসলিম জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না। সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, যদি তাঁরা গণসংযোগ থেকে বিরত থাকেন, তা হলে তাঁদের সব প্রচারকার্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

কৃষক প্রজা পার্টির নেতাদের মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে অনেক বেশি সংযোগ ছিল। বাংলাদেশের সর্বত্র তাঁরা বক্তৃতা করে বেড়ালেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা আর কঠোর শ্রমের পুরস্কার হল মুসলিম লীগের ৩৮টি আসন লাভ। আর ফজলুল হকের দল লাভ করল ৩৯টি আসন। মুসলিম লীগ পার্টির অন্যতম নেতা স্যার নাজিমুদ্দিন পটুয়াখালিতে এক সরাসরি নির্বাচনদ্বন্দ্বে জনাব ফজলুল হকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন, যদিও অনুমান করা হয়েছিল উক্ত এলাকা নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্যে তাঁর পক্ষে সুবিধাজনকই হবে। মুসলিম লীগের সৌভাগ্যবশত ৩৭ জন স্বাধীনভাবে নির্বাচিত সভ্যের মধ্যে ২১ জন মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এবং ১৬ জন কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগদান করলেন। এর ফলে বিধানসভায় মুসলিম লীগ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হল। কংগ্রেস ৬০টি আসন লাভ করে প্রথম হল। কৃষক প্রজা পার্টির মোট সভ্যসংখ্যা হল ৫৫ জন।

১৯৩৭ সালের ব্যাপক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রাদেশিক নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে বিশেষ সাফল্য আনল। এগারোটি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস পাঁচটিতে পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। তা ছাড়াও কংগ্রেস বোম্বাই-এ সমর্থকদের সহায়তার মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেসের বন্ধুস্থানীয় লালকোর্তারা ক্ষমতাসীন হল। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি সফল হল। শুধু বাংলাদেশে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করল। কিন্তু এটাও কংগ্রেস নৈরাশ্যজনক বলে মনে করল।

মুসলিম লীগের এতগুলি আসন লাভের কারণ—তাদের তিনখানি সংবাদপত্রের প্রভাব নয়, কিংবা সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরাট সংগঠন-ক্ষমতাও নয়। উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেকার তীব্র প্রতিযোগিতাই হল এর আসল কারণ। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঈর্ষা আর রেষারেষি মুসলমানদের ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের জন্যে কাজ করতে বাধ্য করে। তারা মুসলিম লীগ নেতাদের গুণে খুব একটা মুগ্ধ ছিল না।

ছোটলাট কংগ্রেস দলের নেতা শরৎ বসুকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে আহ্বান করলেন এবং মন্ত্রিসভা গঠনে তিনি সম্মত আছেন কি না জজ্ঞাসা করলেন। শরৎ বসু ছোটলাটকে জানালেন, তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে অনিচ্ছুক। কারণ কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নয়, আর তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে নারাজ।

www.nagorikpathagar.org

কৃষক প্রজা পার্টির সভ্যরা কংগ্রেসের সমর্থন চেয়ে ঐ দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতা কর্মসূচি সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার জন্যে ছিল না, কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে একমত না হওয়ার দরুন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মন্ত্রিসভায় কোনো আসন দাবি না করেও কংগ্রেস ফজলুল হককে সমর্থন করার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু তাদের শর্ত হল, সরকারের প্রথম কাজ হবে রাজবন্দীদের বিশেষ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তিদান। প্রজাদলের নেতাদের কাছে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হল না। মুসলিম লীগ তখন কংগ্রেস আর প্রজাদলের সম্মিলিত শক্তির বিপদ উপলব্ধি করে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রদানে স্বীকৃত হল, যদিও তাঁর দলই পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

ছোটলাট এরপর ফজলুল হকের উপর মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলেন। দশ জন মন্ত্রী নিয়ে ফজলুল হক সরকার গঠন করলেন। ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাঞ্জাবের স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান, আসামের স্যার সাদুল্লাহ্ ও বাংলার ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এবং ফজলুল হক বাংলাদেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিপদে বরণীয় হলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সেক্রেটারি হলেন। এই দুই নেতার মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া হল এবং তাঁদের মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকাকালে পদদলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে যা করা সম্ভব তার জন্যে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। পরিষদে হিন্দু-মুসলিম চাষী ও প্রজাদের মহা উপকারী অনেক আইন পাশ হল। কৃষক প্রজা পার্টি চলে গেল বিস্মৃতির অতলতলে। ফজলুল হক কোনো প্রতিষ্ঠানে আস্থাবান ছিলেন না। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সব কাজের কৃতিত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করলেন। ফজলুল হক অন্তরে ছিলেন একজন বিদ্রোহী। নিয়ম-কানুনদুরস্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকা তাঁর মেজাজবিরুদ্ধ ছিল। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবনের পথে দলীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি বাধা বলে গণ্য করতেন। অপরদিকে, সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠানের জন্য যথাসাধ্য কাজ করতেন।

তদানীন্তন মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংগঠনে বিশ্বাসী ছিলেন। কি করে এই দু'জন নেতা চার বছর একত্রে কাজ করতে পারলেন—তা সত্যই বিস্ময়কর। বোধ হয়, এই মিতালি উভয়ত সুবিধাজনক ছিল। ফজলুল হক চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাতে, আর তাঁর সঙ্গে কাজ করে গ্রামবাংলার সঙ্গে অধিকতর পরিচিত হওয়াই সোহ্‌রাওয়ার্দীর অভিপ্রায় ছিল। সেই সময়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলার অধিবাসীদের ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের মাধ্যমে পরিচিত হতে চাইলেন।

বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা সাধারণ লোকের মনে অনেক আশা জাগাল, বাড়িয়ে দিল তাদের আত্মবিশ্বাস। হীনম্মন্যতা বর্জন করে নিজেদেরকে তারা হিন্দুদের সমকক্ষ করতে সক্ষম হল। পরিষদে ফজলুল হক আর সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তৃতা কংগ্রেসের হিন্দু নেতা ও হিন্দুমহাসভার নেতাদের বক্তৃতার তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ছিল। তাঁদের বলিষ্ঠতা ও

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞান, তীক্ষ্ণতা আর বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতার ক্ষমতা, সংগঠনী প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম আর অসাধারণ যোগ্যতার দ্বারা পরিষদের হিন্দু সভ্যদের উপর তাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের পর বাঙালিরা সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের পছন্দমতো একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পেল এবং তারা তার অধীনে অতি আশ্চর্য রকমের সাফল্য অর্জন করল। অতিশয় সুযোগ্য আর জনপ্রিয় বলে বাংলা সরকার উপমহাদেশের সর্বত্র গভীর প্রভাব বিস্তার করল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে ঘটনার পরিবর্তন আরম্ভ হল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ১৯৩৯-এর অক্টোবরে পদত্যাগ করল। জিন্নাহ্ সাহেব ঐ বছরের ২২শে ডিসেম্বরকে মুক্তির প্রতীকস্বরূপ বলে ঘোষণা করলেন। ২২শে ডিসেম্বর মুক্তি ও শোকরানা আদায়ের দিবস বলে পরিগণিত হল।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, গ্রামীণ জীবনে তখনও কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। বাংলার প্রতিটি গ্রাম ছিল এক-একটি দ্বীপের মতো ; মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ; লোকের অভাব ছিল কম। এ ছাড়া অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত ছিল। ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রয়োজন তারা নিজ গ্রাম বা প্রতিবেশী গ্রাম থেকে মেটাত।

কৃষিকর্ম চিরকাল বাংলাদেশে জীবিকানির্বাহের উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, ব্যবসা হিসেবে নয় এবং আজও তাই। শুধু নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে এদেশের কৃষকদের ধান চাষ করার দিকেই ঝোঁক। কিন্তু তারা আশা করত যে, সরকার যদি চড়াদরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে অধিক পরিমাণে পাট চাষ করতে পারে। কারণ, পাট হল অর্থকরি ফসল। তাদের বিশ্বাস ছিল—পাটের মূল্যের উপর তাদের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। শতকরা নব্বই জন অধিবাসীঅধ্যুষিত পল্লীঅঞ্চলে জাতীয় সমৃদ্ধির প্রভাব তখনই অনুভূত হত যখন পাটের ভাল বাজার পাওয়া যেত। স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলার গরির চাষীরা খেড়ো ঘরে বসে করে এসেছে। উন্নত বাসস্থানের কথা তাদের মনে জাগেনি। কারণ, তারা ছিল অতি দরিদ্র, আর তাদের সমস্ত জীবনই জীবনধারণের জন্য সংগ্রামের পিছনে ব্যয়িত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাদের জীবনে সর্বপ্রথম দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তখন পাটের মূল্য অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এর দরুন এক শ্রেণীর লোক এত সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা ঘরের চালে করোগেট টিন লাগিয়েছিল এবং ছেলেদের মক্তব বা মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেয়। জীবনযাপনের মান উন্নত করার জন্যে তারা কঠোরভাবে পরিশ্রমও করে। গ্রামের লোকেরা এত খুশি হয়েছিল যে, উৎসবাদিতে তারা নিজেদের জন্য, ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন কাপড়জামা কিনতে থাকে। তাদের মেয়েরা রূপার গহনা ব্যবহার করতে থাকে।

১৯৩০-এর দিকে এই সমৃদ্ধিতে ভাটা পড়ে, সমাপ্তি হয় সুখের দিনের। কিন্তু ইতিমধ্যেই জীবনযাপনের মান উন্নত হয়ে পড়েছিল এবং চাষীশ্রেণীর বেশ কিছুসংখ্যক ছেলেরা স্কুলের শিক্ষা শেষ করে শহর অভিমুখে চাকুরির সন্ধানে চলে গিয়েছিল। তাদের আয় যৎসামান্য হলেও সেই মন্দার যুগে এর দ্বারা তাদের গ্রামস্থ পরিবারের যথেষ্ট

www.nagorikpathagar.org

উপকার হয়েছিল। কিন্তু এরকম সুবিধা সব পরিবারে না থাকায় চাষীরা আবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এই স্বল্পায়ু সমৃদ্ধির দরুন যে একটি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আসে এবং তারা কায়েমি স্বার্থবাদী সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিজ অধিকার বজায় রাখার জন্যে প্রস্তুত হয়। এই সময়েই প্রজা আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য কারণ-সহযোগে ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠনে সহায়ক হয়। ঋণসালিশী বোর্ড ও মহাজনী আইন, বিবিধ প্রকার প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ হওয়ায় এবং ১৯৩৭-এর মুসলিম লীগ সরকারের আমলে মুসলমানদের চাকুরিতে নিয়োগের সুবন্দোবস্তের দরুন মধ্যবিত্ত মুসলমান এবং চাষী- সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পাকিস্তান আন্দোলন
[১৯৪০—১৯৪৭]

১৯৩৭ সালে বাংলাদেশ নিজ সরকার নির্বাচনে সুযোগ পেল। ১৯৩৫ সালে ভারত-শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকু বলবৎ না থাকায় প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত হল। স্বাধীনভাবে সরকার গঠনের সুযোগ পাওয়ায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সর্বোত্তম হল। সেইজন্যে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত এই সময়কে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ১৯৩৫ সালের আইনের আওতার মধ্যে কাজ করতে হলেও প্রশংসনীয়ভাবেই সরকার তাতে উত্তীর্ণ হল।

দেশের প্রজা, চাষী আর ভূমিহীন শ্রমিকেরা কলকাতা এবং অন্যান্য শহরবাসী জমিদারদের দ্বারা খুবই অত্যাচারিত হচ্ছিল। এইসব জমিদারদের প্রজাদের জন্যে কোনো মায়াদয়া ছিল না। প্রজাদের থেকে সাধ্যাতিরিক্ত খাজনা আদায় করে তারা কলকাতায় নারী, সুরা আর রেসের ঘোড়ার পেছনে ব্যয় করত। জমিদারদের দাবি মেটাবার জন্যে প্রজারা মহাজনদের কাছে গহনা, বাসনপত্র বন্ধক রাখত। প্রায়ই তারা নামমাত্র দামে জমির ফসল মহাজনদের নিকট বিক্রি করত। তাদের সুদের হার কখনও কখনও শতকরা একশত টাকা ছিল। স্বভাবতই সেই ঋণ চাষীদের পক্ষে শোধ করা তাদের গোটা জীবনেও সম্ভব হত না। পরিশেষে তারা বাধ্য হত জমিজমা বেচে ফেলতে। এইভাবে বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করল—কিন্তু অধিকাংশ লোকের দিনমজুরির উপর জীবিকানির্বাহ করতে হত। ঋণগ্রস্ত চাষীদের জমি ক্রমে ক্রমে মহাজনদের হাতে চলে গেল। চাষীরা তাদের জমিকে প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসত ; কারণ জমির উপরই তাদের নিরাপত্তা এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করত। শুধু ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের জ্বালায় তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ লোক এইভাগে জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর হাতে

www.nagorikpathagar.org

সর্বস্বান্ত হয়েছিল। বাংলার দুর্ভাগ্যক্রমে এখানকার শতকরা নব্বই জন জমিদার আর শতকরা নিরানব্বই জন মহাজনই ছিল বর্ণ-হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে নিজ নিজ ধর্মের আড়ালে আশ্রয় নিতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি শ্রেণীসংগ্রাম, কিন্তু উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে এবং সবগুলি ইংরেজি সংবাদপত্রের মালিক কলকাতার অবাঙালি বণিক-সম্প্রদায়ের প্রচারণার দরুন তা সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকার ধারণ করল। হাসান ইস্পাহানি ও খাজা নূরুদ্দীনের সম্পাদনায় তখন স্টার অব ইন্ডিয়া এবং মর্নিং নিউজ পত্রিকা চলছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের পর ঘটনাচক্রের বিশেষ পরিবর্তনের দরুন বর্ণ-হিন্দুরা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। ১৭৯৩ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি যাদের আনুগত্য সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং যারা কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর টাকা-পয়সা করেছিল, এমন সব লোকদের চিরস্থায়ীভাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, পরবর্তীকালে মুসলমান জমিদাররাও নিজেদের নানা দোষে তাদের জমিদারি হারিয়েছিল। যা হোক, তখন থেকেই বর্ণ-হিন্দুরা পুঁজি ও জমির মালিক হয়েছিল। দেশের দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ লোকের সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি অর্থনৈতিক বলে বিবেচিত না হয়ে সাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত বলে বিবেচিত হয়। এই পটভূমিকায় ১৯৩৭ সালে বাংলা সরকার এবং এই সরকারের প্রায় সকল নেতাই কোনো-না-কোনো সময়ে কোনো মুসলিম প্রতিষ্ঠানে বা প্রজা আন্দোলনে জড়িত থাকায় তাঁরা জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

মহাজনদের শোষণ থেকে পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীদের বাঁচানোর জন্যে প্রথমে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন, তারপর মহাজনী আইন পাশ হল। জমিদারদের ক্ষমতা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে অধিকভাবে খর্ব করা হল। শ্রমিক সংস্থার নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী বঙ্গীয় আইন পরিষদে শ্রমিক মঙ্গল আইন এবং মাতৃমঙ্গল আইন গৃহীত করালেন। প্রাথমিক শিক্ষা- বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় স্কুল বোর্ড স্থাপন করা হল। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হল এবং জেলা বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা হল।

পল্লীবাসীদের জন্যে উপরোক্ত এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা সর্বপ্রথম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের জন্যে চাকুরির পথ উন্মুক্ত করলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা খুব কমই সরকারি চাকুরি পেত। কারণ চাকুরিতে মনোনয়ন করার ভার হিন্দু কর্মচারীদের উপর ছিল। এইসব কর্মচারীরা মুসলমান প্রার্থীদের সব সময়েই চাকুরি পাবার অযোগ্য মনে করত। প্রকৃতপক্ষে চাকুরির ব্যাপারে এই প্রতিযোগিতা এবং হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বিদ্বেষের ভাবই মুসলিম লীগ আন্দোলনকে অধিকতর জোরদার করে তোলে।

এইসব কল্যাণকর কার্যাবলীর জন্যে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা কেবল যে জনপ্রিয়তা অর্জন করল তা নয় ; উপরন্তু তা প্রদেশের সাড়ে তিন কোটি মুসলমানদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। এমনকি, উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মুসলমানরাও বাংলার লীগ মন্ত্রিসভার কাজের জন্যে গর্ববোধ করছিল। প্রজা সমিতির যেসব নেতা তখনও ঐ প্রতিষ্ঠানে বর্তমান ছিলেন, আস্তে আস্তে তাঁরা সরে গেলেন। প্রজা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল—বর্ণ-হিন্দুঅধ্যুষিত সমাজের উপরতলার মর্যাদা লাভ করা। সেটা তারা মুসলিম লীগ সরকারের প্রচেষ্টায়ই লাভ করল। তাই প্রজা আন্দোলনের নেতাদের প্রয়োজন সাময়িকভাবে ফুরিয়ে গেল।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা মন্ত্রিসভার পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ, দু'একজন ছাড়া মন্ত্রিসভার সভ্যরা নিজেরাই ছিলেন জমিদার। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান মুসলমান জমিদার জনৈক মন্ত্রী এক জেলা-শহরে ভূস্বামীদের সভায় বক্তৃতাকালে কিভাবে তিনি জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ক্ষুধার্ত কুকুরদের সামনে হাড় ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সে কাজ সমাধা করে আসছেন। কারণ তা না হলে ক্ষুধার্ত কুকুরেরা মরিয়া হয়ে হয়তো জমিদারদের হত্যা করবে।

কিন্তু এজাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ সত্ত্বেও সাধারণ লোকেরা মোটামুটি সুখী ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে সৃষ্ট পরিস্থিতি, ভারতীয় নেতাদের সথে পরামর্শ না করে উক্ত মহাযুদ্ধে ভারত সরকারের যোগদান এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের কারণসমূহ আলোচনার জন্যে জনাব জিন্নাহ্ সাহেব ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একটি সাধারণ অধিবেশন লাহোরে আহ্বান করলেন।

মুসলিম লীগের সাধারণ সভ্যরা কিন্তু লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিতে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। এর কারণ ছিল অনেক। তখন পর্যন্ত মুসলিম লীগ অসম্মতিসূচক মনোভাব পোষণ করছিল, বিশেষ করে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ ও পাটনাতে অনুষ্টিত এর পূর্ববর্তী তিনটি অধিবেশনে। কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ নেতারা এই অধিবেশনকে সর্বপ্রকার গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করলেন ; কারণ তাঁরা মনে করলেন—এতে স্যার সিকান্দর হায়াৎ খানকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হবে এবং তাঁকে বোঝানো সম্ভব হবে যে, 'ইউনিয়নিস্ট' মন্ত্রিসভার পরিবর্তে বাংলাদেশের অনুরূপ সম্মিলিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা তাঁর উচিত হবে।

১৯শে মার্চ মুসলিম লীগ কর্মীদের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী লাহোর রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তাঁরা অবগত হলেন যে, লাহোরে পুলিশের গুলিতে সতেরো জন খাকসারের মৃত্যু হয়েছে এবং আটত্রিশ জন সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে। খাকসার নেতা আল্লামা এনায়েতুল্লা মাশরেকীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, আর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অধিবেশন করারও নিশ্চয়তা নিয়ে দায়িত্বশীল মহলে খোলাখুলি জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মামদোতের নবাব স্যার মোহাম্মদ শাহনওয়াজ ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। স্যার সিকান্দর হায়াৎ খান জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানালেন যে, অধিবেশন অবশ্যই হবে ; তবে, ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় শোভাযাত্রা বাদ দেওয়া হবে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ তারিখে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার প্রতিনিধিরা লাহোরে উপস্থিত হলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে বাংলার প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করা হল। ফজলুল হককে 'শের-ই-বাংলা' বা বংলার বাঘ বলে অভিহিত করা হল। এর আগে পাটনার এক মুসলিম জনসভায় ফজলুল হক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর যে-কোনো হামলার প্রতিশোধ তিনি বাংলাদেশে নেবেন। সেই থেকে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে নির্ভীক ও শক্তিশালী নেতা বলে গণ্য হয়েছিলেন এবং তার পর থেকে তিনি শেরে বাংলা বলে সর্ব-ভারতে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ-এর অধিবেশনে বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে অনুভূত হল। কংগ্রেস, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সমালোচনা করে জিন্নাহ্ সাহেব দু'ঘন্টা ধরে বক্তৃতা করলেন। দ্বি-জাতিত্বের মতবাদ এবং মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবির সমর্থন প্রচার করে তিনি বললেন, "আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে জাতিত্বের যে-কোনো সংজ্ঞা বা বিচারে মুসলমান ও হিন্দুরা হচ্ছে দু'টি ভিন্ন প্রধান জাতি। আমরা হচ্ছি দশকোটি লোকের একটা জাতি এবং অধিকন্তু আমাদের জাতিত্ব দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাষা আর সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও নামকরণের পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও অনুপাতজ্ঞান, বিধিসম্মত আইন ও নৈতিক আইন, পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, স্বাভাবিক প্রবণতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর—মোটকথা, জীবনের প্রতি এবং জীবন সম্বন্ধে আমাদের আছে একটি বৈশিষ্ট্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গি। আন্তর্জাতিক আইনের সব অনুশাসনমতে আমরা হচ্ছি একটি জাতি।"

উপরোক্ত যুক্তি আর দাবি ভ্রমাত্মক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলমান জনসাধারণের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করল এবং দাবি সম্পর্কে গান্ধীজীর সমালোচনা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অগোচরে রয়ে গেল। হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে গান্ধীজী বললেন, "আমরা যদি শ্রী জিন্নাহ্‌র যুক্তিগুলি স্বীকার করে নেই, তা হলে পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানেরা হবে দুটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক জাতি।"

ভারতীয় মুসলিমরা সেই সময় মুসলিম সমাজের নবজাগরণের আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব আলীগড় কলেজের গ্রাজুয়েটরা গ্রহণ করেছিলেন। আলীগড় আন্দোলন ছিল এর অন্যতম পরিচয়। এঁদের লক্ষ্য ছিল—ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষত যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধান করা। বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃদ্বয়, ফজলুল হক বা সোহ্‌রাওয়ার্দী, কেউ আলীগড়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন না এবং তাঁরা ব্রিটিশের সমর্থনও লাভ করেননি। মুসলিম সমাজের নবজাগরণের আন্দোলনে তাঁরা খুব একটা আগ্রহশীল ছিলেন না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন না। কারণ এগুলো বাংলাদেশের সমস্যা ছিল না। তাঁদের প্রধান সমস্যা ছিল মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তি, যা স্বাধীনভাবে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার ক্ষমতা না থাকায় সম্ভব ছিল না। তাঁদের যুক্তি হল, স্বাধীন না হলে

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। সর্ব-ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে হিন্দুরা শাসনকার্য পরিচালনায় প্রাধান্য লাভ করবে। সিকান্দর হায়াৎ খান এবং সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নেতারা বাংলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একমত হলেন।

গোড়াতে তাঁর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জনাব জিন্নাহ্ সাহেব সন্দিহান ছিলেন, যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে এমনি একটা প্রস্তাবকে তিনি অনুমোদন দিতে রাজি ছিলেন। প্যান ইসলামীদের মুখপাত্র আবদুর রহমান সিদ্দিকী এই মতের বিরোধিতা করে বিশ্ব ইসলামের জন্যে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের জোর ওকালতি করলেন। তাঁর যুক্তি হল, ইসলামী সাম্রাজ্য মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত, এই ভূভাগ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে উদ্ধার করা মুসলমানদের কর্তব্য। কিন্তু তাঁকে কেউ সমর্থন করলেন না। ভারতীয় সমস্যার চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিলেন তিনি প্যালেস্টাইনের সমস্যার উপর। সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশগুলির অধিকাংশ নেতা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা দাবি করলেন। ইতিপূর্বে লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ :—

"স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠিত হবে, আর তার গঠনতন্ত্রে মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।"

১৯৩৮ সাল থেকে ভারতের গঠনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্যে বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাবিদ দ্বারা অনেক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল ; উদ্দেশ্য ছিল—স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের জন্যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা। এঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে পাঞ্জাবের কেফায়েতুল্লা, আলীগড়ের অধ্যাপক এস. জেড. হাসান, এ. এইচ. কাদরী, হায়দ্রাবাদের ডাক্তার আব্দুল লতিফ, সিন্ধুর স্যার আবদুল্লাহ হারুন, পাঞ্জাবের স্যার শাহনওয়াজ খান মামদোত, বাংলার আসাদুল্লাহ্ এবং স্যার সেকান্দার হায়াৎ খান। যদিও এ পরিকল্পনাগুলো সাবজেক্ট কমিটি দ্বারা আলোচিত হয়েছিল—কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সবগুলোই বাদ দিতে হল। ইতিপূর্বে চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে বিবেচনা-বহির্ভুত করা হল। কারণ ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে ইরান, তুখারিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে বসা পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। ইকবালের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য ছিল না ; কারণ তাঁর দৃষ্টি তাঁর দেশ পাঞ্জাব ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দূরে যেতে পারেনি। বাংলার মুসলমান তাঁর পরিকল্পনার বাইরে ছিল।

বাংলার প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র সোহ্‌রাওয়ার্দী বিষয়-নির্বাচন কমিটিতে বক্তৃতাকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিপক্ষে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, কেন্দ্রীয়করণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে এবং যেহেতু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হিন্দু-প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী, তারা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থ দপ্তর প্রভৃতি আয়ত্তাধীনে এনে ক্রমশ নিজেদের হাতে সকল

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করবে, স্বায়ত্তশাসন শুধু থাকবে কাগজে-কলমে। বাংলার মুসলমানদের তিনি সতর্ক করলেন, তারা যদি মুসলিম লীগের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে সক্ষম না হয়, তা হলে তারা ঐ প্রতিষ্ঠানকে অবহেলা করতে থাকবে এবং ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। আমেরিকা, রাশিয়া এবং অন্যান্য অনেক দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র তাঁর যুক্তির ভিত্তি ছিল। তিনি আমেরিকার প্রথম গণপরিষদের কাগজপত্র ও বিবরণ থেকে বহুল উদ্ধৃতি দিলেন। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদিও ১৯৩০ সালে তাঁর পরিকল্পনায় স্যার মোহাম্মদ ইকবাল বাংলার মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেননি, কিন্তু হিন্দু-ভারতের নেতা লালা লাজপত রায় ১৯২৪ সালে তাঁর পরিকল্পনায় বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশে মুসলিম রাজ্য গঠন করার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী দাবি করলেন—প্রত্যেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোক ; তাদের প্রত্যেককে নিজ ইচ্ছানুযায়ী গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া হোক এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা রাষ্টসমূহের সঙ্গে যোগ দিয়ে কমনওয়েলথ্ গঠন করার অধিকারও দেওয়া হোক। কয়েকজন নেতা প্রত্যেকটি প্রদেশের ক্ষেত্রে 'সার্বভৌম' কথাটির ব্যবহারে আপত্তি করলেন।

সাবজেক্ট কমিটির দ্বারা প্রস্তাবটির খসড়া প্রস্তুত হল এবং পরে জিন্নাহ্ সাহেব এখানে-ওখানে রদবদল করে প্রস্তাবটি অধিবেশনে উপস্থিত করতে মত দিলেন। ২৩শে মার্চ সাধারণ অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধিদলের নেতা ফজলুল হক প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে যুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান এবং মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের নেতারা তাঁকে সমর্থন করলেন। এই অদ্বিতীয় সম্মান ফজলুল হককে দিতে হল—এর কারণ তিনি যে শুধু বাংলার নেতা ছিলেন তা নয় ; ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র সক্ষম জাতীয় নেতাও ছিলেন। তিনি তখন ভারতে একমাত্র মুসলিম লীগপন্থী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর উপর নির্ভর করেছিল। তখন তিনি গৌরবের চরম শিখরে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু সেই সময় তাঁর শত্রুরও অভাব ছিল না। যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির নেতারা খুব খুশি হতে পারলেন না, তথাপি বিপুল উদ্দীপনার মাধ্যমে প্রস্তাবটি গৃহীত হল। প্রস্তাবের উপরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জনাব জিন্নাহ্ সাহেব হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের নেতাদের এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্তাবের শেষ অনুচ্ছেদের পূর্বে আর একটি অনুচ্ছেদ যোগ করা হল।

'লাহোর প্রস্তাব'—যা পরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে আখ্যায়িত হয়, যদিও প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি—তার সারমর্ম হল, ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাংশে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ স্থাপিত হবে। পরবর্তী বছরে এই প্রস্তাব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের স্থির লক্ষ্যরূপে গৃহীত হল। প্রস্তাব উপস্থিত করার

www.nagorikpathagar.org

সময় ফজলুল হক তাঁর স্মারণীয় এবং মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। এই বক্তৃতা এত উদ্দীপক, এত ভাবপ্রবণ আর এত আবেগপূর্ণ ছিল যে, অধিবেশনের সমস্ত লোক তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করলেন। অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে তিনি বললেন—

"গতকাল যাঁরা বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধনী চেয়ে প্রস্তাব এনেছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার উত্তর হচ্ছে যে ১৯৩৭ সালে আমরা মুসলমান ও অন্যান্য জাতির তরফ থেকে বাংলাদেশে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলাম। দুই শতাব্দী পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের দেশবাসীর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা সেই ক্ষমতা কোনো কাল্পনিক ও অজ্ঞাত কেন্দ্রীয় শক্তির কাছে বিকিয়ে দিতে রাজি নই। ভারত-শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকুর প্রবর্তনের প্রতিবন্ধকতা করে আমরা আমাদের উপর হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনকে সাফল্যজনকভাবে ব্যাহত করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ওরকম প্রচেষ্টার একই পরিণতি ভবিষ্যতেও হবে।" বিপুল করতালির মধ্যে তিনি আরও বললেন, "স্যার মোহাম্মদ ইকবাল তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রদেশসমূহে স্বাধীনতা দেবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন—আমি বাংলার পক্ষ থেকে স্যার মুহম্মদ ইকবালের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করছি।...১৯০৬ সালে বাংলাদেশই প্রথম মুসলিম লীগের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল ; আজ বাংলার নেতা হিসাবে আমি মুসলিম লীগের সেই একই মঞ্চ থেকে আমাদের জন্য পৃথক বাসভূমির প্রস্তাব পেশ করছি।"

বাংলার মুসলমানেরা তাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন পরিচয় লাভ করল। তারা আর শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায় রইল না, সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রের অধিবাসী একটি জাতি হিসাবে গণ্য হল। লাহোর প্রস্তাব তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এনে দিল। তরুণেরা, বিশেষ করে বাংলার মুসলমান ছাত্রসম্প্রদায়, একে সাগ্রহে গ্রহণ করল। কারণ এর পূর্ব পর্যন্ত তারা বিমূঢ় ছিল। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞান ছিল মুরুব্বিদের কাছ থেকে শোনা জিনিসের বিপরীত। এশিয়ার যুবশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে চাইছিল। মহাদেশের অন্যান্য অধীন দেশগুলির মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনী পাঠ করে তারা অনুপ্রেরণা পেল। এশিয়ার সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা তাতে কোনো অংশ নিতে পারেনি ; কারণ তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল—ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে তাদের দাসত্ব। নেতাদের পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য যুবসম্প্রদায়ের অপছন্দ ছিল। এতে তারা যেমনি লজ্জিত বোধ করছিল, তেমনি হয়েছিল বিমূঢ়। ১৯৪০ সালের পর থেকে মুসলমানরা নূতন জীবনের স্বাদ পেল। হিন্দুর সাথে লড়াই করাই এখন তাদের উদ্দেশ্য রইল না, এখন থেকে তারা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে পেল—যেখানে তারা মানুষ হিসাবে বাস করার সুযোগ পাবে, হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে নয়। তাদের আর ভাবতে হবে না যে, হিন্দুরা মুসলমানদের উপর ক'দফা এবং কতভাবে অবিচার করেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির নেতাদের মধ্যে মুসলিম লীগ হাই-কমান্ডের বিরোধিতা করার দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ ঐ কনফারেন্সে মুসলিম লীগ গঠনতন্ত্রে একটি

www.nagorikpathagar.org

ধারা যোগ করে হাই-কমান্ড নিজের উপর একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা আরোপ করেছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিতে হাই-কমান্ড নির্দেশ পাঠাচ্ছিল এবং এর ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। কারণ স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করলে হাই-কমান্ড যে-কোনো মন্ত্রিসভার পতন ঘটাত। মুসলিম লীগের এই নিয়ম-বহির্ভূত গঠনব্যবস্থার মধ্যেই বিদ্রোহের বীজ নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেই মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ্ সাহেবকে নানাভাবে বোঝালেন যে, এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের আর কিছু করণীয় নেই। কারণ ঐ দিন থেকে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্তের মুসলিমদের জন্যই মুসলিম লীগে ব্যবস্থা রইল। সুতরাং তাদেরই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ হাই-কমান্ডের সদস্য হওয়া উচিত। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব ও লিয়াকত আলী খাঁ তাঁদের ধারণা যে অমূলক, এটা প্রমাণ করার জন্য এবং সর্ব-ভারতের মুসলমানদের উপর তাঁদের নেতৃত্ব আরও সুদৃঢ় করার জন্য সেই অধিবেশনেই মুসলিম লীগ গঠনতন্ত্রে ২৮ ক ধারা সংযোজন করে দিলেন, যার ফলে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে সকল প্রাদেশিক মুসলিম লীগসমূহের কার্যকলাপের উপর তদারক করার এবং প্রয়োজন হলে তাদের চালাবার অধিকার দেওয়া হল। সুতরাং যদিও লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশগুলোর অধিকার স্বীকৃত হল কিন্তু অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশগুলির নেতাদের হাতে রইল। ১৯৪০ সালেও লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সর্বনাশী স্বার্থবাদী মানসিকতা থেকে মুসলিম লীগ মুক্তি পেল না, যার ফলে ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান পাওয়া গেল তা 'কীটদষ্ট, খণ্ডিত-বিখণ্ডিত' একটা রাষ্ট্র—যার স্থায়িত্ব পাকিস্তান হবার বিশ বছর পরেও সঙ্কটাপন্ন হয়ে রইল। ১৯৪৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় আইনসভায় ফজলুল হকের বিবৃতি হচ্ছে এই রাজনৈতিক অব্যবস্থার বিশ্লেষণ।

কিন্তু লাহোর প্রস্তাব হিন্দুদের কাছে অস্পষ্ট মনে হল। প্রথমে পণ্ডিত নেহরু মনে করলেন যে, এ প্রস্তাবটিতে ভারতকে বলকান অঞ্চলের অনুরূপ করে তোলার দাবি রয়েছে। ভারতকে বিভক্ত করার এরূপ প্রচেষ্টাকে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করলেন। তিনি পরিস্থিতিকে বিচার করলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের অবস্থার সঙ্গে, যখন সেখানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে একদা শক্তিশালী অস্ট্রীয়, রাশিয়ান ও অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে কতকগুলো ক্ষুদ্র অথচ মিশ্রজাতিঅধ্যুষিত রাষ্ট্র সৃষ্টি করে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের পথ উন্মুক্ত করেছিল। পণ্ডিতজী বললেন, এইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্য আঞ্চলিক চাষীসম্প্রদায়ের প্রতি কার্যকর রাজনৈতিক আবেদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু একবার ক্ষমতা হাতে পেয়েই জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁদের কৃষকশ্রেণীর অনুগামীদের হতাশ করলেন। ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য তাঁরা এবং তাঁদের পরবর্তী নেতারা পূর্বের মতো প্রভুত্বব্যঞ্জক পুলিশি শাসননীতি অবলম্বন করলেন। লাহোর প্রস্তাবের পাণ্ডাদের তিনি সতর্ক করে দিলেন—এ সম্পর্কে বিশ্বের ইতিহাস থেকে উপদেশ নিতে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারণা কতটুকু ভ্রমাত্মক—তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবকে গান্ধীজী ভারতের অঙ্গচ্ছেদ বলে অভিহিত করলেন

www.nagorikpathagar.org

এবং তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ধারণাকেই মহাপাপ বলে ধরে নিলেন। গান্ধীজীর পক্ষে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ; কারণ যুক্তির তুলনায় সহজাত ধারণা আর স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল বেশি। কলকাতার ক্ষমতাশালী সাময়িক পত্রিকাগুলি, যার মালিকানা হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল, তারা লাহোর প্রস্তাবের নামকরণ করল 'পাকিস্তান'। যদিও প্রস্তাবে এমন কিছু ছিল না—যা থেকে বোঝা যেতে পারে মুসলিম লীগের পৃথক বাসভূমির দাবি কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য। প্রস্তাবটির প্রথম অংশে যা বলা হয়েছিল, তা হচ্ছে ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর-সংলগ্ন অংশগুলি নিয়ে আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ভারতের আঞ্চলিক সীমানা নির্দিষ্ট করা হবে। অঞ্চলগুলির সংখ্যা কত হবে তা উল্লেখ না থাকলেও মোটামুটি ধারণা করা গিয়েছিল, ভারবর্ষকে চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা হবে—উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-ভারত এবং দক্ষিণ ভারত। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও ভাষা ছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বে যাঁরা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তাতে চারটি বা তার চেয়ে বেশি ভাগে ভারতকে বিভক্ত করার দাবি ছিল। পণ্ডিত নেহরু যখন ভারতকে বলকানে পরিণত করার কথা বললেন, তার পেছনে ছিল এদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা। লাহোর প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে ভারতের উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চল দু'টির সঙ্গে সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কারণ উভয় এলাকাতেই মুসলমানেরা ছিল সংখ্যগরিষ্ঠ। দক্ষিণ-ভারতীয় অনার্য বা উত্তর-ভারতীয় আর্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় কেউ ছিল না বলে এ দু'টি অঞ্চল সম্পর্কে মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে কোনো মন্তব্য করেনি।

প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি হিন্দুরা ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার নেতৃত্ব হারিয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিল, বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সুনামহানির জন্য তারা সর্বপ্রকার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। লাহোর প্রস্তাবে তারা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল ; কারণ জমি ও পুঁজিতে তাদের কায়েমি স্বার্থ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল। তারা ভাবল—মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন বাংলার অর্থ হবে জমিদারির উচ্ছেদ আর তাদের সম্পত্তির জাতীয়করণ। কাজেই লাহোর প্রস্তাব তাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, শ্রীরাজা গোপালাচারী বা পণ্ডিত নেহরু প্রস্তাবের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাও তাদের মনঃপূত হল না। ভারতের অন্যান্য অংশের হিন্দুদের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রস্তাবটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ আছে বলে ঘোষণা করলেন। স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য বেশ ভালভাবেই প্রস্তুতি নেওয়া হল। মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তাদের গৃহযুদ্ধে টেনে আনার জন্য কলকাতার হিন্দু সাময়িক পত্রিকাগুলি মুসলিম লীগ নেতাদের গালাগালি ও অপমানসূচক মন্তব্য বর্ষণ করতে লাগলেন। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই ছিল হিন্দু ; কাজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাদের সাফল্য সম্বন্ধে তারা অতিমাত্রায় নিশ্চিত ছিল।

বাংলার বর্ণ-হিন্দুরাই অবশ্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রথম দাবি জানায় ; কারণ ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করায় তারা

অপমান বোধ করেছিল। তার পর থেকে তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিল। বাংলার মুসলমানেরাও বর্ণ-হিন্দুদের সাথে একমত হয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছিল। কারণ. তারা জানত যে, বাংলায় তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ—যদিও সমগ্র ভারতে তারা নৈরাশ্যজনকভাবে সংখ্যালঘু।

স্বায়ত্তশাসনে আস্থাবান রাজনৈতিক নেতাদের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল একটি বিজয় ; কিন্তু ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে সম্মিলিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন এবং এর পরিণতিস্বরূপ বর্ণ-হিন্দুদের ক্ষমতালোপের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের হল মোহমুক্তি। তারা কেন্দ্রীয় শাসনের অনুগামী হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে লাগল। এর ফলে বাংলার মুসলমানদের জন্য ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, যিনি শুরুতে লাহোর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চিত ছিলেন না, এখন সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করলেন যে, ঐ প্রস্তাবটি হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ত্রিংশতম অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করলেন, "মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের জন্য একটি উপযুক্ত নাম খুঁজছিলেন। হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান' আখ্যা দিয়ে আমাদের সেই অনুসন্ধানকে সাহায্য করেছেন।" জনাব জিন্নাহ্ সাহেব বললেন, "এর জন্য হিন্দু সাময়িক পত্রিকাগুলির কাছে মুসলিম লীগ কৃতজ্ঞ।" তখন থেকেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব বলে পরিচিত হল। হঠাৎ করে লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান' বলে আখ্যায়িত করায় বাংলার মুসলমানরা বিব্রতবোধ করলেন—যদিও কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করলেন না। লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান' বলে অভিহিত করার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে, বিশেষ করে পাঞ্জাববাসীদের অন্তরে যে রাষ্ট্রের ছবি ভেসে উঠল, তা ইকবাল ও চৌধুরী রহমত আলীর পরিকল্পনাপ্রসূত পাকিস্তান—যেখানে বাংলার কোনো স্থান ছিল না। ফলে একদল লোকের মধ্যে যে মানসিকতা সৃষ্টি হল—তার খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলার মুসলমানদের দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে। বাংলাকে তারা মুখে পাকিস্তানের অংশ বলে মেনে নিলেও অন্তরে তার সায় দিচ্ছিল না, কারণ ইকবালকে এবং চৌধুরী রহমত আলীকে তাঁরা পাকিস্তানের দ্রষ্টা বলে ভেবে নিয়েছেন।

পাকিস্তান আন্দোলন ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। মুসলমানরা সরকারি দপ্তরে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানায় চাকুরিপ্রাপ্তির অধিকতর সুযোগ চেয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের অভিপ্রায় ছিল—একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের মারফত পাকিস্তান হাসেল করা। কিন্তু তা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করল ; কারণ প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সংবাদপত্রগুলি এর ধর্মনিরপেক্ষতার দিকটাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এর উপর ধর্মের রং চড়াল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জনাব জিন্নাহ্ সাহেব, জনাব ফজলুল হক বা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এঁদের কেউ-ই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, প্যান ইসলামিজ্‌ম-এও তাঁদের কোনোরূপ আস্থা ছিল না, তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাতা। এঁদের প্রত্যেকেই

www.nagorikpathagar.org

এককালে কংগ্রেস বা স্বরাজ্য পার্টিতে হিন্দুদের সঙ্গে কাজ করেছেন। জনাব ফজলুল হক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম নির্যাতনের অনেক খবর পেয়েছিলেন। এজন্য উত্তর প্রদেশে এবং পাটনায় তাঁর বক্তৃতায় হিন্দুদের কটাক্ষ করে বলতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'পীরপুর রির্পোটে' উল্লেখিত কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের উপর নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী তাঁর মানসিক ভারসাম্যও অনেকটা নষ্ট করে ফেলেছিল।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যাঁরা সবচেয়ে বেশি বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ্ যার মধ্যে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁরা জিন্নাহ্ সাহেবকে শিয়া, কাফের ফতুয়া দিতে কসুর করেননি। এর কারণ—ওলেমাদের সঙ্গে হিন্দুদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁরা মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মতো চাকুরি বা প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশীদার হবার জন্য উমেদার ছিলেন না।

ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনোপ্রকার প্রচারণার বাগাড়ম্বর থামিয়ে দেবার সুযোগ জিন্নাহ্ সাহেব নষ্ট হতে দিতেন না। ১৯৪১ সালে হিন্দু নেতা কে. এম. মুন্সী এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "পাকিস্তান কখনও এমন একটি রাষ্ট্র হবে না যেখানে সকল সম্প্রদায় গঠিত বিধানসভার নিকট দায়ী থাকবে এর সরকার ; পাকিস্তান হবে এমন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র যার শাসনব্যবস্থা কোরানের নির্দেশভিত্তিক হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকবে। সুতরাং সেই অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বর্জন করা হবে।" এর উত্তরে আলীগড়ে ছাত্রদের এক বক্তৃতায় জিন্নাহ্ সাহেব এজাতীয় প্রচারণার অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "এজাতীয় প্রচারণা শুধু হিন্দু ও শিখদের খেপিয়ে তোলার জন্য করা হচ্ছে।" তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে এবং সেখানে হিন্দু ও শিখদের সর্বপ্রকার ক্ষমতাহীন করে রাখা হবে—এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" বৎসর কয়েক পরে লন্ডনে Daily Worker পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ্ সাহেব বলেন, "পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানী জনসাধারণের অনুমোদন পাবে এবং তা জাতি, ধর্ম বা বর্ণ-নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণের অনুমোদন ও ইচ্ছানুসারে কাজ করে যাবে।"

১৯৪৬ সালের শেষভাগে নির্বাচনে জয়লাভের পর দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, "পাকিস্তান পরিকল্পনায় একটি জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি অন্তর্নিহিত আছে, যে সরকারে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানব-শিশুর সমান অধিকার থাকবে।"

কিন্তু এসব বক্তৃতার পরেও ক্রমশ দুটি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বাংলায় নিয়মিতভাবে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে লাগল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই ঢাকায় এপ্রিল থেকে আরম্ভ হয়ে আগস্ট পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলত। বছরের এই সময়টিকেই দাঙ্গা বাধানোর জন্য নির্দিষ্ট রাখা হত ; কারণ এই সময়েই মুসলমান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ঢাকায়

www.nagorikpathagar.org

আসত। এর উদ্দেশ্য ছিল—অভিভাবকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে তাঁদের ছেলেদের ঢাকায় পাঠানো থেকে বিরত রেখে পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত ঢাকার মুসলিম ছাত্রসমাজের শক্তিবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের অন্যান্য শহরের অনুরূপ হিন্দুপ্রধান ঢাকা শহরে অবিরাম দাঙ্গা-হাঙ্গামা মুসলিম ছাত্রদের লেখাপড়ায় বিশেষ ক্ষতিসাধন করেছিল। কিছুদিন থেকেই কলকাতার মুসলিম ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্' গান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক 'শ্রী ও পদ্ম' নিয়ে আন্দোলন চলছিল। ঢাকায় মেয়েদের হোস্টেলে বন্দেমাতরম্ গান নিয়ে গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং সেটা পরে ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের নেতা, বাংলা সাময়িকপত্র 'পাকিস্তানের' সম্পাদক নাজির আহমদ তাঁর শ্রেণীকক্ষের সম্মুখে এবং তাঁর শিক্ষকদের চোখের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাহত হলেন। এতে মুসলিম সম্প্রদায় অন্তরে খুবই আঘাত পেল। নাজির আহমদ শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এসব নিষ্ঠুর কার্যকলাপ মুসলমানদের দৃঢ়-সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করে তোলে। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি কেবলমাত্র হিন্দুপ্রধান শহরগুলিতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মুসলমানপ্রধান গ্রামাঞ্চল শান্তিপূর্ণ ছিল। শহরের ঘটনাবলীতে গ্রামের লোকের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে লাগল ; ফলে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসও পাকিস্তান আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। মুসলিম লীগের সাথে কোনোরূপ আলোচনা না করেই ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস ১৯৪১ সালে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। তারপর গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু হল গণ-বিক্ষোভ ; হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এটাই ছিল তৃতীয় ও শেষ গণআন্দোলন। মুখ্যত ব্রিটিশবিরোধী হলেও মুসলমানরা অনুভব করল, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে ; কারণ এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের দ্বারা পাকিস্তানের দাবি বানচাল করাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

১৯৪১ সালের আদমশুমারিতে হিন্দুদের সংখ্যা কৃত্রিম উপায়ে স্ফীত করার জন্য কংগ্রেস বাংলাদেশের সর্বত্র তার শাখা-প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিয়েছিল। মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়—সেটা প্রমাণ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বাংলা সরকার বা মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই চাল প্রথমে বুঝতে পারেনি। গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। এ বিষয় অবগত হওয়ার পর ফজলুল হক সাহেব ভীষণ খেপে যান এবং এক বিবৃতিতে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু ডাক্তার, আইনজীবী ও অন্যান্য হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে প্রবঞ্চক ও চক্রান্তকারী বলে আখ্যা দেন। ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। অবশ্য পরে তা আদালতের বাইরেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হলই। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগ হল এবং পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকা

www.nagorikpathagar.org

পূর্ববঙ্গ হারাল ; নচেৎ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলকাতা, ২৪ পরগনাসহ সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ, যা এখন ভারতের অংশ—তা পূর্ববঙ্গের অপরিহার্য অংশ হত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান যোগদান করায় নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মোকাবেলায় জাপানের সাফল্যের দ্রুতগতি, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ নৌঘাঁটিগুলির উপরে তার দুঃসাহসিক আক্রমণ—যার ফলে অতিকায় ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' রিপালস্ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটিগুলির উপর যুগপৎ আক্রমণ এশীয়বাসীদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য অনুপ্রাণিত করে তুলল। ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য নেতাজী সুভাষ বসু হঠাৎ কলকাতার বাসভবন থেকে পালিয়ে জার্মানি ও পরে সাইগনে এসে পৌঁছলেন। এতে ভারতে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরও জোরদার হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থানকারী সমগ্র ভারতীয় সৈন্য নেতাজী সুভাষ বসুর কাছে আত্মসমর্পণ করল। 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' নামকরণ করে নেতাজী তাদের দিল্লির দিকে অগ্রসর হতে বললেন। যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই জাপানি সৈন্যদের কাছে বিপর্যস্ত হল। কারণ, জাপানিরা সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ও অল্প আহার্য নিয়ে জঙ্গলে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং জাপানি সেনাবাহিনীর ভীতি ভারতের রাজনৈতিক দাবি মেটানোর জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই দাবিকে শক্তিশালী করলেন। তিনি আটলান্টিক চার্টারে প্রতিটি মানুষের বাক্-স্বাধীনতা, উপাসনার স্বাধীনতা, ভয় ও অভাবের তাড়না থেকে মুক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ১৯৪২ সালের ১২ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা তাদের মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে একটি প্রস্তাবসহ ভারতে পাঠাবেন। এই প্রস্তাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কমনওয়েলথ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের কথা উল্লেখ থাকবে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদ গঠনের কথাও এতে থাকবে। এর একমাত্র অতিরিক্ত ধারা হল যে, প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনভাবে উক্ত শাসনতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করার এবং পূর্ববর্তী শাসনতন্ত্রকে (১৯৩৫ সালের) বজায় রেখে স্বতন্ত্র শাসন চালাবার অধিকার থাকবে। নেহরু এই প্রস্তাবের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হলেও গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ক্রিপস্‌কে জানালেন যে, কেন্দ্র থেকে প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রদেশগুলির পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথই কেবল পরিষ্কার হয়েছে।

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে জাপানি সেনাবাহিনী বার্মাসমেত প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে ভারতসীমান্তে উপস্থিত হল। চট্টগ্রামে প্রচুর বোমা বর্ষিত হল, জাপানি মেশিনগানের আক্রমণে সেখানকার বিমানঘাঁটির যথেষ্ট ক্ষতি হল। কলকাতাতেও বোমা পড়ল। বাংলাদেশকে রক্ষা করার ব্যাপারে হতাশ হয়ে ইংরেজ সরকার সামরিক বাহিনীকে রাঁচিতে অপসারণ করল। আমেরিকা তার বিমানবাহিনীকে

www.nagorikpathagar.org

কুমিল্লা আর ঢাকায় স্থানান্তরিত করল। নাফ নদী অতিক্রম করে চট্টগ্রামের বিপরীত দিকে অবস্থিত বার্মার পশ্চিমাংশে পুনরায় আক্রমণ চালানোর জন্য জেনারেল স্লিম তাঁর বিধ্বস্ত সেনাদলকে বাংলাদেশেই তালিম দেওয়া শুরু করলেন। ভবিষ্যতে সাহায্য পাওয়ার আশায় তিনি আরাকানের মুসলিম এলাকাগুলোতে মোজাহেদবাহিনী সৃষ্টি করতে সাহায্য করলেন।

জাপানি সেনাবাহিনী যাতে রসদ সংগ্রহ করতে না পারে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করলেন ; বাংলাদেশের মজুত চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে তা কার্যকর করা হল। নদীপথে যাতায়াত বন্ধ করার জন্য সব নৌকা নষ্ট করা হল। জাপানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করেও যেন বেশি দূর অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। উপরোক্ত কারণেই বহুসংখ্যক স্টীমার ও ট্রেন বাংলাদেশ থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হল।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনোরূপ পরামর্শ না করেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করল। ব্রিটিশরাজ বার্মা ত্যাগ করে চলে আসার পর বর্মীদের দ্বারা প্রবাসী ভারতীয়দের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এই দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হল। বাংলাদেশের পক্ষে এটাও ছিল গুরুতর সমস্যা। ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুকূল্যে ভারতীয়রা বর্মীদের প্রায় ষাট বছর ধরে শোষণ করে আসছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ী, মহাজন, সরকারি কর্মচারী—সকলের চোখেই বর্মীরা ছিল ছোটলোক, তাচ্ছিল্যের পাত্র ; কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের শাস্তির ভয়ে বর্মীরা এ অপমান মুখ বুজে সহ্য করে আসছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের দেশ ত্যাগ করার পর তারা এ প্রতিশোধ নিল। এটা উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত বর্মীদের জন্য খুবই স্বাভাবিক ছিল। হাজার হাজার বাঙালি বার্মাত্যাগের সময় যানবাহন যোগাড় করতে না পেরে পদব্রজে বাংলায় এসে ঢুকল। বেশ কয়েক হাজার লোক পথকষ্ট এবং বন্য পশুর আক্রমণে প্রাণ হারাল। বাকি সর্বস্বান্ত ও অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় দেশে এসে পৌঁছল।

ভারতের ভাইসরয় একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করে ভারতীয় নেতাদের তাতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমে জনাব ফজলুল হক, জনাব সিকান্দর হায়াৎ খান এবং আরও কয়েকজন মুসলিম নেতা মুসলিম লীগের সাথে পরামর্শ না করেই এই পরিষদে যোগদান করলেন। জিন্নাহ্ সাহেব তাঁদের প্রতিরক্ষা পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অন্য সকলের সঙ্গে ফজলুল হক সাহেবও পদত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি সেই পদত্যাগ যে জিন্নাহ্ সাহেবের অনুরোধে করেন নাই, সেটা জিন্নাহ সাহেবকে লেখা তাঁর খোলাচিঠি থেকে বোঝা যায়। তদানীন্তন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা পরিষদে ফজলুল হক সাহেবের যোগদানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে—সেটা উপলব্ধি করেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। হক সাহেব পরবর্তীকালে দাবি করতেন যে, প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদানই ছিল তাঁর পক্ষে সঠিক পথ। কারণ যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক সরকারের কাজ বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে করতে হয়, যুদ্ধের চাহিদা মেটাবার জন্য যানবাহন, খাদ্য গুদামজাতের ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

প্রতিরক্ষা পরিষদের আওতায় থাকে অথচ সেই পরিষদ সাধারণ লোকের খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি মেটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। তাই বেসামরিক সরকারের প্রধান যদি প্রতিরক্ষা পরিষদে থাকার সুযোগ পান, তা হলে সাধারণ লোকের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধা হয়। হক সাহেব বুড়ো বয়সেও বলতেন যে, একদিকে বাঙালির জীবনরক্ষা, যেটা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ছিল তাঁর বড় কর্তব্য, অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতা রক্ষা করা—এ দুটোর মধ্যে তিনি প্রথমটাকেই জীবনে গ্রহণ করেছিলেন।

জিন্নাহ্ সাহেবকে এক খোলাপত্রে তিনি লিখেছিলেন : "আমি মুসলিম লীগ ত্যাগ করার সময় নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছি যে, একজন লোকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ এবং বাংলার তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ লোকের উপর তাঁর ক্ষমতার ব্যাপ্তির জন্যে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনকে আজ পদদলিত করা হয়েছে।" ফজলুল হক সাহেবের এই খোলাচিঠিকে তখনকার দিনে কলকাতার Statesman পত্রিকা Chesterfield ও Cowper-এর লেখা পত্রগুচ্ছের সগোত্র বিবেচনা করলেও মুসলিমসমাজ তাঁর বক্তব্যকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক বিরাট ভ্রম বলে বিচার করল। কারণ ১৯৪০ সন হতেই বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যেখান থেকে ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না। জীবনের শেষভাগে ফজলুল হক সাহেব নিজেই বলেছেন : "আমার স্বভাবজাত প্রচণ্ড আবেগপ্রবণতাই আমার সমস্ত কর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।"

১৯৪১ সালে ফজলুল হক সাহেব উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিম লীগ হাই-কমান্ডের হাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিছক তামাশায় পরিণত হয়েছে। অতএব বাংলাদেশে সুস্থ পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার উন্নতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফজলুল হক সাহেবের উপর সুবিচার করতে হলে বলতে হয় যে, তখনকার সময়টাই ছিল অস্বাভাবিক এবং তখনকার ঘটনাবলীও তাঁর বা অন্য কারুর আয়ত্তাধীন ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জাপানি আক্রমণ, ব্রিটিশের অনুসৃত পোড়ামাটি নীতি, ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা পরিষদ ও মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ—সবকিছু মিলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে অবস্থায় যদি তাঁর চিন্তার ভারসাম্য ঠিক না থেকে থাকে, তার জন্য সবটুকু দোষ তাঁর প্রাপ্য নয়। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বিদ্রোহী, তাঁর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন। পদোন্নতি না হওয়ায় তিনি ১৯১২ সালে সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উপদেশ সত্ত্বেও তিনি ১৯২৪ সালে তাঁর স্বরাজ্য পার্টি ত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। প্রজাপার্টি তাঁর কার্যকলাপ সংযত করার চেষ্টা করায় ১৯৩৭ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। জিন্নাহ্ সাহেব তাঁর নিজ ইচ্ছা তাঁর উপর আরোপ করার চেষ্টা করায় ১৯৪১ সালে তিনি মুসলিম লীগকে বর্জন করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও নিজের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার ঝঞ্ঝা ও সংঘাতময় জীবনের অনেকখানিই আমার নিয়তি নিয়ন্ত্রিত করেছে, এজন্য আমিই দায়ী। নিজের নিয়তিকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনার চেষ্টা কোনোদিনই করিনি।" নিজের সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

এই হল তাঁর অভিমত, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টিতে "চোখধাঁধানো উচ্চতায়" ওঠার লোভ সংবরণ করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। তাঁর মধ্যে চূড়ান্তরকমের পরস্পরবিরোধী দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি তা স্বীকার করতেন এবং Walt Whitman-এর কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন :

"Do I contradict myself?
Very well, then I contradict myself
I am large, I contain multitudes."

১৯৪১ সালে তাঁর মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা পদত্যাগ করেন এবং তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্থাপিত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা সন্তোষকুমার বসুকে নিয়ে এক সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ব্যবস্থাপক পরিষদের কংগ্রেস সদস্যরাও ফজলুল হককে সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করলেন।

বাংলাদেশে এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় বর্ণ-হিন্দুরা স্বভাবতই খুশি হল। কারণ মুসলমানদের সাথে ক্ষমতার অংশীদার হতে পেরে তারা আশা করল, সুদূর হলেও একদিন তারা বাংলাদেশে তাদের নেতৃত্ব ফিরে পাবে। এজাতীয় ধারণার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল এবং ফজলুল হক সাহেব সঙ্কটাবস্থা থেকে কিছুটা অবকাশ পেলেন। আড়াইশত সভ্যের মধ্যে মাত্র চল্লিশজন সভ্য নিয়ে মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠন করল। আইনসভায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভার প্রকৃত বিরোধিতা করার সম্ভাবনা একেবারে ছিল না বললেই চলে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, মুসলিম লীগকে সরাসরি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে দলীয় সংগঠনকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। অন্যান্য উৎসাহী কর্মীদের নিয়ে দলের অভ্যন্তর পরিক্রমায় বের হলেন, শত শত সভায় বক্তৃতা দিলেন। বেশিরভাগ বক্তৃতা যুবক কর্মীদের সমাবেশেই দিয়েছিলেন। ফজলুল হক সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা করার জন্যে সমগ্র মুসলিম ছাত্রসমাজ তাঁর পিছনে এঁসে দাঁড়াল। মুসলিম সরকারের আমলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল। এখন তারা দলবদ্ধ হয়ে বর্ণ-হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরায় হস্তগত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হল।

মুসলিম জনসাধারণ যারা ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আইন গৃহীত হওয়াতে উপকৃত হয়েছিল, তারা এখন সকলপ্রকার মানসিক বৈষম্য বিসর্জন দিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করল। হক সাহেবের সমর্থক মুসলিম সভ্যরা ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাপে এক বছরের মধ্যেই তাঁর দল ত্যাগ করে আইনসভায় মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকলেন। জনাব ফজলুল হক ও ঢাকার নবাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কালো পতাকা দেখানো ছাড়াও টমেটো ও পচা ডিম তাদের উপর সর্বত্রই নিক্ষিপ্ত হল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাটোর ও বালুরঘাটে দুটো

www.nagorikpathagar.org

উপনির্বাচন দ্বন্দ্বে মুসলিম লীগ প্রার্থীর নিকট ফজলুল হক সাহেবের দলের প্রার্থীর পরাজয়ে কেউ তেমন আশ্চর্য হয়নি। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম তিনি নিজেকে মুসলিম জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পান। ফজলুল হক সাহেবকে শুধুমাত্র মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর জনসাধারণের মোকাবিলাই যে করতে হল তা-ই নয়, মুসলিম লীগের সমর্থনকারী মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আর সরকারি চাকুরেরাও তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। এর কারণ ছিল খুবই সহজ। হিন্দু কর্মচারীরা তাঁদের চেয়ে অধিকতর পুরাতন ও কর্মদক্ষ হওয়ায় মুসলিম কর্মচারীদের চাকুরিতে পদোন্নতি হওয়া ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই তারা মনে করল পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তাদের পদোন্নতি অতি সহজেই হয়ে যাবে। একই কারণে অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, চতুর হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অপারগ মুসলিম বণিক ও শিল্পপতিরাও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করল। সরকারি গোপন ইস্তাহার বা নির্দেশাদি দফতরখানা থেকে ছাড়ামাত্র সোহ্‌রাওয়ার্দীর হাতে পৌঁছাতে লাগল। এ অবস্থায় কোনো সরকারের পক্ষে সঠিকভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এর ফল হল—১৯৪৩ সালের গোড়ার দিক থেকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির শক্তি যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল, তেমনি ফজলুল হক সাহেবের ক্ষমতাও আইনসভার ভিতরে ও বাইরে হ্রাস পেতে লাগল। মেদিনীপুরে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পুলিশি জুলুমের মাত্রাহীনতার উপর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ফজলুল হক যে বিবৃতি দিলেন, তাকে ভিত্তি করে গভর্নরের সঙ্গে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হল। গভর্নর ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যেসব পত্র বিনিময় হয় তাদের ভাষা রীতিমতো কর্কশ হয়ে উঠল। ফজলুল হক গভর্নরের সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি কঠোর ও দৃঢ় ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন। একখানা চিঠিতে তিনি ছোটলাটকে লিখেছিলেন :

"প্রিয় স্যার জন,

আপনার ১৯৪৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠির জবাবে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, পরিষদে সরকারের কর্মপন্থা আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করার জন্য আমি আপনার নিকট কোনো জবাবদিহি করতে রাজি নই, কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে না বলে পারছি না, সেটা হচ্ছে আপনার ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চিঠির ভাষা আরও মার্জিত হওয়া উচিত।

আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা ছিল আগামী কাল সকালে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলে দিয়েছি যে, আপনি চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা প্রত্যাহার না করলে আপনার সাথে আমার দেখা করা ঝগড়া করারই নামান্তর হয়ে উঠবে।"

বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষে তখনকার সময়টা খারাপই ছিল। দেশময় দুর্ভিক্ষ, মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল, মৃত্যুর সংবাদ রাজধানীতে অবিরাম আসছিল। সমস্ত দেশ অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষে ভরে গেল। দেশময় হাহাকার। বেসামরিক সরবরাহ

www.nagorikpathagar.org

দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করে সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারি ভাণ্ডার শূন্য দেখতে পেলেন। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কোনোরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। শপথ গ্রহণ করার অল্প পরেই, সোহ্‌রাওয়ার্দী এক বেতার-ভাষণে দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি অতিশয় গুরুতর বলে দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন। তিনি দেশবাসীকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, প্রায় দুই কোটি লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে এবং এর অধিকেরও বেশি মৃত্যুর কবলে পতিত হবে। এর কারণ কেবল মজুত চাল বা অভাবই নয়, খাদ্যশস্য সংগ্রহেরও যথেষ্ট অসুবিধা বর্তমান ছিল। যদিও খাদ্যশস্য সংগ্রহের সুবিধা করা যেতে পারে, তথাপি সুদূর পল্লীঅঞ্চলে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ জাপানিরা যাতে বাংলাদেশে এসে যানবাহন না পায়, সেজন্যে কেবল জাহাজ ও ট্রেনই সরানো হয়নি, হাজার হাজার নৌকাও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সোহ্‌রাওয়ার্দী আশ্বাস দিলেন, মুসলিম লীগ জনসাধারণের জীবনরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ধার দেওয়া দু'জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সোহ্‌রাওয়ার্দী কয়েকদিন কয়েকরাত ধরে অবিরাম পরিশ্রম করে প্রদেশের শহর ও গ্রামবাসীদের মধ্যে রেশনকার্ড-প্রাপ্ত লোকদের জন্যে চাল ও গম সরবরাহ্ করার এক পরিকল্পনা খাড়া করলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অন্ন বিতরণের জন্য লঙ্গরখানা স্থাপন করা হল। কেন্দ্রীয় সরকার আর সেনাবিভাগের কর্তাদের তিনি বোঝালেন যে, তাদের উম্মাদ পরিকল্পনা স্থগিত রেখে সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বেসামরিক শাসনব্যবস্থাকে সাহায্য করতে হবে। রেল ও স্টীমারে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি সরকারকে নির্দেশ দিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা সরকারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু এতসব করেও সঙ্কট এড়ানো গেল না। প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিতভাবে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হল। শত্রুভাবাপন্ন হিন্দু সংবাদপত্রগুলি মিথ্যা ভীতিপ্রদ সংবাদ প্রচার করতে লাগল। হিন্দু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা চাল কিনে মজুত রাখতে লাগল। বিহার ও উড়িষ্যা সরকার বাংলা সরকারের কাছে চাল বিক্রি করতে অসম্মত হল, যদিওবা কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়ে কিছু চাল ঐ দু'প্রদেশ থেকে পাওয়া গেল, তা কেবল কয়েকশত টন মাত্র। সোহ্‌রাওয়ার্দী ভাবলেন, বিহার ও উড়িষ্যার হিন্দু সরকারের অসহযোগিতার কারণ হচ্ছে এম. এম. ইস্পাহানি কোং নামে একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান। তাই তিনি বিহার ও উড়িষ্যা থেকে চাল কেনা ও সরবরাহের জন্য কতিপয় হিন্দু চাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করলেন। পাঞ্জাব থেকে চাল সংগ্রহ করার দায়িত্ব ইস্পাহানিদের উপরই ন্যস্ত রইল।

এটাই সম্ভবত সোহ্‌রাওয়ার্দীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভ্রম। মুসলিম রাজনীতির উপর ইস্পাহানিদের প্রভাবকে তিনি তুচ্ছ মনে করেছিলেন। বাংলাদেশে হাসান ইস্পাহানি জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইস্পাহানিদের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্যে সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর তিনি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেজন্যে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে কোনোদিনই তিনি ক্ষমার চোখে দেখেননি। এর পর থেকে

www.nagorikpathagar.org

অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিপক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিনকে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে এই ভুল বুঝাবুঝি সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের পতনের জন্য দায়ী।

জিন্নাহ্‌ সাহেব খোজা সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেইজন্যে তারা জিন্নাহ্‌ সাহেবকে রাজনৈতিক কার্যের জন্যে টাকা-পয়সা দিতে কোনোদিন কার্পণ্য করেনি—আর বিশেষ করে এ কারণেই বাংলার বা পাঞ্জাবের মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হতেন। বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে এ সময়ে তিনজনের নেতৃত্ব ছিল—জনাব ফজলুল হক ছিলেন গ্রামীণ জনসাধারণের নেতা, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন ইংরেজ ও বাঙালি ব্যবসায়ী ও জমিদারদের নেতা আর জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নেতা।

ব্যবসায়ী সম্প্দ্রায়কে খুশি রাখার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু তাতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। ঘটনা চরমে উঠল যখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচন দ্বন্দ্বে হাসান ইস্পাহানির বিরুদ্ধে মোহাম্মদ ওসমান নামক জনৈক স্কুল-শিক্ষককে সমর্থন করলেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী আশা করতে পারেননি যে, মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল দল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—তাঁকে জনসাধারণের কাছে ছোট করা এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব থেকে তাঁকে উৎখাত করা। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দিনে কুড়ি ঘণ্টা কাজ করতেন তবু অনেককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। খাদ্য সরবরাহ নিয়মিত হবার পূর্বেই প্রায় বিশ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ হারাল, অবশ্য তিনি বেঁচে থাকা লক্ষ লক্ষ লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর অবস্থা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল। বেদনাদায়ক বহু ঘটনার স্মৃতি ম্লান হয়ে এল, কিন্তু সমাজের কাঠামো বিধ্বস্ত হল। পুরানো অর্ধ-সামন্তবাদী সমাজে জনসাধারণ আস্থা হারাল, তারা উপলব্ধি করল মানুষ আসলে পশু মাত্র ; সমাজের তথাকথিত নেতাদের মুখে উচ্চারিত সততা, ত্যাগ বা ইনসাফের বুলি হচ্ছে ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। কালোবাজারি কন্ট্রাক্টর, শাসনবিভাগের বড়কর্তারা সকলেই যুদ্ধের সময় প্রচুর টাকা লুটেছিল। সেই টাকায় কিনেছে তারা নতুন গাড়ি, নতুন বাড়ি, নিত্যনতুন রক্ষিতা, কিন্তু তার সামান্যতম অংশও রাস্তায় ক্ষুধার্ত জনসাধারণের জন্য ব্যয় করতে প্রয়োজন বোধ করেনি। ধনীর বাড়ির ডাস্টবিনে ফেলা উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য মানুষকে কুকুরের সাথে লড়াই করতে দেখা গেছে। কিন্তু ঐ সময় সিনেমা হলগুলিকে দর্শকের ভিড় বেড়েছে বই কমেনি। নতুন নতুন ক্লাবের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সেনাবাহিনীর লোকেরা বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে জীবনকে উপভোগ করেছে। গান্ধীজী বলেছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সততা আর সত্যের বলি হয়েছে।" নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তখনকার দিনে হাস্যকর ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। বাংলার দুর্ভিক্ষ বাংলার

www.nagorikpathagar.org

সমাজজীবনে এনে দিয়েছিল এক বিস্ময়, যার জন্য সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জেগেছিল। তথাকথিত ধার্মিক নেতাদের দ্বারা পুনরায় ভুল পথে চালিত হতে অসম্মতি জানিয়ে তারা অধিকতর বাস্তববাদী হয়ে উঠল। মোটকথা, সমাজের উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব হয়েছিল ব্যাপক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশে জমির খাজনা আদায় করা ব্যতীত গ্রামের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল খুবই সামান্য। তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করা আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার বাইরে সরকারের বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কোনোদিনই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বেসামরিক কর্মচারীরা বড় বড় নগরে মিলিত হত, বিচারব্যবস্থাও অনুরূপভাবে ছিল কেন্দ্রীয়। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত খাজনা আদায়কারীর মাধ্যমে। যতদিন খাজনা পাওয়া পেত বা যতদিন খাজনা আদায়কারী বা ব্যবসায়ীদের পণ্যের চলাচল বন্ধ হবার মতো বিপদ বা গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা না দিত, ততদিন পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সাহায্যে পরিচালনা করত।

গ্রামগুলি ছিল এক-একটি ছোট প্রজাতন্ত্র, প্রত্যেক গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বৈদেশিক সংস্পর্শমুক্ত। যেখানে সবকিছু ধ্বংসের মুখে, সেখানে এরা ছিল অনিবশ্বর। এক সরকারের পর আর এক সরকার, এক বিপ্লবের পর আর এক বিপ্লব এসেছে আবার চলে গেছে, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ সেই সনাতন নিয়মের মধ্যেই থেকে গেছে। গ্রাম্য সমাজের এই ঐক্য এবং তাদের গ্রামরূপ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র অন্যান্য কারণের তুলনায় শত পরিবর্তনের মধ্যে তাদের টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে দেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা উন্নত হয়। আগের তুলনায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা হত বেশি। এর প্রভাব গ্রামেও কিছু-কিছু পড়েছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের লোকজন ছিল বহির্বিশ্বের সকল বিষয়ে উদাসীন। এখন সর্বপ্রথম তারা নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হল, কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রামগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন জনাব আবুল হাসিম। ১৯৪৩ পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহকারী সম্পাদক থাকলেও তিনি বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিলেন না। সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে জনাব আবুল হাসিম তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে মুসলিম লীগ গঠন করার যে পরিকল্পনা পেশ করলেন, তাতে মুসলিম লীগ কাউন্সিল চমকে উঠল। তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের কবল থেকে বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে মুক্ত করবেন। ঢাকার নবাবগোষ্ঠী, সবচেয়ে শক্তিশালী মুসলিম দৈনিক সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক জনাব মৌলানা আকরম খাঁ এবং ইস্পাহানি পরিবারকে তিনি বাংলাদেশের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলে উল্লেখ করলেন। এই সর্বপ্রথম বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে বাম ও দক্ষিণপন্থীর সংগ্রাম চক্রান্তের স্থান দখল করল। আত্মসমর্থনের জন্য দক্ষিণপন্থীদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি

www.nagorikpathagar.org

সমাজে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তারা আবুল হাসিম সাহেবকে বেশি মূল্য দিতে চাইল না। মুসলিম লীগ সংগঠনীর মধ্যে তিনি নিজের একটি দল গঠন করবেন স্থির করলেন এবং সর্বক্ষণ দলের কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য একদল কর্মী নিযুক্ত করলেন। তাদের জন্য কার্যালয়ও ঠিক করা হল। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে খোলাখুলিভাবে ইসলামের মূল নীতির উপর বিতর্ক হত। অল্প-বিস্তর কমিউনিস্ট নিয়মানুযায়ী দল সংগঠন করা হল। দলের কর্মীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পার্টি গ্রহণ করল। ইসলাম ও মার্কস্‌বাদের উপর সমান জ্ঞান থাকায় জনাব আবুল হাসিম সাহেব দেশের মুসলিম তরুণ- সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হলেন। এই তরুণসম্প্রদায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের উপর আস্থা হারিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা থেকেই দলের কর্মী নিযুক্ত করা হল এবং পূর্ববঙ্গকে সংগঠিত করার জন্য ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি শাখা দফতর স্থাপন করা হল। এই সময়ই সর্বপ্রথম মুসলিম লীগ প্রতিটি ইউনিয়নে সংগঠিত হতে লাগল এবং ১৯৪৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াল দশ লক্ষ। ঢাকার নবাব পরিবারের লোকেরা ঢাকা জেলা বা ঢাকার পৌর মুসলিম লীগকে করায়ত্ত করতে ব্যর্থ হলেন ; 'অনভিজাত লোকদের' হাতে স্যার নাজিমুদ্দিনের দল পর্যুদস্ত হল। ১৯৪৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকার নবাব প্রাসাদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাঁর দলের কোনো ব্যক্তিই কার্যকরী পরিষদের কোনো পদে নির্বাচিত হতে সক্ষম হলেন না। স্যার নাজিমুদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—যাঁকে তদানীন্তন বাংলার রাজনীতির মেকিয়াভেলি বলা হত, তিনি তাঁর সকল প্রকার কূটনীতি প্রয়োগ করেও অবশেষে পরাজিত হলেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিপুলসংখ্যক আসন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক যুবসম্প্রদায় দখল করল। বাম ও দক্ষিণপন্থী দলে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে গেল। দক্ষিণপন্থীদের নেতা হলেন মৌলানা আকরাম খাঁ এবং স্যার নাজিমুদ্দিন আর বামপন্থীদের নেতা হলেন জনাব আবুল হাসিম। শেষোক্ত দল সর্বপ্রকার জমিদারি স্বত্ব বিলোপসাধন করে চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দুই দলের মধ্যস্থলে অবস্থান করতে থাকলেন।

জনাব আবুল হাসিম ছিলেন প্রথম মুসলিম লীগের নেতা যিনি অতি সহজে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও ইসলামপন্থীদের সাথে উদারনৈতিকতা, মার্কস্‌বাদ এবং ইসলাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারতেন। তিনি তাঁর দলীয় লোকদের আভিজাত্যের খোলস পরিত্যাগ করে জনসাধারণের মোকাবিলা করতে নির্দেশ দিলেন। কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে বামপন্থীদের অন্তরঙ্গতা হল, কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা একমতও হলেন। জনাব জিন্নাহ্‌ সাহেব ও রাজা গোপালাচারীর মধ্যে এবং জনাব জিন্নাহ্‌ সাহেব ও গান্ধীজীর মধ্যে আলোচনা সার্থক হওয়ার জন্য এবং ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে অনচ্ছিুক যারা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি—এই দুই উদ্দেশ্যে বামপন্থী মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

লীগ ও কমিউনিস্ট দল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতিকে সমর্থন করল। ১৯৪২ সালের কংগ্রেস পরিচালিত 'ভারত ছাড়' আন্দোলন একটি গণ-প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগের সংগঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করল। কংগ্রেস নেতারা তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। কংগ্রেস যখন বেআইনি বলে ঘোষিত, এক কথায়—এই সংগঠন যখন নিশ্চল, তখন সেই রাজনৈতিক শূন্যতায় মুসলিম লীগ মুসলিম জনসাধারণের ধর্ম-প্রবণতার কাছে আবেদন করে এবং তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরে একটি গণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এর সদস্যসংখ্যা হল বিশ লক্ষ, এর মধ্যে দশ লক্ষ সদস্য হল বাংলাদেশের। এর ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সপক্ষে জোর দাবি পেশ করতে সক্ষম হল।

ত্রিপুরী অধিবেশনে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ১৯৩৯ সালে গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করার পর থেকে বাংলাদেশে কংগ্রেসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে কংগ্রেসের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। মুসলিম লীগ জনাব আবুল হাসিমের নেতৃত্বে এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল।

ব্রিটিশ সরকার এতদিনে উপলব্ধি করলেন যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতেই হবে এবং সেজন্য এমন এক ফরমুলা আবিষ্কার করতে হবে—যা কংগ্রেসও গ্রহণ করে আর মুসলিম লীগও সন্তুষ্ট হয়। ১৯৪২ সালে চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় Sir Stafford Cripps এ ধরনের একটি ফরমুলা পেশ করলেন। কিন্তু তা এতই অস্পষ্ট ও অনমনীয় ছিল যে, কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। Sir Stafford Cripps যেমনি তাড়াহুড়া করে এসেছিলেন, তেমনি তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে রাজনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। এই অবস্থা অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হতে পারল না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কংগ্রেস নেতাদের কারাপ্রাচীরের মধ্যে রাখা গেল না। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হল। রাজা গোপালাচারী ভারত বিভাগের জন্য একটি ফরমুলা তৈরি করে মুসলিম লীগের বিবেচনার জন্য পাঠালেন। Sir Stafford Cripps-এর ধোঁয়াটে ফরমুলার তুলনায় এটাকে অনেকটা বাস্তব মনে হল। Sir Stafford Cripps কেবলমাত্র মুসলমানদের আত্মপ্রকাশের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন ; কারণ তাঁর পরিকল্পনায় প্রদেশগুলিকে তারা কোন আইনাসুরে শাসিত হতে চায় তা স্থির করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজাজীর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি ছিল, যদিও এই অধিকারলাভ নির্বাচনসাপেক্ষ ছিল। জিন্নাহ্ সাহেব রাজাজীকে জানালেন যে, উক্ত ফরমুলা তিনি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সামনে পেশ করবেন। কিন্তু রাজাজী জানতে চাইলেন—ফরমুলাটিকে জিন্নাহ্ সাহেব নিজে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন কি না। জিন্নাহ্ সাহেব তার উত্তরে বললেন যে, ঐ

www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ তাঁর ভাষায় : "It was a shadow and a husk, maimed, mutilated and moth-eaten Pakistan." ফরমুলাটি আর ওয়ার্কিং কমিটির সামনে পেশ করা হল না ; কারণ রাজা গোপালাচারী মনে করলেন—ওটা যখন জিন্নাহ্ সাহেবের মনঃপূত হয়নি, তখন ওটাকে নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না।

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে গান্ধীজী আন্তরিক আলাপ-আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জিন্নাহ্ সাহেবকে পত্র লিখলেন। প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে জিন্নাহ্ সাহেব তাঁকে জানালেন যে, বম্বেতে তাঁর (জিন্নাহ্‌র) বাসভবনে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করতে পারলে তিনি খুবই খুশি হবেন। বাংলাদেশের স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং মুসলিম লীগের বামপন্থীরা ও কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা এবং হিন্দু মহাসভা কিন্তু একে বানচাল করার প্রয়াস পেল। লর্ড ওয়াভেল, যাঁর ইচ্ছা ছিল ভারতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা যুদ্ধাবসান পর্যন্ত বর্তমান থাকুক, এই সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর ও গান্ধীজীর মধ্যে পূর্বে বিনিময় হওয়া কতকগুলি পত্র প্রকাশ করে দিলেন। তখনও মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু হয়নি। ১৯৪৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর উভয় নেতার মধ্যে সাক্ষাৎ হল এবং তাঁদের মধ্যে তিন সপ্তাহ আলোচনা চলল। এই আলাপ চলার সময় মুসলিম লীগের বামপন্থীদলের নেতা জনাব আবুল হাসিম, কংগ্রেসের জনৈক নেতা জে. সি. গুপ্ত এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বাংলাদেশের নানা স্থানে একত্র হয়ে আলোচনাকে সমর্থন করে তার সাফল্য কামনা করে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু অন্য কোনো প্রদেশ থেকে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেল না। আলাপ ব্যর্থ হল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনোরূপ তিক্ততার সৃষ্টি হল না। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব ও গান্ধীজী সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিলেন, তার ভাষাও ছিল সংযত।

সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি এবার পুরাদমে চলল। আপিল শুনবার জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড ছাড়াও প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে পার্লামেন্টারি বোর্ড থাকবে বলে স্থির হল। বাংলাদেশে দক্ষিণ ও বামপন্থী মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ বেড়েই চলছিল। অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক ও কায়েমি স্বার্থবাদী দক্ষিণপন্থীরা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে সিদ্ধহস্ত হওয়ায় জিন্নাহ্ সাহেবকে সন্দেহাততীতভাবে বুঝিয়ে দিল যে, বামপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান ধারণার বিরোধী এবং তারা বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্ত করছে। তাঁরা জিন্নাহ্ সাহেবকে আরও বোঝালেন যে, জনাব আবুল হাসিম ও তাঁর অনুগামীরা আসলে হচ্ছেন মুসলিম লীগপন্থী ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট। জনাব লিয়াকত আলী খান জনাব আবুল হাসিমকে ভাল চক্ষে দেখতেন না ; কারণ তিনি মনে করতেন, জনাব আবুল হাসিম, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতিখারউদ্দিন ও ডেনিয়েল লতিফী কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলে একটি বামপন্থী দল সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছিলেন এবং তাঁর বিপক্ষে সিন্ধুর জি. এম. সৈয়দকে লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে দাঁড় করানো তাঁদের মতলব ছিল। তিনি সন্দেহ করলেন যে, এঁদের পিছনে আছেন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী। জনাব লিয়াকত আলী খান এবং হাসান ইস্পাহানি সব সময় বাধা দিয়ে আসছিলেন—যাতে জনাব

www.nagorikpathagar.org

সোহ্‌রাওয়ার্দী নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের সদস্য না হতে পারেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন সমগ্র ভারতে একমাত্র মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁকে মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদে সভ্য হিসেবে মনোনীত করা হয়নি। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে স্যার নাজিমুদ্দিন অথবা হাসান ইস্পাহানিকে নিযুক্ত করা হত বরাবর।

জনাব লিয়াকত আলী খানের সহায়তায় লীগের দক্ষিণপন্থীরা সক্ষম হলেন জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের মনঃপূত একটি ফরমুলা বের করতে ; তাতে ব্যবস্থা করা হল যে, পার্লামেন্টারি বোর্ডের নয়জন সভ্যের মধ্যে চারজন পদাধিকারবলে অথবা তাঁদের মনোনয়নে সভ্য হবেন। ঠিক হল অবশিষ্ট পাঁচ জন সদস্য সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিল হতে নির্বাচিত হবেন। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁ এবং পার্লামেন্টারি দলের নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন পদাধিকার-বলে বোর্ডের সভ্য হলেন। উচ্চতর সভার সাবেক মুসলিম লীগ সভ্যরা একজনকে এবং নিম্নতর সভার সদস্যরা অপর জনকে নির্বাচিত করলেন। পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের জয়লাভ ছিল অবধারিত। অতএব নূরুল আমিন ও ফজলুর রহমান স্যার নাজিমুদ্দিনের এই দুইজন মনোনীত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন। নিম্নতর সভার উপ-নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী নাজিমুদ্দিনের নিকট মনোনয়ন প্রার্থনা করে আবেদন করলেন। কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য করে মনোনীত করা হল ফজলুর রহমানকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টারি বোর্ডে নির্বাচিত হবার জন্য জনাব আবুল হাসিমের দলে যোগদান করা ব্যতীত জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর গত্যন্তর ছিল না।

খাজা নাজিমুদ্দিনের এ ব্যবহারে সোহ্‌রাওয়ার্দী মনে খুবই আঘাত পেলেন। কারণ ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনাব ফজলুল হকের নিকট স্যার নাজিমুদ্দিন পরাজিত হলে তিনি নিজের আসন ত্যাগ করে নাজিমুদ্দিনকে আইন পরিষদের সদস্য হতে সাহায্য করেছিলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন জীবনে কোনোদিন কোনো নির্বাচনেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করতে পারেননি। সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর জন্য চেষ্টা না করলে এবং তাঁকে দলপতি বলে স্বীকার না করলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন পটুয়াখালীর পরাজয়ের পরেই চিরদিনের মতোই শেষ হয়ে যেত। উপকারী বন্ধুর পাশে না দাঁড়িয়ে নাজিমুদ্দিন সিদ্ধান্ত করলেন ইস্পাহানিদের সঙ্গে হাত মেলাবার। জিন্তু এসব চাল ও কলাকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কারণ, দক্ষিণপন্থীরা পার্লামেন্টারি বোর্ডে পাঁচটির একটি আসনও জয় করতে পারলেন না। জনাব আবুল হাসিমের দল সবগুলি আসন দখল করলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন এই চক্রান্তে বিফল হবার পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে জানালেন যে, তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। অতএব জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিকট তাঁর অনুরোধ, তিনি যেন সাবেক পরিষদে তাঁর (নাজিমুদ্দিনের) অনুগামীদের উপর প্রতিহিংসামূলক কোনোকিছু না করেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি বোর্ডের সম্পাদক হিসেবে কথা দিলেন যে, নাজিমুদ্দিনের মনোনীত আইনসভার সাবেক পঁয়ত্রিশ জন সদস্যকে তিনি নতুন আইন পরিষদে মনোনয়ন পেতে সাহায্য করবেন। এইভাবে

www.nagorikpathagar.org

প্রাদেশিক বোর্ডের দ্বারা মনোনীত হলেন স্যার নাজিমুদ্দিনের দলের পঁয়ত্রিশ জন আর প্রাদেশিক মনোনয়নের বিরুদ্ধে আপিল করে কুটিল রাজনীতিবিদ চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সহায়তায় নিজ দলের আরও আঠারো জনকে স্যার নাজিমুদ্দিন আইনসভায় স্থান দিতে সক্ষম হলেন। চৌধুরী সাহেব আপিল শোনার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ১১৯ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ৫৩ জন সভ্য হলেন স্যার নাজিমুদ্দিনের দলীয় এবং অনুগত লোক। তখন অবশ্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বুঝতে পারেননি এই চাল ; পরে তিনি যখন তা বুঝতে পারলেন তখন আর ভুল শোধরাবার সময় ছিল না।

১৯৪৫-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন। মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীরা সকলেই নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে মুসলিম লীগ বিজয়-দিবস পালন করল। কলকাতার ময়দানে কমপক্ষে ৭ লক্ষ লোকের সমাবেশে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী, জনাব আবুল হাসিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯৪৬-এর মার্চ মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থীরা এই নির্বাচন অভিযানে কোনো অংশগ্রহণ করল না। মৌলানা আকরাম খাঁ স্বাস্থ্যউদ্ধারের জন্য মধুপুরে গিয়ে রইলেন এবং বাংলার পূর্বতন গভর্নর এবং তদানীন্তন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার জন এন্ডারসনের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি সম্পর্কে বোঝাপড়া করার জন্য স্যার নাজিমুদ্দিন লন্ডনে পাড়ি দিলেন। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সম্পাদক জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাসিম—উভয়ে মুসলিম লীগ কর্মীদের সাহায্যে এমনভাবে নির্বাচন অভিযান সংগঠন করলেন, যার দরুন জনসাধারণ দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগ মনোভাব বিস্মৃত হল। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাসিমের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীরা দূর থেকে ক্রমাগত কুৎসা প্রচার করতে লাগল। জিন্নাহ্ সাহেব একবার ট্রেনযোগে কলকাতা থেকে সিলেট পর্যন্ত বাংলাদেশ গেলেন ; কিন্তু পথে কোনো জনসভায় বক্তৃতা করলেন না, যদিও রেলপথের দুইধারে লক্ষ লক্ষ লোক সেই আশায় বসে ছিল। বাংলার পার্লামেন্টারি বোর্ড জিন্নাহ্ সাহেবকে বাংলায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাননি, কিন্তু নির্বাচনে সাফল্যের কৃতিত্ব জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাসিমকে দিতে অনিচ্ছুক হাসান ইস্পাহানির নেতৃত্বাধীন কলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জিন্নাহ্ সাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল বাংলাদেশকে না ভোলার জন্য। সিন্ধুর পার্লামেন্টারি বোর্ড জিন্নাহ্ সাহেবের নির্দেশে পরিবর্তন সাধন হবার পর থেকে জনাব আবুল হাসিম সচেষ্ট ছিলেন জিন্নাহ্ সাহেব যেন বাংলাদেশে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রলুব্ধ না হন। লিয়াকত আলী খান কেবলমাত্র ময়মনসিংহের গফরগাঁও নির্বাচন এলাকায় তশরিফ আনেন ; কিন্তু সেখানকার মুসলিম লীগ প্রার্থী গিয়াসউদ্দীন পাঠান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। যাহোক, বাংলাদেশের নির্বাচনে বিঘোষিত হল মুসলিম লীগের সর্বাঙ্গীণ বিজয়, প্রাদেশিক আইনসভার শতকরা ৯৬.৭টি আসনই মুসলিম লীগ প্রার্থীরা দখল করল।

www.nagorikpathagar.org

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এর ২৬শে জুলাই ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল নিঃসংশয়ভাবে জয়লাভ করল এবং দলীয় নেতা এটলি ১৯৪৬-এর ১৫ই মার্চ পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, তাঁর মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড প্যাথিক লরেন্স, ট্রেড বোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবং নৌবিভাগ-প্রধান এ. ভি. আলেকজান্ডার—ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে একত্র হয়ে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতে আসবেন। ১৯শে মার্চ ইংল্যান্ড ত্যাগ করে 'ক্যাবিনেট মিশন' ২০শে মার্চ করাচি পৌঁছাল। তাঁরা বিবৃতি দিলেন, "আমরা মাত্র একটাই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছি ; তা হল—মহামহিম সম্রাটের সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের ভূমিকা হবে ভারতীয়দের স্বাধীনতালাভে সাহায্য করা। এ ছাড়া সবকিছুতেই আমাদের মন থাকবে খোলা এবং আমরা কোনো বিশেষ দল বা মতকে সমর্থনের জন্য প্রতিশ্রুত নই।"

ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে রীতিমতোভাবে আলোচনা আরম্ভ হবার পূর্বে পাকিস্তান দাবির পুনরাবৃত্তির জন্য জিন্নাহ্ সাহেব দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ সভ্যদের একটি সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত করলেন। কেন্দ্রীয় ও এগারোটি প্রাদেশিক আইনসভার পাঁচ শতাধিক সভ্য মিলিত হলেন ভবিষ্যতে কি কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে তা নির্ধারণের জন্য। জিন্নাহ্ সাহেবের ৭ই এপ্রিল-এর সুদীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রাদেশিক নেতাদের মতামত-সম্পর্কিত রিপোর্ট গৃহীত হল। একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৮ই তারিখে একটি বিষয় নির্বাচনী কমিটি (Subject Committee) গঠন করা হল। জনাব জিন্নাহ্ সাহেব সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে নির্দেশ দিলেন—৯ই এপ্রিল তারিখে প্রস্তাবটি সম্মেলনে উত্থাপন করার জন্য। ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল বাংলাদেশ। লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন জনাব ফজলুল হক, ছ'বছর পরে এল জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর পালা। প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তৃতা বোধ হয় ১৯৪০ সালের জনাব ফজলুল হকের লাহোর বক্তৃতার চেয়েও অধিকতর সাম্প্রদায়িক ও জ্বালাময়ী হয়েছিল।

প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বললেন, "এই বিরাট ভারতবর্ষে দশ কোটি মুসলমান এমন একটি ধর্মমতে বিশ্বাসী, যা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন। হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম ও দর্শনের বিপরীত ; হাজার হাজার বছর ধরে লালনপালন করে এসেছে হিন্দুসম্প্রদায় একটি কঠোর জাতিভেদ প্রথাকে, যার দরুন ছ'কোটি লোক তাদের মর্যাদা হারিয়ে পরিণত হয়েছে একটি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ে ; সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে একটি কৃত্রিম বৈষম্যের এবং জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা এদেশের জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের উপর। এই হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের আক্রমণে আশঙ্কা হচ্ছে যে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন একটি

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাস হয়ে পড়বে যে, সেখান থেকে তাদের পুনরুদ্ধার লাভ করা দুরূহ ব্যাপার হবে। হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মিলিত আগ্রহ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি ভারতীয় জাতির সৃষ্টি অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুস্পষ্ট পার্থক্যের জন্য সম্ভব হয়নি।" তিনি আরও বলেন, "ব্রিটেন চায় ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট মিশন এখানে এসেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত ব্যবস্থার সন্ধানে। কংগ্রেস ব্রিটিশকে বলছে, 'আমাদের হাতে ক্ষমতা দাও, আমরা সকল বিরোধিতাকে উড়িয়ে দেব। আমরা তফশিলি সম্প্রদায়কে পরাস্ত করব এবং আদিবাসীদের ধ্বংস করব। তোমাদের পুলিশ, সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র সব আমাদের দাও, আমরা অখণ্ড ভারতের নামে সৎ ও অসতের মধ্যে শেষ রণক্ষেত্র সৃষ্টি করব।' একে আমি অভিহিত করি বিকৃতমস্তিষ্কতা বলে, ক্ষমতাপ্রাপ্তির লোভ থেকে এর জন্ম হয়েছে। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করার অভিপ্রায় আমাদের নেই, আমরা চাই এমন একটি স্থান যেখানে আমরা সুখে শান্তিতে বাস করতে পারি।'

"একটি জাতি হিসাবে বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে আমরা কিছু দান করতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের পাকিস্তান দেবার জন্য ইংরেজ আর কংগ্রেস কি রাজি আছে? যদি তা না দেয়, তবে মুসলমানরা কি সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত? আমি এইসব প্রশ্ন নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। আমি এখন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই, পাকিস্তান অর্জনে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলমান জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। জনাব জিন্নাহ্ আপনাকে আমি আহ্বান করছি, আসুন, আমাদের পরীক্ষা করে দেখুন।" প্রস্তাবের উপর প্রায় কুড়িজন বক্তা বক্তৃতা করলেন—তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করে।

প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :

(১) উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা-আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান—যেখানে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ—ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে 'পাকিস্তান অঞ্চল' নামে একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হউক এবং অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কার্যকরকরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার দেওয়া হউক।

(২) হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের স্ব স্ব শাসনতন্ত্র রচনা করবার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠন করা হউক।

(৩) ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তারিখের নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হউক।

(৪) মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি এবং অবিলম্বে ইহার কার্যকরকরণকে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে মুসলিম লীগের সহযোগিতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হউক।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বদিন জিন্নাহ্ সাহেব

www.nagorikpathagar.org

যখন প্রস্তাবটিকে বিষয় নির্বাচনী কমিটির সামনে উপস্থিত করলেন আলোচনা প্রসঙ্গে তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে জনাব আবুল হাসিম বললেন, খসড়া প্রস্তাবটি দৃশ্যত লাহোর প্রস্তাবেরই সংশোধিত রূপ, যদিও তা কোথাও বলা হয়নি, বা লাহোর প্রস্তাবের সংশোধিত রূপ হিসাবে একে উত্থাপিত করাও হয়নি। তিনি জানতে চান যে, কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যগণ এই সম্মেলনে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন কি না। পরবর্তীকালে হয়তো এ প্রস্তাবকে ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সভায় গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনের প্রস্তাবের স্থান কি হবে? এই সম্মেলন কি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের চেয়ে উচ্চতর সংস্থা? তিনি উল্লেখ করলেন, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের বিষয় লাহোর প্রস্তাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং তা পরিবর্তন করা যেতে পারে একমাত্র নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে। জনাব আবুল হাসিম বিষয় নির্বাচনী কমিটিকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৪১ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাঁর বক্তৃতার ফলে বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশনে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল এবং বাংলাদেশের কতিপয় সভ্য জনাব আবুল হাসিমের বক্তৃতায় সময় তাঁকে বাধা দিতে চাইলেন চেঁচামেচি করে।

জনাব আবুল হাসিম তাঁর বক্তৃতায় বাধা প্রদান বন্ধ করার জন্য সভাপতির কাছে আবেদন জানালেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করলেন, ১৯৪০ সাল থেকে পাকিস্তান সংগ্রাম এগিয়ে চলছে লাহের প্রস্তাবকে ভিত্তি করে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করলেন, ভৌগোলিক সত্যকে অস্বীকার করা উচিত হবে না। যে রাষ্ট্র কোনোদিনই বর্তমান ছিল না, তার বাস্তবায়নের যুক্তিকে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই দুনিয়া কোনোদিন স্বীকার করবে না এবং মাঝখানে এক বিরাট শত্রুভাবাপন্ন দেশের অবস্থিতির দরুন উভয় অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, এমন এক রাষ্ট্রের কল্পনা হবে অবাস্তব এবং এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা হবে প্রায় অসম্ভব। এই ধরনের দুইটি রাষ্ট্রকে একত্রিত করে পূর্ণ রূপ দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হবে।

বিতর্কের সময় জিন্নাহ্ সাহেব মন্তব্য করলেন, State শব্দটির শেষে 's' অক্ষরটি যুক্ত হয়েছে স্পষ্টতই মুদ্রণপ্রমাদের দরুন। লিয়াকত আলী খান যখন সভার কার্যবিবরণীর আসল খাতা হাজির করলেন, তখন দেখা গেল—প্রমাদ জিন্নাহ্ সাহেবেরই। জিন্নাহ্ সাহেব কৈফিয়ত দিলেন, প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবকে পরিবর্তন করার জন্য নয় বরং শেষোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলমানঅধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের জন্য এক বা একাধিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। মুসলিম ভারতের জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করাই হচ্ছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। জিন্নাহ্ সাহেব আবুল হাসিম সাহেবকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, প্রস্তাবটি এমনভাবে রচিত হবে যাতে লাহোর প্রস্তাবকে ক্ষুণ্ন না করেও ভারতের মুসলমানদের জন্য সম্ভব হবে একটি ভিন্ন গণ-পরিষদ দাবি করা। প্রসঙ্গত

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিটিশ সরকারের ইঙ্গিতক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যে পরিষদ প্রথমে গঠিত হয়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের মুসলিম সভ্যরা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রদেশের মুসলিম সভ্যরা তাকে মুসলিম লীগের নির্দেশে বর্জন করেছিলেন।

জনাব জিন্নাহ্ সাহেবের সভাপতিত্বে বিষয় নির্বাচনী কমিটি এই আইনগত নীতি স্বীকার করে নিল যে, আইনসভার সদস্যদের সম্মেলনের কোনো যোগ্যতা নেই লাহোর প্রস্তাব সংশোধনের। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব যখন ৯ই তারিখে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন, বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই লক্ষ করলেন প্রস্তাবটি সংশোধন করার জন্য কমিটির অভিপ্রায় এবং জিন্নাহ্ সাহেবের আশ্বাস পালিত হয়নি। যেটুকু পরিবর্তন করা হয়েছিল, তা হল প্রস্তাবটির মুখবন্ধ বর্জন, যা তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন পাঞ্জাবের মিয়া ইকতিখারউদ্দিন, সিন্ধুর জি. এম. সৈয়দ, বাংলার জনাব আবুল হাসিম এবং যুক্তপ্রদেশের হাসরাত মোহানী। তবে 'one state'-এর স্থলে 'a state" করা হয়েছিল।

বোম্বেতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন কয়েক মাস পরে হল। সেখানে গৃহীত হল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' প্রস্তাব, কিন্তু আইনসভার সদস্যদের দিল্লি সম্মেলনের প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল না। বরং মালাবার পাহাড়ে তাঁর বাসগৃহে জনাব আবুল হাসিমের সঙ্গে আলোচনার সময় জিন্নাহ্ সাহেব তাঁকে রীতিমতোভাবে উৎসাহিত করলেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কাজ করে যাবার জন্য। বাংলার লীগ নেতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে জিন্নাহ্ সাহেব তাঁদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করা হয়নি এবং উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর ঐ প্রস্তাবের সংশোধনক্ষমতা তাঁর বা অন্য কারো নেই। তিনি বললেন, প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানের গণ-পরিষদে পেশ করা হবে এবং সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসাবে তারা চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করবে দেশের গঠনতন্ত্র এবং সে গঠনতন্ত্র সকল প্রদেশের জন্য এক হবে—না দু'দেশের জন্য দু'টি হবে—তা তাঁরাই স্থির করবেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ 'ক্যাবিনেট মিশন' তাঁদের আলোচনা চালালেন। তাঁরা ভারতের সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক এবং পেশাদারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গেই আলাপ করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, ব্রিটিশের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতা দু'টি সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দিতে তাঁরা অপারগ। পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁদের একমত না হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে—ভৌগোলিক দূরত্ব ; প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যে প্রায় ৭০০ মাইলের ব্যবধান এবং যুদ্ধ ও শান্তিকালীন উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য হিন্দুস্তানের সদিচ্ছার উপর নির্ভরসাপেক্ষতা। পাকিস্তানে মুসলিম লীগের দাবিকৃত পশ্চিমাংশে ছিল শতকরা ৩৭ জন এবং পূর্বাংশে শতকরা ৪৮ জন অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের বাস।

'ক্যাবিনেট মিশনের' সুপারিশসমূহ নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে মুসলিম লীগ মোটামুটি

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করল।

ছয়টি মুসলিম প্রদেশ একত্র হয়ে নির্ধারণ করবে অভ্যন্তরীণ বিষয় ও শাসন-সংক্রান্ত নীতি ; কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং দেশরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ-ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে মুসলিম প্রদেশ ও হিন্দু প্রদেশগুলির গঠনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদ দু'টি তাদের যুক্ত বৈঠকে। এটা হল অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত ; কারণ গ্রুপগুলিকে দশ বছর পর ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া থাকল।

প্রচুর লেখালেখির পর কিছু-কিছু আশ্বাস পেয়ে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং গণ-পরিষদে যোগ দিতে রাজি হল এই শর্তে যে, কোনো প্রদেশ বা গ্রুপের স্বাধীনতা থাকবে ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাতেও বোঝানো হল ঐরকমই একটা কিছু। মুসলিম লীগ নেতাদের ধারণা হল, পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এত দুর্বল হবে যে, সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে পড়বে প্রদেশগুলির হাতে এবং এর ফলে ভারত বিভক্ত হবে শুধুমাত্র তিন ভাগে নয়, কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে। তাঁরা ছিলেন দেশকে দু'অংশে ভাগ করার চেয়ে খণ্ড খণ্ড বিভক্তির প্রত্যাশী। দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা দেবার জন্য জিন্নাহ্ সাহেবের সমর্থন উক্তরূপ রাজনৈতিক বিশ্লেষণেরই ফল।

১৯৪৬ সালের ২৪শে মে কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ এক প্রস্তাবে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তাঁরা বললেন :

"পরিষদ অবশ্য সিদ্ধান্ত করছে যে, স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক ভারতের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের পক্ষে সমীচীন হবে গণ-পরিষদে যোগদান করা।"

মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই গ্রহণ করল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুলি, কিন্তু অনতিবিলম্বেই ভুল বোঝাবুঝি আরম্ভ হল ১০ই জুলাই বোম্বেতে প্রদত্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরুর বক্তৃতা উপলক্ষ করে। তিনি বলেছিলেন, "গণ-পরিষদে কংগ্রেস যোগ দেবে বিনাশর্তে এবং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতিকে মুকাবিলা করার স্বাধীনতা নিয়ে। কংগ্রেস শুধুমাত্র গণ-পরিষদে যোগ দিতে রাজি হয়েছে এবং উচিত মনে করলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকেও সংশোধন করার স্বাধীনতা তার থাকবে।"

কংগ্রেসের এই মনোভাবের দরুন ১৯৪৬-এর ১৯শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগ্রহণের পূর্বস্বীকৃতিকে তা প্রত্যাহার করল।

একই অধিবেশনে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

"এই প্রস্তাব দ্বারা মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন সকলেই সমবেতভাবে তাদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের পিছনে দাঁড়ায় এবং যেন প্রস্তুত থাকে যে-কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য। ইতিপূর্বে আরব্ধ

www.nagorikpathagar.org

নীতির বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিল এতদ্বারা কার্যকরী সমিতিকে নির্দেশ দিচ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য একটি কর্মসূচি অবিলম্বে প্রণয়ন করা হোক—যাতে তারা প্রয়োজনবোধে আসন্ন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।"

কংগ্রেসের কার্যকরী পরিষদ এক বৈঠকে মিলিত হল এবং নেহরুর বিবৃতিকে সুস্পষ্ট অস্বীকার করে পুনঃসমর্থন জানাল ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অখণ্ডভাবে গ্রহণ করবে বলে। কিন্তু এরপর কংগ্রেসকে আর বিশ্বাস করা লীগের পক্ষে সম্ভব হল না।

১৯৪৬-এর ১২ই আগস্ট নেহরুকে বলা হল সরকার গঠন করার জন্য এবং তিনি তা করলেনও। কিন্তু তাতে অংশগ্রহণ করতে মুসলিম লীগ অস্বীকৃতি জানাল। লীগ ইতিমধ্যেই ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত কলকাতার বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঐ দিনটি পণ্ড হয়ে গেল। হাজার হাজার স্ত্রী, পুরুষ আর শিশুকে হত্যা করা হল আর পুড়িয়ে মারা হল। এমনকি, গার্ভিনীদের পেট চিরে ফেলে অজাত শিশুদের হত্যা করল। উপমহাদেশের ইতিহাসে এটা হল এক চরম কলঙ্কময় অধ্যায়।

উগ্রপন্থী হিন্দু মহাসভার পরিচালনাধীন বর্ণ-হিন্দুদের অধিকাংশই ছিল এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী এবং এই কাজের জন্য তারা বেছে নিয়েছিল কলকাতাকে ; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই ছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। অতএব সেখানে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব ছিল লীগ সরকারের।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী চীফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের কৈফিয়ত তলব করলেন—দাঙ্গার উদ্দেশ্যে হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য চরমপন্থী হিন্দুদের এই বিপুল প্রস্তুতির কথা তাঁকে কেন তাঁরা জানাননি। তাঁরা এর কোনো উত্তর দিতে পারলেন না এবং পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল মিঃ টেইলর সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে বললেন, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। তিনি আরও বললেন, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কেবলমাত্র হিন্দু কর্মচারী থাকায় তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সরকারের সঙ্গে। পুলিশ বিভাগের যোগ্যতায় আস্থা হারিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ঠিক করলেন, লালবাজারের পুলিশ নিয়ন্ত্রণ দফতরে বসে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন তিনি স্বয়ং। পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপের দরুন তাঁকে সরকারি ও বেসরকারিভাবে আক্রমণ করল হিন্দু পত্রিকা আর হিন্দু নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর এই কাজের উপর কলকাতার দাঙ্গা তদন্ত কমিশন বিরূপ মন্তব্য করলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্তকারী দলের রিপোর্টে পাওয়া গেল তাঁর হস্তক্ষেপের ন্যায্যতার সমর্থন। পরবর্তীকালে স্যার ফ্যান্সিস ট্যুকার তাঁর 'While Memory Serves' গ্রন্থে লিখেছেন, "দাঙ্গার মূলে ছিল হিন্দু মহাসভা ; কিন্তু হিন্দু পুলিশ কর্মচারীদের প্রাধান্য ছিল গোয়েন্দা বিভাগের উপর এবং তারাই সরকারের কাছ থেকে সবকিছু গোপন রেখেছিল।"

জনাব আবুল হাসিম এবং তাঁর দলীয় অনুগামীরা যখন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করছিলেন—তাঁদের সংগ্রাম হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা দাবি করতে লাগলেন যে, সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, বর্ণ-

www.nagorikpathagar.org

হিন্দুদের বিরুদ্ধেও। এ অবস্থায় বর্ণ-হিন্দুরা চুপ করে থাকবে—এ আশা ছিল বাতুলতা মাত্র। আত্মরক্ষার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করা—এই নীতি অনুসরণ করে গড়ের মাঠের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী ও অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনে মুসলমানরা যখন ঘরে ফিরছিল, তাদের উপর তখন চালানো হল আক্রমণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আক্রমণে মুসলমানরা কলকাতার জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ হওয়ায় সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বিদায় নিল চিরতরে এবং দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

২৫শে আগস্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের নয়দিন পর লর্ড ওয়াভেল কলকাতায় এলেন স্বচক্ষে দেখে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে। মুসলিম প্রতিনিধিরা তাঁকে জানালেন যে, ব্রিটিশই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ; কারণ হিন্দু কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতে দিয়ে হিন্দুদের মুসলিমনিধনে উৎসাহ দিয়েছে ব্রিটিশ। এরপর লর্ড ওয়াভেল আগমন করলেন ঢাকায় ; সেখানকার মুসলিম নেতারা তাঁর নিকট পেশ করলেন তাঁদের কলকাতার নেতাদের অনুরূপ এক স্মারকলিপি। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন এবং লর্ড ওয়াভেলকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করালেন যে, ভারতবর্ষকে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষার জন্য মুসলিম লীগের সহযোগিতা অপরিহার্য। জিন্নাহ্ সাহেব ও তাঁর মধ্যে যোগাযোগসূত্ররূপে কাজ করতে লর্ড ওয়াভেল সোহ্‌রাওয়ার্দীকে অনুরোধ করলেন। লর্ড ওয়াভেল বঙ্গদেশ ত্যাগ করার পর ৬ই সেপ্টম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী বোম্বেতে জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে এবং ৮ই সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল।

জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সুদীর্ঘ আলাপ হল—যার ফলে ১০ই তারিখে জিন্নাহ্ সাহেব সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অনুরোধ করলেন সব দলকে একত্রে বসে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে। ১১ই সেপ্টেম্বর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ভাইসরয় জিন্নাহ্ সাহেবকে নতুন দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানালেন। জিন্নাহ্ সাহেব আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, নীতিগতভাবে তাঁরা একমত হলেন এবং পুনঃ ১৬ই এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হল। এরপর ভূপালের নবাব জিন্নাহ্ সাহেব ও গান্ধীজী উভয়কেই দাওয়াত করলেন তাঁর বাসভবনে এবং এই তিনজন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর সিদ্ধান্ত হল—জিন্নাহ্ সাহেব ও গান্ধীজী দু'জনেই শান্তির জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষরদান করবেন আলাপ-আলোচনার জন্য। অক্টোবরের চার এবং আট তারিখে জিন্নাহ্ সাহেব এবং নেহরু পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য মিলিত হলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগের যোগদানের সম্ভাব্যতা আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভাইসরয় ভবনে ভাইসরয় ও জিন্নাহ্ সাহেবের সাক্ষাৎকার ঘটল অক্টোবরের ১২ ও ১৩ তারিখে এবং ১৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগ যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। এই ঘটনা উপলক্ষে জনাব জিন্নাহ্ সাহেব বলেছিলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্যই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

বাংলার নোয়াখালিতে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অক্টোবর মাসে এক হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় সেখানকার একটি হিন্দু জমিদার পরিবারসহ ৮৬ জন হিন্দু নিহত হয়। দাবাগ্নির মতো এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল এবং কলকাতার খবরের কাগজওয়ালারা প্রচার করতে লাগল সর্বপ্রকার কাহিনী—যার অধিকাংশই ছিল কাল্পনিক। সারা ভারতবর্ষের শত শত হিন্দু পত্র-পত্রিকায় সেসব কাহিনী ছাপা হল। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে, তিনি স্বয়ং নোয়াখালি গমন করবেন এবং যতদিন সাম্প্রদায়িক হৃদ্যতা ও শান্তি ফিরে না আসবে ততদিন তিনি সেখানে থাকবেন। গান্ধীজী কলকাতায় আসবার একদিন পূর্বে বিহার থেকে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের খবর এল। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল আণুবীক্ষণিক। হাজার হাজার মুসলিম স্ত্রী, পুরুষ আর শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। কয়েকজন মুসলিম যুবক কলকাতায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিহারে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি উত্তর করলেন, নোয়াখালির উদ্দেশে তিনি যখন দিল্লি ত্যাগ করেন তখন বিহারে কোনো দাঙ্গা ছিল না, এখন মাঝপথে তিনি মত পরিবর্তন করতে পারবেন না। প্রতিনিধিদলটি গান্ধীজীর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিল যে, তিনি একজন ভণ্ড এবং সেজন্য তিনি চেষ্টা করছেন বিহার প্রদেশের হত্যাকাণ্ড থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিতে। গান্ধীজী হাসিমুখে উত্তর করলেন, তাদের মতো যুবকদের চেয়ে ইতিহাসই বিচার করবে তাঁর কাজের। এই ঘটনা সোহ্‌রাওয়ার্দী জানতে পেরে দুঃখিত হলেন। তিনিই যুবকদের ডেকে এনে বললেন, বোকার মতো ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত এবং আরও পরামর্শ দিলেন যে, তারা যেন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'বাপুজীর' বিচার না করে। তিনি জানালেন, গান্ধীজী একজন অসাধারণ ব্যক্তি এবং তিনি যাতে তদনুরূপ ব্যবহার পান তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তাঁর সরকার করবে।

ভারতের সর্বত্র ধীরে ধীরে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং শিগ্‌গিরই তা প্রবল আকার ধারণ করল। উত্তর-ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর সীমাবদ্ধ না থেকে গোলযোগ পুরাদস্তুর গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত হল। লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হল, তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হল, আগুন আর ধোঁয়ার আড়ালে সবকিছু সর্বত্র হারিয়ে গেল। আইন ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেল। সেনাবাহিনীকে ডেকে আনা হল কিন্তু তারা হয় অসহায় হল কিংবা হল পক্ষপাতদুষ্ট। পাঞ্জাবি, শিখ, পাঠান ও অন্যান্যরা ভুলে গেল যে তারা মানুষ। আর এইসব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল ধর্মের নামে কিংবা ধর্মরক্ষার অজুহাতে। ধর্ম মানুষের জীবনের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পেল। মানুষের দ্বারা সংঘঠিত এমন ভয়ানক বর্বরোচিত কাণ্ড ইতিহাসে কখনও স্থান পায়নি এবং পাবেও না। এ সম্বন্ধে নেহরু এক বিবৃতিতে বলেন, "সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার চিন্তা ভয়বাহ। সমস্ত জাতিকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে মনে হয় এবং সেই অবস্থায় ক্রমে তারা অতলে নেমে যাচ্ছে। যে-দেশ বা জাতি ধর্মমতের দাস—তার উন্নতি অসম্ভব।"

www.nagorikpathagar.org

কলকাতার হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী নোয়াখালির ঘটনার পর বাংলাদেশের অবস্থা শান্ত ছিল। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশগ্রহণকারীরা বেশিরভাগই ছিল বহিরাগত, বিশেষ করে শিখ আর পাঞ্জাবিরা এবং অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসী তাদের শিকার ছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকে কেবলমাত্র ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোটামুটিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল এবং তাতে স্থানীয় জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিল।

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুন হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সন্দেহ ও প্রতিহিংসার বিষে জর্জরিত পরিবেশে তারা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা এমন প্রবল আকার ধারণ করল যে, যুক্তির কাছে কেউ নতি স্বীকার করতে চাইল না। উভয় সম্প্রদায়েরই নেতৃত্ব গ্রহণ করল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

লোকে বিস্মৃত হল প্রসিদ্ধ লাহোর প্রস্তাবের পেছনের আদর্শ এবং তারা চিন্তা করতে লাগল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জমিদার, সরকারি আমলা-গোষ্ঠী—এমনকি নিম্নস্তরের কর্মচারীরা পর্যন্ত তাদের স্বার্থের জন্য প্রয়াস পেল ভয় ও ঘৃণা- মিশ্রিত এক মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করার এবং এইভাবে তারা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেদিমূলে সাধারণ লোকদের বলি দিল। বাংলাদেশেও এই মনস্তত্ত্ব সংক্রমিত হল—যার সম্বন্ধে ধারণা ছিল সর্বাধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বলে। ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাসিম এঁরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, যদিও শেষোক্ত দু'জন কিছুটা খ্যাতির আলোয় টিকে ছিলেন তাঁদের নানাবিধ ব্রিটিশবিরোধী কাজের দরুন যেমন আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের লোকদের বন্দিত্বদশা থেকে মুক্তির আবেদন করা ইত্যাদি। কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী মুসলিম লীগ নেতাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কংগ্রেসের মধ্যেও দক্ষিণপন্থীরা প্রবলতর হয়ে উঠল, জনসাধারণের উপর পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রভাব হারাতে থাকলেন। এমনকি, গান্ধীজীও অতিরিক্ত গোঁড়ামির অগ্রগতিকে উপলব্ধি করলেন। কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী নেতা সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের করায়ত্ত হয়ে পড়ল। হিন্দু মহাসভা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল, শেষোক্ত দল দু'টিতে যদিও অনেক নিঃস্বার্থ ও অনুরক্ত কর্মী ছিল।

বাংলাদেশে জনাব আবুল হাসিম ও তাঁর অনুগামীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবসময় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। বাংলাদেশকে ভারতের সার্বভৌমত্ব থেকে বাঁচিয়ে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন। ভারত কখনোই তাঁদের ধারণায় একটি অখণ্ড দেশ ছিল না। ব্রিটিশ তার ক্ষমতার জোরে তাকে পরিণত করেছিল একটি দেশে এবং তারা বিশ্বাস করত যে, ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার পর একমাত্র কোনো ফ্যাসিবাদী সরকারই সক্ষম হবে তাকে অখণ্ড রাখতে। তাঁরা ছিলেন যৌথ নির্বাচনকমণ্ডলী আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় প্রতিরোধ খাড়া করা প্রয়োজন তাঁরা বিশ্বাস করতেন। সে-সময় উপমহাদেশের মুসলিম লীগপন্থী

www.nagorikpathagar.org

যে কোনো গ্রুপের চেয়ে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি ছিল।

বামপন্থী বলে পরিচিত জনাব আবুল হাসিমের অধিকাংশ অনুগামীরাই তাঁদের কর্মক্ষেত্র ঢাকা থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করলেন। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হবার পর জনাব আবুল হাসিমের দলের মুখ্য কর্মীদের ঝোঁক দেখা গেল সংগঠনকার্যের তুলনায় অধিবিদ্যামূলক আলাপ-আলোচনার দিকে। তাঁরা আলাপ করতে লাগলেন 'রাবুবিয়াৎ' এবং 'রাব্বানিয়াত'। ইসলামী বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে আল্লামা আজাদ সুবহানীর পরিচালনায় দার্শনিক আলোচনাসভারও তাঁরা অনুষ্ঠান করলেন। এজাতীয় উচ্চাঙ্গ আলোচনায় সাধারণ কর্মীরা কোনো উৎসাহ বোধ না করলেও তারা চুপ করে থাকত ; কারণ পাছে জনাব আবুল হাসিম অসন্তুষ্ট হন। বিরাট সংগঠন-প্রতিভার জন্য ইতিপূর্বে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, অনতিবিলম্বে তাঁরাও কাজ আদায়ের জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে থাকলেন। কোনো সরকারি কর্মচারী তাঁদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে তাঁরা দাবি করতেন তাকে অন্যত্র বদলি করে দেবার জন্য। মন্ত্রীদেরও তাঁরা ভয় দেখাতেন। তাঁদের কথা না শুনলে তার পরিণাম কি হতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন। এমনকি, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকেও বাদ দিলেন না। জনাব আবুল হাসিম ও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে ক্রমশ ভুল বোঝাবুঝি বেড়ে চলল। তথাকথিত আদর্শবাদী কর্মীদের অধিকাংশ অর্থাভিলাষী ও আদর্শচ্যুত হয়ে গেল। 'পারমিট' ব্যবসা বিশেষ করে বেসামরিক সরবরাহের 'পারমিট' বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ আর তাদের থাকল না। রাতারাতি তাঁরা কোম্পানি গড়তে আরম্ভ করলেন। 'দারুল ইসলাম সিন্ডিকেট' হল এজাতীয় একটি কোম্পানি। কলকাতার রিপন স্ট্রীটে বসে তারা চাইল জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে একদা সংগঠন করেছিল যারা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সমগ্র ছাত্রসমাজ আস্থা হারাতে লাগল জনাব আবুল হাসিম ও তাঁর অনুগামীদের উপর।

কিন্তু জনাব আবুল হাসিমকে তাঁর যেসব অনুচরেরা সদা-সর্বদা ঘিরে থাকতেন, তাঁরা এই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ আগোচরে রেখে দিলেন। তাঁরা জনাব আবুল হাসিমকে এতদূর বিভ্রান্ত করলেন যে, তিনি ভাবলেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি সক্ষম হবেন। যখন মৌলানা আকরাম খাঁ পদত্যাগ করলেন, তখন জনাব আবুল হাসিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক সভা আহ্বান করে স্বয়ং সভাপতির পদপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন।

জনাব ফজলুল হক সাহেবকে লীগের দক্ষিণপন্থীরা আর কলকাতার ছাত্রসমাজ তাঁর বিপক্ষে খাড়া করাল। জনাব আবুল হাসিমই তখন কেবল পরিস্থিতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। জনাব ফজলুল হককে রোধ করা সম্ভব হল একমাত্র আকরাম খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়ে। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব নিরপেক্ষ থাকলেন যদিও জনাব আবুল হাসিমের অনুগামীরা চেয়েছিল তাঁর সমর্থন। জনাব আবুল হাসিম ও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে এ ঘটনায় চরম বিচ্ছেদ হয়ে গেল। জনাব আবুল হাসিম চলে গেলেন নিজ আবাসস্থান বর্ধমান শহরে। সংগঠনের কাজে তাঁর

www.nagorikpathagar.org

আগ্রহ আর থাকল না। কিন্তু যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জনাব আবুল হাসিম যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না—মুসলিম লীগ থেকে তাঁর কার্যত অবসরগ্রহণের পরও। তাঁর দলীয় কর্মীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন ঢাকায়—সেখানে পূর্ব হতেই জনাব আবুল হাসিমের দলীয় ভবন ছিল। পূর্ববাংলার লোকেরা ধর্মের নামে অতীতে যা করেছিল এবং তখন যা ঘটেছিল তাতে মোহমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, তাঁরা জীবনের বাস্তব দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। তাঁরা ঠিক করলেন, নিজেদের উৎসর্গ করবেন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, সংগ্রাম করবেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং দেশকে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সমাজতন্ত্রের দিকে। মুসলিম লীগ ত্যাগ করে তাঁরা ব্যস্ত হলেন এক কর্মসূচি প্রণয়নে—যা মানুষের মতবাদকে অধিকতর যুক্তিসম্পন্ন করবে। তাঁরা সবসময়ই জানতেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব, যার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল নিশ্চিতভাবে, তাদের করবে নিপীড়ন, তাদের উপর করবে অত্যাচার, কিন্তু জনসাধারণের উপর তাঁদের আস্থা ছিল অটুট।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতার সঙ্গে দীর্ঘতর হওয়ায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, আমলাচক্র ও অন্যান্য কর্মচারীরা সকলেই অবাধ্য হয়ে উঠল। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে, প্রত্যেকটি দফতর—প্রত্যেকটি সরকারি মহল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবার উপক্রম হল।

ব্রিটিশ সরকার—যারা গোড়া থেকেই নিজেদের শাসন কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল, শীঘ্রই উপলব্ধি করল পরিস্থিতি। তারা বুঝল যে, ঘটনাপ্রবাহ চলে যাচ্ছে তাদের আয়ত্তের বাইরে। ১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি ইংলন্ডের সরকার ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে তাঁরা ভারত ত্যাগ করবেন। তাঁরা তাদের সিদ্ধান্ত জানালেন যে, এর দরুন যদি ভারতকে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে খণ্ডিত করার প্রয়োজন হয়, তাও তাঁরা মেনে নেবেন যথাসম্ভব অনিচ্ছার সঙ্গে। বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁরা লর্ড ওয়াভেলকে অপসারিত করে শেষ ভাইসরয়রূপে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিযুক্তি ঘোষণা করলেন। তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশ দান করা হল—তিনি ভারতীয় নেতাদের এক বা একাধিক সরকারের দায়িত্বগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লিতে পদার্পণ করেই তাঁর কাজ পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ করলেন। ভারতে এসে তিনি দেখতে পেলেন "একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের দোলক, যার দোলানির প্রসারতা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান।" ("a terrible pendulum of massacres swinging wider and wider.") সমস্যার প্রকৃত সমাধান একমাত্র অখণ্ড ভারতে সম্ভব, এই ছিল তাঁর নিজের বিশ্বাস। কিন্তু মুসলিম লীগের সুদৃঢ় দাবি হল—পাকিস্তান এবং কংগ্রেস যদিও প্রস্তুত ছিল না মুসলমানদের হাতে বিস্তীর্ণ এলাকা ছেড়ে দিতে, তবু দেশবিভাগই তাদের কাছে শ্রেয় মনে হল দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের একমাত্র বিকল্প হিসাবে। মাউন্টব্যাটেন স্থির করলেন দেশবিভাগের পরিকল্পনাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে—যাতে

www.nagorikpathagar.org

দেশবিভাগের জন্য জিদ না করাই মুসলিম লীগ যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারে এবং যদি তা না করে, প্রস্তাবিত নব রাষ্ট্র পাকিস্তানকে এমন অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি করা হবে—যাতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র দু'টি একমত হয়ে বাতিল করে দেবে দেশবিভাগ। মাউন্টব্যাটেন গণনায় ভুল করলেন। তিনি নেহরু কর্তৃক ভারতবর্ষের ইতিহাসের পটভূমিকার বিশ্লেষণ দ্বারা বিভ্রান্ত হলেন। সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ামাত্র তিনি কংগ্রেস ও শিখদের বাধ্য করলেন তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে, আর মুসলিম লীগের উপর এক প্রকার জবরদস্তি করে তা চাপিয়ে দিলেন।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হবার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা বাংলাদেশকে স্বীকার করে আসছিল একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বলে। তদনুসারে ১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবং পরে ক্যাবিনেট মিশনের বঙ্গদেশসংক্রান্ত প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল পূর্ববর্তী সংস্কার আইন আর ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন। বাংলাদেশকে দু'ভাগ করে মাউন্টব্যাটেন ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করতে চাইলেন এবং তাঁর ঘৃণিত চক্রান্তের রূপায়ণ সফল হল। আপোস-মীমাংসাসংক্রান্ত আলোচনা দ্রুতগতিতে চলতে থাকল। মুসলিম লীগকে জানিয়ে দেওয়া হল, হয় তারা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা স্বীকার করে নিক, অথবা কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি সম্বলিত পাকিস্তান গ্রহণ করুক। এ ছাড়া গত্যন্তর রইল না দেশের। মাউন্টব্যাটেন দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, মুসলিম লীগ যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে, গণপরিষদ ও তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপর দেশের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাবে।

১৯৪৭ সালের মে মাসে কংগ্রেস মানুষের প্রাণহানি যাতে আর না হয় সেজন্য পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার প্রস্তাব করল। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহ্ সাহেবকে জানালেন, মুসলিম লীগ পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভক্তিকরণ স্বীকার করে নেবে, এই শর্তে সাময়িকভাবে ভারতবিভাগকে মেনে নিতে কংগ্রেস রাজি হয়েছে। ভারতবিভাগ সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আলাপ-আলোচনার জন্য ১৮ই মে লন্ডন গমন করলেন এবং ৩১শে মে প্রত্যাবর্তন করলেন। ২রা জুন তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের আহ্বান করে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত ভারতবিভাগের পরিকল্পনা তাঁদের দেখালেন। ৩রা জুন পরিকল্পনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হল। ভাইসরয় তাঁর বেতারভাষণে সকল দলকে অনুরোধ করলেন, সকলেই যেন ৩রা জুনের পরিকল্পনাকে গভীরভাবে বিবেচনা করেন এবং মেনে নেন। জিন্নাহ্ সাহেব নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক অধিবেশন ডাকলেন, কিন্তু তিনি কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বাহ্ণেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পিত পাকিস্তান গ্রহণ করবেন। ১৯৪৭-এর ৯ই জুন যখন নতুন দিল্লিতে কাউন্সিলের সভা আরম্ভ হল, জিন্নাহ্ সাহেবের মুসাবিদা করা প্রস্তাবের খসড়া সভ্যদের সামনে উপস্থিত করা হল। কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বিমত হবার কোনো সুযোগ থাকল না। প্রস্তাবটি এইরূপ :

"মহামহিম ইংলন্ড সরকারের ১৯৪৭-এর ৩রা জুন তারিখের ঘোষণায়

www.nagorikpathagar.org

ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়েছে, তাকে পূর্ণ মাত্রায় বিচার ও বিবেচনান্তর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল সন্তোষ জ্ঞাপন করছে যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে না এবং তা হবে পরিত্যক্ত। একমাত্র যে পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত আছে, তা হল ইদানীং মহামহিম ইংলন্ড সরকারের ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখের ঘোষণায় প্রস্তাবিত ভারত-বিভাগ।

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অভিমত এই যে, যদিও তারা বাংলা ও পাঞ্জাববিভাগ সমর্থন করে না বা এজাতীয় কোনো বিভাগে তারা সম্মতি দিতে প্রস্তুত নয়, তথাপি তাদের বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিকভাবে মহামান্য ইংলন্ড সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাটিকে।"

"অতএব পরিষদ এতদ্বারা প্রস্তাব করছে—আপোসস্বরূপ উক্ত মৌলিক পরিকল্পনার মৌলিক নীতিগুলিকে গ্রহণ করার জন্য মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ্ সাহেবকে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রদানের এবং পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল মহামান্য ইংরেজ সরকারের পরিকল্পনার মৌলিক নীতি অনুযায়ী দেশরক্ষা, অর্থ দফতর এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থাসহ পক্ষপাতশূন্য এবং যথাযথভাবে পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করে সম্পাদন করতে।"

বাংলার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছিলেন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাসিম। কিন্তু তাঁদের পূর্বসত্তা আর ছিল না। ঘটনাচক্রে তাঁরা এখন অপদস্থ এবং নূতন পরিস্থিতির দরুন আচ্ছন্নও বটে। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করলেন—যদিও দিল্লিযাত্রার পূর্বে তিনি খুবই ব্যগ্র ছিলেন বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেনের বিধানকে গ্রহণ করার বিরোধিতা করার জন্য। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অখণ্ড বাংলা ছিল তাঁর কাম্য এবং সেজন্য হিন্দু নেতাদের তিনি হৃদয়ঙ্গম করানোর চেষ্টা করছিলেন যে, বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাঁদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, যদিও তিনি জানতেন—তা হচ্ছে একটি দুরূহ কাজ এবং হিন্দুরা সে অবস্থাকে মেনে নেবে না কোনোদিনই।

দিল্লিতে আইনসভার সভ্যদের সম্মেলনে জনাব আবুল হাসিম যে মত প্রকাশ করেন, এখনও তাঁর সেই মত। সভায় তাঁকে মুখ খুলতে দেওয়া হল না ; তাই এক বিবৃতিতে তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—সত্যের খাতিরে মাথাছাঁটা পাকিস্তান গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। তিনি দাবি করলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিধানের তুলনায় গান্ধীজী কর্তৃক সমর্থিত রাজা গোপালাচারীর ফরমুলা ছিল অধিকতর উন্নত পরিকল্পনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে লাহোর প্রস্তাব এবং সমগ্র পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে। ভাইসরয়-কল্পিত পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে সৃষ্টি হবে এক দানবের—যার সুদূরবিস্তারী ডানা দুইটি শত্রুভাবাপন্ন ভারতের দূর প্রত্যন্তে গিয়ে পড়বে। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা হয়তো স্তব্ধ হয়ে যাবে কিন্তু টেকসই সরকার এজাতীয় রাষ্ট্রে গঠন করা যাবে না। তিনি বললেন,

www.nagorikpathagar.org

"তাড়াহুড়ো করে মাউন্টব্যাটেনের এই বিকৃত পরিকল্পনা গ্রহণ না করে তিনি যেন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন ; কারণ মুসলমান সম্প্রদায় প্রকৃত স্বাধীনতার অপেক্ষায় দশ বছর বিলম্ব করতে রাজি আছে। তিনি জানালেন—মুসলিম জনসাধারণ জেগে উঠেছে এবং তারা প্রস্তুত সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে। মহামহিম ইংলন্ডেশ্বরের প্রতিনিধির কাছ থেকে স্বাধীনতাকে দান হিসাবে গ্রহণ না করে ত্যাগের মাধ্যমে তা অর্জন করা হউক"—এই তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব কাউন্সিলের কাছে ভাবাবেগপূর্ণ আবেদন পেশ করলেন। করুণ সুরে তিনি কাউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি আমার জীবদ্দশায় পাকিস্তান চান?" এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল সভ্যই সচিৎকারে দিলেন হাঁ-সূচক উত্তর। ক্ষণ বিরতির পর জিন্নাহ্ সাহেব বললেন, "বন্ধুগণ, তা হলে আপনাদের গ্রহণ করতে হবে এই মাথাছাঁটা কীটদষ্ট পাকিস্তানকে।" কিছুটা উদ্দীপনা তখনও পরিলক্ষিত হলেও তার মধ্যে পাওয়া গেল না পূর্বের মতো গভীরতা।

১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জনাব আবুল হাসিম এবং শরৎচন্দ্র বসু আলোচনা করছিলেন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে। শরৎ বসু ছিলেন নেতাজী সুভাচন্দ্র বসুর অগ্রজ। অতএব ভারতীয় জাতীয় ফৌজের নেতারাও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আলোচনার সময়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অতি গোপনীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তারপর আন্দোলন সৃষ্টি করা—তার বাস্তবায়নের জন্য।

কমিউনিস্ট পার্টির কাগজপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়—বৃহত্তর বঙ্গের পরিকল্পনায় ছিল পূর্ব-ভারতে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। পূর্ণিয়া থেকে আসাম পর্যন্ত এর এলাকা বিস্তৃত হবে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অংশ পরিচিত হবে মধ্যবঙ্গ নামে এবং তার অন্তর্ভুক্ত হবে সবগুলি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা, যথা—চট্টগ্রাম, ঢাকা, প্রেসিডেন্সী এবং রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলি এবং আসামের সিলেট জেলা ; আসামের অবশিষ্ট অংশের নাম হবে পূর্ব অঞ্চল। পূর্ণিয়াসহ বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলি নিয়ে গঠিত হবে পশ্চিম অঞ্চল। আইনসভায় হিন্দু-মুসলিম সভ্যসংখ্যা হবে আধাআধি কিন্তু সবসময় প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হবেন। রাষ্ট্রপালের পদটি আবর্তিত হবে লেবাননের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ হিন্দু-মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে দশ বৎসর যাবৎ। এটা কার্যকর না হলে বৃহত্তর তিন বঙ্গের স্বাধীনতা থাকবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান অথবা ভারতের সঙ্গে যোগ দেবার অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার। এই পরিকল্পনার মূল প্রণেতারা একে গোপন রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জনাব আবুল হাসিমের জনৈক বিশ্বস্ত কর্মী তা ফাঁস করে দিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে।

সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা—যা গান্ধীজীর নিকট শরৎ বসুর মারফত এবং জিন্নাহ্ সাহেবের নিকট সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব প্রেরণ করলেন, তা সংক্ষেপে এই :

(১) বাংলায় সাবেক মুসলিম লীগ সরকার বহাল থাকবে ; তবে হিন্দু মন্ত্রীদের

www.nagorikpathagar.org

জায়গায় অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে বাংলার কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিদের।

(২) বঙ্গদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কারও সঙ্গে যোগ না দিয়ে অখণ্ড ও স্বাধীন থেকে যাবে। বঙ্গদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে—না স্বাধীন থাকবে, সে প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান করবে সার্বজনীন ভোটের দ্বারা এবং যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত বাংলাদেশের গণ-পরিষদ।

(৩) জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হবে আইনসভায় মুসলিম, হিন্দু, তফশিলি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আসন।

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'People's Age' ও 'স্বাধীনতায়' এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। হিন্দু মহসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতি দিলেন—ভারত বিভক্ত হলে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে দাবি করে। কংগ্রেসের দুই প্রধান নেতা শরৎচন্দ্র বসু আর কিরণশঙ্কর রায় বাদে শ্যামাপ্রসাদের দাবি সমর্থন করলেন প্রায় অন্যান্য সকল হিন্দুনেতা। জিন্নাহ্ সাহেব কঠোর ভাষায় দোষারোপ করলেন প্রদেশগুলির বিভাগের প্রস্তাবকে এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে নির্দেশ দিলেন মাউন্টব্যাটেনের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট হিন্দু মহাসভার দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপ বানচাল করে দিতে।

কয়েকদিন পর সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বাসভবনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক বৈঠকে মুসলিম লীগের তরফ থেক নাজিমুদ্দিন, সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাসিম এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়কে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি বাংলাবিভাগের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকার নিল। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী মাদ্রাজে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বঙ্গবিভাগ দাবি করলেন ; কিন্তু কয়েকদিন পর গান্ধীজী মন্তব্য করলেন, বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা পূর্ব-ভারতের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হবে। দেশবিভাগের সবচেয়ে দুঃখদায়ক দিক হচ্ছে নেহরুর মতো মানবতাবাদী ও ইতিহাসবেত্তা ব্যক্তিও সাম্রাজ্যবাদের দালাল মাউন্টব্যাটেনের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হলেন। তিনি বঙ্গবিভাগকে স্বীকার করে নিলেন ইতিহাসের ধারা ও মানবোচিত ন্যায়পরায়ণতাকে বিস্মৃত হয়ে। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন, ভারতবিভাগ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু বঙ্গদেশ থাকবে অখণ্ড। ২রা মে তারিখে এক বিবৃতিতে আবুল হাসিম বঙ্গবিভাগের দাবিদারদের নিন্দা করে তাদের অভিহিত করলেন সাম্রাজ্যবাদী, ধনতন্ত্রী ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের দালাল বলে এবং আবেদন জানালেন হিন্দুদের কাছে—তারা যেন প্রতিক্রিয়াশীল ও চরমপন্থী হিন্দু নেতাদের পরামর্শে বিভ্রান্ত না হয়। ১২ই মে তারিখে আবুল হাসিম ও শরৎচন্দ্র বসু একত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সার্বভৌম বাংলার বিষয়টি আলোচনা করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলেন। ২০শে মে শরৎ বসু কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় কংগ্রেস-লীগের যুক্ত কমিটির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে এক সাময়িক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। গান্ধীজীর নিকট তাঁর ২৩শে মের পত্রে শরৎ বসু লিখলেন :

www.nagorikpathagar.org

"গত মঙ্গলবার রাত্রিবেলা আমার বাসগৃহে এক সভা হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, আবুল হাসিম, আব্দুল মালেক, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্‌সী। আমরা সাময়িকভাবে একটি চুক্তি করেছি এবং তার একটা নকল এইসঙ্গে আপনার বিবেচনার জন্য পাঠানো হল। আমি ও আবুল হাসিম শনাক্তকরণের জন্য অন্যান্যদের সম্মুখে এতে স্বাক্ষরদান করেছি। আমাদের আলাপ-আলোচনার ধারা থেকে আমার মনে হয় অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই এই সাময়িক চুক্তিকে অনুমোদন করবে—সম্ভবত এর কোনো কোনো স্থানে সামান্য পরিবর্তন করে। আমি এখনও মনে করি, আপনার সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করলে উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সাময়িক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পাকা চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তা হলে আমরা বাংলার সমস্যা তো সমাধান করবই, সেইসঙ্গে আসামেরও। ভারতের বাকি অংশে এর দরুন অনুকূল প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে।"

৮ই জুলাই গান্ধী উত্তর দিলেন :

"আমি তোমার মুসাবিদা পাঠ করেছি। আমি এখন পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে মোটামুটি পণ্ডিত নেহরু ও সরদার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। উভয়েই প্রস্তাবটির ঘোর বিরোধী এবং ওটা হিন্দু তফশিলি সাম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে একটি বিরোধ বাধানোর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়—এই হচ্ছে তাঁদের অভিমত। এটা শুধু তাঁদের সন্দেহ নয়, বরং দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন, তফশিলি জাতির ভোট সংগ্রহের জন্য অজস্র পরিমাণে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এই যদি ব্যাপার হায়, তা হলে অন্তত এখনকার মতো সংগ্রাম থেকে বিরত থাকাই তোমার পক্ষে উচিত হবে ; কারণ খোলাখুলি দেশবিভাগের তুলনায় অনেক খারাপ হবে দুর্নীতিপরায়ণতা দিয়ে কিনে নেওয়া একতা....বঙ্গদেশের অখণ্ডতার জন্য সংগ্রামে বিরত থাকা তোমার পক্ষে সমীচীন হবে, বঙ্গদেশ বিভক্তির জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বন্ধ না করাই ভাল।"

হিন্দু সাময়িক পত্রগুলির প্রচারণা ক্রমশ বৃদ্ধি পেল এবং যেসব হিন্দু নেতা প্রথমত পরিকল্পনাটি সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা সাহস হারাতে আরম্ভ করলেন। আলোচনার জন্য দিল্লিতে গেলে কিরণশঙ্করের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়, তার ফলে তিনি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করলেন। শরৎচন্দ্র বসু বাংলাবিভাগের অযৌক্তিকতা কিছুকাল যাবৎ হিন্দুদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন ১৯০৫ সালের মহান আন্দোলনের কথা, যখন বহু বাঙালি দেশপ্রেমিক সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন—উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ নেতাদের কাছে কেমন ব্যবহার পেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ; একজন মহান নেতা হওয়া সত্ত্বেও কেন কংগ্রেস পরিত্যাগ করে স্বরাজ্যদল দেশবন্ধুকে গড়তে হয়েছিল, কেনই বা কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হবার পর সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। তিনি তাদের আরও বললেন—ভারতমাতাকে বিভক্ত করা যদি পাপ হয়, তবে বঙ্গমাতার

www.nagorikpathagar.org

অঙ্গব্যবচ্ছেদ হবে মহাপাপ।

কিন্তু শরৎচন্দ্র বসুর পিছনে শক্তিশালী পত্রিকাগুলির কোনো সমর্থন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বক্তৃতাগুলি কোনো প্রচারই পেল না। আবুল হাসিমও বেশ কয়েকটি মিলিত জনসভায় বক্তৃতা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে কমিউনিস্ট পার্টির আয়োজিত সর্বদলীয় এক আলোচনাসভায় তিনি শ্রোতাদের বিশেষ করে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ দিলেন যেন তাঁরা ভারত ইতিহাসের মূল শিক্ষার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হন। তিনি বললেন, "প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, চাঁদসুলতানা, রানী অহল্যাবাই, ঈসা খান, কেদার রায় এঁরা হলেন ভারতীয়দের আদর্শস্থানীয় ; কারণ এঁরা ছিলেন অখণ্ড ভারতের ঘোর বিরোধী। অখণ্ড ভারত ছিল সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন আর একনায়কত্বের প্রতীক।" আবুল হাসিম 'অখণ্ড ভারত' বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক মুঘল ও ব্রিটিশের সৃষ্টি বলে দাবি করলেন। ভারতবর্ষ কোনোদিনই এক দেশ ছিল না ; এবং তাকে একত্র করেছিল ব্রিটিশ তাদের সঙ্গীদের সাহায্যে। কিন্তু শরৎ বসুর ন্যায় আবুল হাসিমও লড়াই করেছিলেন সুনিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ; কারণ তাঁরা কিছুতেই সক্ষম হলেন না এসব তথ্য হিন্দুদের হৃদয়ঙ্গম করাতে।

১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল স্যার নাজিমুদ্দিন উক্তি করলেন, "আমার বিবেচনায় হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনসাধারণের স্বার্থে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, বঙ্গবিভাগ হবে বাঙালিদের পক্ষে মারাত্মক।"

জিন্নাহ্ সাহেব খুব শীঘ্র আবিষ্কার করলেন, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশকে বিভাগ করার মতলব হচ্ছে মাউন্টব্যাটেনের উদ্ভাবিত এবং প্রদেশগুলির বিভাগের ফলে যে বিপদ ঘটবে, সে সম্পর্কে কংগ্রেস বা শিখ নেতাদের কোনোকিছু বোঝাবার প্রচেষ্টা হবে সম্পূর্ণ নিরর্থক। পরবর্তীকালে লন্ডনে রয়্যাল এম্পায়ার সোসাইটিতে ১৯৪৮-এর ১৬ই অক্টোবর বক্তৃতা করার সময় ভারতবিভাগে তাঁর কি ভূমিকা ছিল তা স্বীকার করে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন :

"তিনি (জিন্নাহ্) প্রবল যুক্তি উত্থাপন করলেন—কেন প্রদেশগুলিকে ভাগ করা উচিত হবে না। তিনি বললেন, তারা জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, তাদের ভাগ করা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমি স্বীকার করলাম, কিন্তু আমি বললাম—আপনাকে আর কতদূর জানাতে হবে যে, ঐ একই যুক্তি সমগ্র ভারতকে বিভক্ত করার ব্যাপারেও প্রযুক্ত হতে পারে। আমার কথা তাঁর মনঃপূত হল না এবং তিনি শুরু করলেন নূতনভাবে ব্যাখ্যা করতে—কেন ভারতবর্ষকে ভাগ করতে হবে। অতএব আমরা আবর্তিত হতে থাকলাম একই খুঁটির চারধারে—যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হল এ যুক্তিতর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত। তিনি পরিশেষে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, হয় তাঁকে গ্রহণ করতে হবে পাঞ্জাব আর বঙ্গদেশসহ অখণ্ড ভারতকে, আর নাহয় বিভক্ত বাংলা ও পাঞ্জাবসহ খণ্ডিত ভারতকে। তিনি শেষোক্ত সমাধানটিকে গ্রহণ করলেন।"

৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নিয়েছে দেশ-

www.nagorikpathagar.org

বিভাগের নীতিকে এবং তাঁরা স্থির করেছেন ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ অর্থাৎ দশ সপ্তাহের মধ্যে ভারতের শাসনভার ত্যাগ করবেন। ভারতীয় নেতাদের তাঁর আলাপ-আলোচনায় মাউন্টব্যাটেন কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, দেশবিভাগ করা স্থির হলেও—তা হবে না দি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এরা যে এক-একটি জাতি একথা ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করতে পারেনি বা পারবেও না। তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে জানিয়ে দিলেন, তিনি যদি তাঁর দ্বি-জাতিতত্ত্বের মতবাদ নিয়ে জিদ করেন, তা হলে কংগ্রেস রাজি হবে না দেশবিভাগে। মাউন্টব্যাটেন কিন্তু এমন একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করলেন, যার দরুন দ্বি-জাতিতত্ত্বের মতবাদ গ্রহণ না করেও সম্ভব হবে ভারতবিভাগ সম্পাদন করা।

বাংলার আইনসভার উভয় পরিষদ এক যৌথ অধিবেশনে সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য মিলিত হল—তারা ভারতে যোগদান করবে, না পাকিস্তানে যোগদান করবে। উভয় পরিষদে মুসলিম সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন অধিকাংশের সিদ্ধান্ত হল পাকিস্তানে যোগদান করার। এরপর আইন পরিষদদ্বয়ের সভ্যদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের জেলাসমূহের অধিবাসী, তাঁরা অখণ্ড বাংলা চান, না প্রদেশবিভাগ চান, তা নির্ধারণ করার জন্য পৃথকভাবে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। আইনসভাদ্বয়ের পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগ সদস্যরা মুসলিম লীগের নির্দেশানুযায়ী ভোট দিলেন বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় তাঁদের সিদ্ধান্তই বলবৎ হল। অতঃপর আইনসভায় পশ্চিমবাংলার সদস্যরা পৃথকভাবে মিলিত হলেন। এই দলের মুসলিম সভ্যরা প্রদেশবিভাগের বিপক্ষে ভোট দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হবে যে, মুসলিম লীগ তার দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতবাদ বর্জন করেছিল যখন সে ভারতবর্ষকে তিনটি অংশসম্বলিত একটি গ্রুপে পরিণত করার জন্য ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল এবং পুনরায় শেষবারের মতো তাকে বর্জন করল বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে Mountabatten বিধান এবং সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গণভোটের প্রস্তাবে সায় দিয়ে। অধিকন্তু মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই স্বীকৃত হল—ধর্মীয় ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে লোক বিনিময় করা হবে না। এইভাবে মুসলিম লীগ মেনে নিল যে, পাকিস্তান একমাত্র মুসলমানদের বাসভূমি হবে না। এর অর্থ হল—দিল্লিতে আইনসভার সভ্যদের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবটিকে সুচারুরূপে কাফন পরিয়ে দাফন করা হল এবং সমস্যার সমাধান ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের নীতি অনুসারে বের করা হল।

দেশবিভাগ চূড়ান্তভাবে ঠিক করার পর এবং সেটা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হলে সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ ভাগাভাগির প্রশ্নটি বিবেচনা আরম্ভ হল। স্যার নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একদল সভ্য বঙ্গবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি দলের একজন নেতা নির্বাচন করতে সচেষ্ট হলেন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর বিরূপতার দরুন লিয়াকত আলী খাঁ এই প্রচেষ্টাকে

www.nagorikpathagar.org

সমর্থন করলেন এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী স্যার নাজিমুদ্দিনকে পূর্ববাংলার নেতা হিসেবে চাইলেন। জিন্নাহ্ সাহেব প্রথমত ইতস্তত করলেন ; কারণ তাঁর মনে হল শাসনভার তাঁর হাতে না থাকায় নাজিমুদ্দিনের পক্ষে সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে অবিহিত হওয়া সম্ভব হবে না। জিন্নাহ্ সাহেব সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, নেতা নির্বাচনের গুজবটি ভিত্তিহীন এবং যদি তা করতে হয়, তা হলে হবে স্বাধীন পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তখন সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সামনে মুসলিম লীগের তরফে যাঁরা ওকালতি করলেন, তাঁদের জন্য কাগজপত্র তৈরির ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন নিজে নির্বাচিত হবার চেষ্টা করছেন—এই খবরে তিনি কর্ণপাত করতে চাইলেন না। তিনি তাঁদের বললেন, তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, নেতা ঠিক করার জন্য কোনো নির্বাচনই হবে না ; কারণ প্রথমত জিন্নাহ্ সাহেব তাঁকে এই ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন ; দ্বিতীয়ত বিগত সাধারণ নির্বাচনে স্যার নাজিমুদ্দিন কথা দিয়েছিলেন যে, আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানকার রাজনীতিতে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করবেন না। কিন্তু হঠাৎ লিয়াকত আলী খাঁ ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচন পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত না হয়ে শুধু বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নাজিমুদ্দিন সাহেব ইতিপূর্বেই আইনসভার ৫২ জন সভ্যের সমর্থন পেয়েছিলেন ; তিনি এখন স্থির করলেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের অনুগামীদের মধ্যে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন এবং সিলেটের সতেরো জন সভ্যের সাহায্যে তিনি নেতৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মন্ত্রিসভায় সিলেট সদস্যদের জন্য তিনটি পদের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি তাঁদের সমর্থন লাভ করলেন। পরে অবশ্য নাজিমুদ্দিন সাহেব এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। এমতাবস্থায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের পরাজয় অবধারিত ছিল। জনাব আবুল হাসিম নিরপেক্ষ থাকলেন।

স্যার নাজিমুদ্দিন পূর্ববাংলার নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। ঠিক হল, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তিনি পূর্ববঙ্গ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী রইলেন। ঐ দিনই তিনি পূর্ববাংলার শাসনভার স্যার নাজিমুদ্দিনকে এবং পশ্চিমবাংলার শাসনভার ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে অর্পণ করলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলে স্থির করলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় গান্ধীজী ছিলেন কলকাতায়। তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আহ্বান করেন। যে সমস্ত মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতায় থেকে গেল, তারা আশঙ্কা করল যে, ১৫ই আগস্ট হিন্দুরা শাসনভার গ্রহণ করার পর তাদের হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ হবে। তারা সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানাল। পঁচিশ বছর ধরে যাদের সমর্থন পেয়ে তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্ব করেছেন, তাদের এই অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

হিন্দুরা যদি মুসলিমনিধন থেকে বিরত না থাকে, তা হলে মহাত্মা গান্ধীজী আমৃত্যু

www.nagorikpathagar.org

অনশন করবেন বলে ঘোষণা করলেন। কলকাতার দাঙ্গাউপদ্রুত বেলেঘাটা এলাকায় এক দরিদ্র মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তিনি এই সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এটা হল স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিন যত এগিয়ে আসল, গান্ধীজীর অবস্থা ততই শোচনীয় হতে লাগল। যখন দিল্লি ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে "গান্ধীজী কী জয়" রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছিল, তখন তিনি এক দরিদ্র মুসলমান ঘরে মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তাঁর পাশেই রইলেন, যদিও হিন্দুরা সবসময় তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। গান্ধীজীর এই অনশন হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। এই কারণে স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই অতিক্রান্ত হল।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রথম দশক

[১৯৪৭—১৯৫৭]

পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবন

জাতিগঠনের ইতিহাসে পাকিস্তান এক অভিনব পরীক্ষা। এর দু'টি অংশের মাঝখানে হাজার মাইল পরিমাণ বিদেশী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকায় ভৌগোলিক অখণ্ডতাবিশিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের অনুরূপ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল না। অদ্ভুত ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়াও এর পূর্বাংশ এমন একটি সমপ্রকৃতির অখণ্ড দেশ, যার ছ'কোটি অধিবাসী একই ভাষাভাষী ; অথচ, সাড়ে চার কোটি লোক-অধ্যুষিত এর পশ্চিমাংশ হচ্ছে বহুজাতিক এবং পৃথক ধর্মী (heterogenous)। এর প্রত্যেক অংশের অধিবাসীদের নিজস্ব আচার-ব্যবহার, ভাষা, জাতিগত সংস্কার ও সচেতনতা আছে। জলবায়ুর পার্থক্য ও অন্যান্য কারণবশত সামাজিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের জীবনযাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানীদের জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। প্রতি অংশেরই খাদ্য, পোশাক ও ঘরবাড়িতে নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে জলবায়ু আর ভূসংস্থানের পার্থক্য—পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য, বৃষ্টিপাতহীন ভূমি, আর বৃষ্টিপাতে সরস পূর্ব পাকিস্তানের সমতল ভূমি, উভয় অংশের অধিবাসীদের মধ্যে বিসদৃশ্য মানসিক গুণ আর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার জন্য অনেকটা দায়ী।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকালে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অর্থনৈতিক সাদৃশ্য ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি মধ্যযুগীয় আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ১৭৯৩ সালের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের উপর আধা-সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থা আরোপের বিরোধিতা করে আসছিল। এর দরুন পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সবসময়েই অগ্রবর্তী থেকেছে। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে শিল্পায়নে ক্রমাগ্রসর, বর্ধিষ্ণু কৃষিপ্রধান অঞ্চল ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পশুচারণ ও পশুপালনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখানকার কোনো কোনো

www.nagorikpathagar.org

অংশে কৃষিব্যবস্থাও উন্নতির পথে ছিল। পূর্বাংশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাট, ধান আর চা-ই প্রধান। বহু বৎসর যাবৎ এই অঞ্চল পৃথিবীর একমাত্র পাট রপ্তানিকারক ছিল। পশ্চিম অংশের প্রধান ফসল ছিল তুলা, গম আর বাজরা। অর্থনৈতিক কাঠামো আর উৎপাদিত ফসলের বৈষম্যের দরুন উভয় অংশের অর্থনৈতিক সমস্যা ভিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এবং সেজন্য পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হল। এইসব সমস্যার সমাধান এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ স্বভাবতই এক এক অংশের অধিবাসীদের সহজাত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল।

শাসকচক্র "পূর্ব পাকিস্তানীরা এক আদিম ও অসভ্যজাতির বংশধর এবং পশ্চাদ্‌ভূমির অধিবাসীহেতু তারা স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত"—এই কথা পৃথিবীর লোকদের মনে অঙ্কন করে দিতে সচেতন হলেন ; আর স্বাধীন দেশের তথাকথিত সাংবাদিকরাও একে সত্য বলে গ্রহণ করলেন। পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে যদি তাঁদের সামান্যতম জ্ঞানও থাকত, তা হলে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করার পূর্বে তাঁরা কানাডার কথা স্মরণ করতে পারতেন। কানাডা এমন একটি দৃষ্টান্ত—যেখানে মোটেই বলা চলে না যে, ইংরেজ এবং ফরাসিরা স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ঐতিহ্যের বিরোধের দরুন সক্রিয় সংস্থা সংস্থাপন দুঃসাধ্য হয়েছে সেখানে। কানাডার সমস্যাবলী অবশ্য বহুলাংশে সমাধান হয়েছে ; কিন্তু তা ভাবাবেগ বা লক্ষ্যবস্তুকে শ্বাসরুদ্ধ করে নয় ; বরং বৃহত্তম দেশপ্রেম সৃষ্টি করার অবিরাম প্রচেষ্টা দ্বারা। একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, একাধিক সমাজ থেকে একটিমাত্র সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, যদিও সর্বপ্রকার সমাজ দ্বারা একটা দেশ গঠিত হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে, যারা সেখানে তথাকথিত মোল্লা ও পীর, দুর্নীতিপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী, বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিক আর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ শোষণকারীদের চিরাচরিত প্রভাব নষ্ট করে দিয়ে গড়তে চায় এক আধুনিক সমাজ। সমাজের এই সম্ভ্রান্ত অংশটি উর্দুভাষী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে নিজসত্তা বিলীন না করে, বাংলাভাষার রক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্যও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজস্ব ইতিহাস, সাহিত্য ও কলা সম্পর্কে পূর্ববাংলাবাসীরা গর্বিত।

স্বাধীনতার পূর্বে প্রায় এক শতাব্দীকাল পশ্চিম পাকিস্তান তো বটেই, উত্তর-ভারতের অন্যান্য অংশও ব্রিটিশরাজের সেনাবাহিনীতে লোক সরবরাহ করেছে। গরিব, ধনী—প্রায় প্রতিটি পরিবারই সেনাবাহিনীতে যোগদান করে কমবেশি লাভবান হয়েছে ; যথা—বেতন, পেনশন কিংবা অন্য কোনো পুরস্কারলাভের মাধ্যমে। সেনানিবাসের জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের অনেকেই এশিয়ার এই অঞ্চলের লোকদের তুলনায় কম ভাবপ্রবণ। ইউরোপীয় অভ্যাস ও আদব-কায়দা শিক্ষা করায় তাদের বাস্তববাদী হবার দিকে ঝোঁক ছিল। সামরিক শিক্ষার দরুন তারা অধিকতর নিয়মানুবর্তী ও পদোন্নতিতে আস্থাবান ছিল। তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে কখনও আদর্শ বা নীতিবোধ অন্তরায় হয়নি। পৃথিবীর অহিন্দু আর অবৌদ্ধ দেশগুলির মধ্যে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি হিন্দু জনসংখ্যা আর বৌদ্ধ জনসংখ্যা, সেস্থানে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো সংখ্যালঘু

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় সম্প্রদায় নেই বললেই চলে।

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় তার উভয় অংশের মধ্যে মোটামুটি এই পার্থক্য ছিল। পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তান ছিল একেবরেই অভূতপূর্ব। লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার জন্য এই শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কোনো দেশের পরিচয়জ্ঞাপনে এ-জাতীয় ভাবমূলক নাম পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। 'ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকা' ও 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক' নাম দুটিও অনুরূপভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর অখণ্ডতার অভাব বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় ছিল।

অতএব, নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের সম্মুখে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কি করে এর দুটি অংশকে একত্র রাখা সম্ভব হতে পারে। এর প্রাথমিক দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান জিন্নাহ্ সাহেব এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এঁদের কেউই যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হল তার কোনোটার অধিবাসী ছিলেন না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, মারপ্যাঁচ সম্পর্কে প্রধান-মন্ত্রীর সম্যক পরিচয় ছিল না বললেই চলে। স্বভাবতই তিনি নিত্যনতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। সুসংবদ্ধ এবং স্পষ্টভাবে চিন্তা করার ক্ষমতার অভাব স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে এবং তার পরেও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল। জিন্নাহ্ সাহেব গভর্ণর জেনারেল হবার দরুন আমলাতন্ত্রই সর্বেসর্বা হল। ব্রিটিশ আমলের ভাইসরয়ের মতোই তিনি গভর্নরদের নিকট থেকে পাক্ষিক রিপোর্ট গ্রহণ করতেন। এমনকি, চীফ-সেক্রেটারিদের মতামতও তিনি সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করতেন। ফলে, দেশে আমলাতন্ত্র কায়েম হল, গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠল না।

বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদ আমলাতন্ত্রের অধীন হল। পাকিস্তানের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহ্মদ প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের শাসক হলেন। সরকারি দফতরের কাজে লিয়াকত আলী খানের কোনোরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি আমলাতন্ত্রের খপ্পরে পড়ে গেলেন এবং প্রকৃত শাসকরূপে আমলাদের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর রইল না। আজিজ আহ্মদ সংশ্লিস্ট মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই একমডেশন বোর্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সেল্স ট্যাক্স কমিশনার নিযুক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করলে মন্ত্রীকেই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। রাজনীতিকেরা দেশের শাসক, এ ধারণা খুব সত্য নয়। রাজনীতিকের কাজ দেশশাসন নয়, স্থায়ী শাসকদের উপর খবরদারি করাই তাঁদের কাজ। আসলে পেশাদারি শাসক আর বিশেষজ্ঞের দল সরকারি কাজ চালিয়ে থাকে।

ঔপনেবেশিক শক্তিবিরোধী আন্দোলনগুলির সঙ্গে পাকিস্তানের উঁচুতলার নেতাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা এতে কোনো অংশগ্রহণ করেননি এবং কখনও একে বুঝবার চেষ্টাও করেননি। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সপক্ষে প্রচারকার্য চালাবার জন্য ইউরোপ অথবা আমেরিকায় ভারতীয় লীগ কিংবা সরদার জে. জে. সিং, ডঃ সৈয়দ হুসেন

www.nagorikpathagar.org

বা কৃষ্ণমেননের মতো পাকিস্তানের কোনো কেন্দ্র বা প্রতিনিধি ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের সৃষ্টি এশীয় দেশগুলির দৃষ্টিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন এক চক্রান্ত বলে বিবেচিত হল। পাকিস্তানী নেতারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগের উপর বিশেষ জোর দিলেন। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের এখনও অভিমত এই যে, ধর্মীয় গোঁড়ামির আতিশয্যের ফলে ভারতবিভাগ হয়েছে এবং সেই আবেগ যখন নিঃশেষিত হবে, তখন তা বাতিল হয়ে যাবে। অনেক বিদেশী কূটনীতিক কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সমর্থন করেন, যেহেতু ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও ভারত একত্র হতে যখন বাধ্য, তখন পাকিস্তানের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হলে কোনো ক্ষতি নেই। আবার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ এই বিষয়ে নিস্পৃহতা অবলম্বন করে থাকে ; কারণ তাদের বিবেচনায় এটা পাকিস্তান ও ভারতের একটি ঘরোয়া ব্যাপার।

পাকিস্তানে যাঁদের নিজস্ব কোনো নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল না, এমন অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দেশের প্রথম গণপরিষদে মনোনয়ন করা মুসলিম লীগের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল হয়েছিল। ভারত থেকে যাঁরা পাকিস্তানে এসে বসবাস করেছিলেন. তাঁরা উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন যে, শাসনতন্ত্র তৈরি হলো এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করতে হবে। কাজেই তাঁরা ঐসব নেতাদের—যাঁদের পাকিস্তানী হওয়া সত্ত্বেও অনুগামীর অভাব ছিল তাঁদের—সমর্থন করলেন। মন্ত্রীদের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটি বুঝতে সহজ হবে। ভোটাধিকারের ব্যাপকতা বৃদ্ধির পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন কোনোদিন কোনো নির্বাচনে সাফল্যজনকভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে পারেননি। আইনসভায় তাঁকে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে ঢুকতে হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রথম পর্যায়ে নিযুক্ত অধিকাংশ মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সম্পর্কে একই সত্য প্রযোজ্য। প্রত্যেককেই সরাসরি ভোটযুদ্ধের উপর নির্ভর না করে পরোক্ষ নির্বাচনের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। জনৈক প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী গোলাম মোহাম্মদ এবং সাইমন কমিশনের ভারত আগমনের পর থেকে জনসাধারণের দাবিকে যিনি কখনও সমর্থন করতে পারেননি, এহেন ব্যক্তি স্যার জাফরুল্লাহ্‌র মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্তি কাটা ঘায়ের উপর লবণের প্রলেপের মতো যন্ত্রণাকর হল। মন্ত্রিপরিষদে এমন কয়েকজন তথাকথিত বিশেষজ্ঞকে গ্রহণ করা হল যাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সংযোগ ছিল না। পাকিস্তান সরকারে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতরূপে অনুপস্থিত ছিল।

পাকিস্তানে আমলাদের দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারি নীতির বাস্তবায়নে সীমিত রইল না, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের দায়িত্বও তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করলেন। এই আমলারা কারা? বিভাগপূর্ব ভারতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে সবেমাত্র পাকা হয়েছেন—এমন কর্মচারীই পাকিস্তানে রাতারাতি চীফ সেক্রেটারি হয়ে বসলেন। প্রায় সকল কর্মচারীরই দ্রুত পদোন্নতি হল। ব্রিটিশ ও হিন্দু প্রবীণ কর্মচারীরা ভারতে চলে যাওয়ার দরুন যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণ করার জন্যই এর আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন ; এঁদের মধ্যে পাঞ্জাবিদের এবং যাঁরা অধুনা ভারতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে এঁরা মন্ত্রীদের বিভ্রান্ত করতে লাগলেন ; কেন্দ্রীয় এবং পূর্ববাংলার সরকারি দফতরখানা উভয় স্থানই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের উর্বরক্ষেত্রে পরিণত হল। সাবেক মুসলিম লীগ এবং তার আনুষঙ্গিক মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষিবাহিনী (Muslim League national Guards) ভেঙে দেওয়া হল আর তার স্থলে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হল, 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ'। সরকারের যাবতীয় নীতি ও কাজকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হল। এজন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে কাজ করতে দেওয়া হল না। কারণ, তারা জানত এজাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দিলে একদিন-না-একদিন জনসাধারণ নিজস্ব প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে চাইবে।

ভারতবিভাগের দরুন সবকিছুই বিভক্ত হল। এজন্য বহুবিধ কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীই এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ আমলে অধিকাংশ সৈন্য উত্তর-ভারত থেকে সংগৃহীত হত। যখন সৈন্যবাহিনী ভাগ করা হল, তখন প্রচুর-সংখ্যক বিভাগপূর্ব ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানে যোগ দিতে চাইল। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তারা শঙ্কিত হল, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই তারা সতর্ক হল। পদোন্নতি আর বদলির ব্যাপারেও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যামান ছিল। জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীর চীফ অব দি স্টাফের নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ক্ষমতা-দখলের ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্র পেকে উঠবার আগেই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আদেশক্রমে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের বহুদিনের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়।

সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের ভাল করেই জানা ছিল যে, মন্ত্রীরা কেউই জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন না এবং গণপরিষদের মুসলিম লীগ সভ্যরাও দেশকে কোনোদিনই শাসনতন্ত্র উপহার দেবেন না। কারণ, তা হলে তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক সত্তার বিলোপসাধন হবে।

আশিজন লোকের একটি দল নিজেদের মধ্যে থেকে গভর্নর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত আর মন্ত্রীদের নিয়োগ করে যাচ্ছিল বছরের পর বছর। আমলাতন্ত্রের সহায়তা লাভ করে তারা নিজেদের পদ আঁকড়ে থাকবে এবং কোনোপ্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বরদাস্ত করবে না বলে স্থির করল। ধর্মকে সাধারণ লোককে শোষণ করার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হল, সমস্ত দেশ গণশক্তির জন্য কারাগারে পরিণত হল। সাম্প্রদায়িক চেতনাপুষ্ট পুরাতন আলীগড় আন্দোলনকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে প্রবর্তন করা হল, যদিও দেশের শতকরা পঁচাশিজন অধিবাসীই মুসলমান ছিল। নেতারা পাকিস্তানে ইসলাম বিপন্ন হয়েছে বলে তাঁদের চিৎকারের পুনরাবৃত্তি শুরু করলেন। ভারত থেকে এদেশে হিজরতকারী ছিন্নমূল তথাকথিত নেতা সাহেবান শতকরা পনরো জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের

www.nagorikpathagar.org

হাতে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে প্রচার করতে থাকলেন। ভারত বা পাকিস্তানে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটলে এঁদের খুশির কারণ হত। কারণ, এজাতীয় ঘটনা এঁদের নেতৃত্ব বজায় রাখার সহায়ক ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, এখানকার মাটিতে জন্মগ্রহণ না করার দরুন এদেশের অর্থনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা যে-পরিমাণ অজ্ঞ ছিলেন তাতে ধর্মের দোহাই দেওয়া ছাড়া অন্যকিছু করা তাঁদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। 'ইসলামের বিশ্বজনীনতা' তাঁদের অনেকেরই বুলি হল এবং তাঁরা মুসলিম জাহানের একতার বড় সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন।

১৯৪৯-এর ডিসেম্বর মাসে জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফ্‌তির পৃষ্ঠপোষকতায় করাচিতে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ মুসলিম রাষ্ট্রগুলির একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা সংগঠনের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। স্যার জাফরুল্লাহ্ মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার দাবিতে অগ্রণী হলেন এবং ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে করাচিতে বারোটি মুসলিম রাষ্ট্রের সম্মেলন আহুত হল। আরব লীগের মধ্যে এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এর সেক্রেটারি জেনারেল ঘোষণা করলেন, করাচি সম্মেলনের দরুন আরবজগৎ ভারতের মূল্যবান সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবে। লেবানন, তুরস্ক ও আফগানিস্তান আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করল ; ইরান চাইল—ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করে বুঝতে। সম্মেলনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হল। এই শিশুসুলভ কাজের ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিদ্বেষ আর বিভেদ সৃষ্টি হল। এর ফলে ভারত আঞ্চলিক ভিত্তিতে আফ্রো-এশিয়ান দল গঠন করতে সুযোগ পেল।

নীতিগতভাবে পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা ছিল ; অথচ কার্যত পূর্ব-বর্ণনানুসারে তা একটি আমলাতন্ত্র ছিল। রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে আমলারা শাসনকার্য চালাচ্ছিল। মন্ত্রীরা তাঁদের কাজের জন্য গভর্নর জেনারেলের নিকট দায়ী ছিলেন। কারণ, তিনিই তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন। এই সকল নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বা বিধানসভার কোনো মতামত ছিল না। পাকিস্তান শুধু নামেমাত্র যুক্তরাষ্ট্র হল, প্রকৃতপক্ষে এর শাসনব্যবস্থা হল অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের যে-সমস্ত সুবিধা ভোগ করে আসছিল, সেসবকেও খর্ব করা হল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিজেকে জিন্নাহ্ সাহেবের জীবদ্দশায় উপেক্ষিত বোধ করছিলেন এবং তিনি অসুস্থ হয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য জিয়ারতে গেলে প্রধানমন্ত্রী তেমন দুঃখিত হলেন না। এমনকি, লন্ডনযাত্রার পূর্বে তিনি মাত্র একবার জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি করাচি প্রত্যাবর্তন করলেন। জিন্নাহ্ সাহেবের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেলেন তিনি। যাঁর জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ লোক অনুগামী ছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন নিঃসঙ্গ, একথা আত্মবিরোধী অথচ সত্য। জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে পাকিস্তানের 'বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়ের' অবসান হল। পাকিস্তানলাভের পর জিন্নাহ্

www.nagorikpathagar.org

সাহেব এক বছরের কিছু বেশি দিন জীবিত ছিলেন এবং যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখনও পাকিস্তানের অধিবাসীরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিল।

স্বাধীনতার পরও দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে আসছিল। বিশেষত উত্তর-ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানে তার ভয়াবহ প্রচণ্ডতার দরুন হাজার হাজার নরনারী নিহত হল, আর ধর্মের নামে লুণ্ঠিত ও ধর্ষিত হল সহস্র সহস্র নারী।

উত্তর-ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তরেখা অতিক্রম করতে লাগল লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মুহাজির। নির্ভর করার মতো কিছুই ছিল না তাদের। যে ভীষণ সমস্যার সমাধান করা কোনো সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেও ছিল অসম্ভব, শুধুমাত্র রাষ্ট্র পদবাচ্য নবরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে তা স্পষ্টতই ক্ষমতার অতীত ছিল। গান্ধীজী এবং সোহ্‌রাওয়ার্দীর যৌথ প্রচেষ্টা পূর্বাঞ্চলকে এজাতীয় বর্বরতার হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা করল। পূর্ব সীমান্ত দিয়েও মুহাজিরদের আনাগোনা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। প্রকৃত প্রস্তাবে, পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী সীমানা অতিক্রম করে যেসব মুহাজির গমনাগমন করছিল, তারা নিজেরা উভয় দেশের পরিস্থিতিকে জটিল করে না তুললে উভয় রাষ্ট্রের শাসকদের পক্ষে তাদের পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, উভয় সম্প্রদায়ই কিছু-না-কিছু অত্যাচার করেছে। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রচুর কাল্পনিক কাহিনী উভয় সম্প্রদায় আর তাদের শাসকসম্প্রদায়ের কাছে পেশ করা হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, স্বজাতি ও শাসকদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করা, যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি জবরদস্তি করে দখল করে নেওয়াকে তাঁরা মন্দ কাজ বলে বিবেচনা না করেন।

পূর্ববঙ্গের সমস্যাগুলি ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ১৯৩০ সালে ইকবাল পাকিস্তানের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা হল উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ অঞ্চলের। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্ব অংশে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালের রক্তবন্যা থেকে যে পাকিস্তানের অভ্যুদয় হল, তা একটি ভৌগোলিক অসামঞ্জস্য। সমগ্র পাকিস্তানের এক-ষষ্ঠাংশ পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন জনই এই প্রদেশে বাস করে। উভয় প্রদেশে গাছপালা, জীবজন্তু এবং জলবায়ুর মধ্যে সাদৃশের যেমন অভাব, তেমনি অভাব দুই প্রদেশের অধিবাসীদের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর অর্তনৈতিক স্বার্থের। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় পাট। এর উপরই পাকিস্তানের রাফতানি কারবার অর্ধেকেরও বেশি নির্ভরশীল। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের অবস্থা যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন পূর্ব পাকিস্তানের এই পাটই তাকে রক্ষা করেছিল। কোরিয়ার যুদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। পাট রফতানি ব্যবসা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান অবিশ্বাস্য রকমের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করল, যার দরুন সম্ভব হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুত শিল্পায়ন, তথা মুহাজিরদের কর্মসংস্থান। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় পাট রফতানি পাকিস্তানের একচেটিয়া না হলে সরকারি শাসনতন্ত্র ঠিকভাবে চলত কি না— সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল ৬৯ জন সভ্য নিয়ে। কিন্তু যেহেতু উত্তর-ভারত থেকে ৮০ লক্ষ মুহাজিরের পশ্চিম পাকিস্তানে আগমন হল এবং যেহেতু এই প্রদেশের সঙ্গে বাহাওয়ালপুর, বেলুচিস্তান এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যও যুক্ত হল, সেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানকে আরও দশটি আসন দান করতে হল এবং মোট সভ্যসংখ্যা তখন দাঁড়াল ৭৯ জনে। এই মোট সভ্যসংখ্যার ৪৪টি আসন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ; অতএব গণপরিষদে ঐ প্রদেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। লিয়াকত আালী খানের অনুরোধে নাজিমুদ্দিন এবং তাঁর সহকর্মীরা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের জন্য আরও প্রায় ছ'টি আসন ত্যাগ করলেন, যার দরুন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হলেন। পাকিস্তানের স্বার্থে এবং 'ইসলামী ভ্রাতৃত্বের খাতিরে' নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে কোনোরূপ পরামর্শ না করেই এই ত্যাগ স্বীকার করলেন। অবশ্য এজন্য তিনি অবিলম্বে পুরস্কৃত হলেন। জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন।

স্বাধীনতার পর সম্পদ এবং দায় বিভাগ যখন করা হল, তখন পূর্ব পাকিস্তান অন্য আর এক অভিজ্ঞতা লাভ করল। সাবেক বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি পূর্ব পাকিস্তানে পড়ায় স্বাভাবতই আশা করা গিয়েছিল, দুই-তৃতীয়াশ পরিমাণ সম্পত্তিও তার ভাগে পড়বে। বিভাগপূর্ব বাংলার এক-তৃতীয়াংশ হলেও পশ্চিম বাংলা অনেক বেশি পরিমাণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কলকাতা পড়ল তাদের অংশে। পুর্ব পাকিস্তানকে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেবার কথা কাগজে-কলমে থাকলেও তার সমস্তটার জন্যই পাল্টা দাবি করা হল। কারণ, সীমান্তবর্তী ভারতীয় অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষত সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব অনেক বেশি উন্নত ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের হালচাল সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার দরুন ক্রমশ সেখানকার খাদ্য-পরিস্থিতির অবনতি ঘটল। ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা না করে উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিতে 'কর্ডন' প্রথা প্রবর্তন করা হল। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সমস্যাটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, সেজন্য ১৯৪৭ সালে এ বিষয়ে এক আন্দোলন শুরু করা হয়।

বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে বিভক্ত হবার পূর্বেই মুসলিম লীগের বামপন্থী দলটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ ত্যাগ করে 'পূর্ব পাকিস্তান গণ আজাদী লীগ' সৃষ্টি করেছিল। তাদের ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচি ছিল এবং তাতে আর্থিক সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। 'আজাদী লীগ' সৃষ্টি করার অব্যবহিত পরেই পূর্ববাংলার যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এবং সেখানে স্থাপিত হল 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। সরকার এই যুবলীগকে কমিউনিস্ট-সমর্থিত প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এর নেতাদের গ্রেপ্তার করতে লাগলেন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটল। ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট কতিপয় যুবক 'তমদ্দুন মজলিশ' আখ্যা দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল। আদৌ বামপন্থী না হয়েও ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের প্রত্যেকটি আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা দেশের গণশক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন। বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে এবং সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতিদানের

www.nagorikpathagar.org

জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন হয়, তমদ্দুন মজলিশই ছিল তার উদ্যোক্তা। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলন যখন সংগ্রামের রূপ নিল, তখনও তাকে সমর্থন করতে থাকল তমদ্দুন মজলিশ।

ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চলছিল। কিন্তু তা সরকারের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁদের দ্বারা হয়নি ; এর জন্য দায়ী ছিল নিম্নপদস্থ কর্মচারী আর উদ্বাস্তুরা ; এই কারণেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশমিত হচ্ছিল না। ভারতে পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি ঘটল। সেখানকার চরমপন্থী হিন্দুরা সংযতস্বভাব সমস্ত হিন্দু নেতাদের হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। কারণ, শেষোক্তগোষ্ঠী ভারতে মুসলিম গণ-নিধনের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গান্ধীজী দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে তাঁর শান্তি প্রচারের কাজ আরম্ভ করলেন। চরমপন্থী হিন্দুরা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। এমনকি, কংগ্রেসের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলসহ মন্ত্রিসভার কতিপয় সদস্যও গান্ধীজীর সদিচ্ছা ও সাধু চেষ্টার বিরোধিতা করতে লাগলেন। যখন তিনি ভারত সরকারকে চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের প্রাপ্য সম্পত্তি প্রদানের কথা বললেন এবং কাশ্মীর ও অন্যান্য অমীমাংসিত বিরোধের দরুন যা থেকে পাকিস্তানকে তখন পর্যন্ত বঞ্চিত রাখা হয়েছিল, তা তাকে ফিরিয়ে দিতে বললেন, তখন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। ১৯৪৮-এর ১লা জানুয়ারি থেকে সরকারকে তাঁর দাবিপূরণে বাধ্য করার জন্য তিনি আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করলেন। চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পাকিস্তানকে প্রদান করা হলে এবং হিন্দু উদ্বাস্তুগণ কর্তৃক মসজিদগুলির দখল ত্যাগ করার শর্তে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর তিনি তাঁর অনশনের অষ্টাদশ দিবসে উপবাস ভঙ্গ করলেন।

১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারি ঘটনা চরমে পৌঁছাল। সেদিন প্রার্থনাসভায় যাবার পথে নাথুরাম গড্‌সের গুলির আঘাতে মহাত্মা গান্ধীর মহান কর্মযাত্রার চিরঅবসান হল। গান্ধীজীকে পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি নিজেও তাঁর বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বিপদকে আলিঙ্গনের জন্য ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। ভারতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, গ্রেপ্তার করা হল বহু চরমপন্থী হিন্দু নেতাকে, আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। তাদের বিচারের সময় রাজসাক্ষীর মুখে প্রকাশ পেল তারা গান্ধীজী, নেহরু ও সোহ্‌রাওয়ার্দীকে হত্যা করবে বলে ঠিক করেছিল। এই সংবাদে সোহ্‌রাওয়ার্দী গান্ধীজীর অসমাপ্ত কাজ করে যেতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি উভয় বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তুলতে কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। কলকাতা ও ঢাকা উভয় স্থানেই ধর্মান্ধদের দ্বারা বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েও তিনি দৈবানুগ্রহে রক্ষা পেয়ে গেলেন। একবার মানিকগঞ্জ শহরে এক জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য সেখানকার সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের নেতারা এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলমানেরা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে অনুরোধ করলেন। সেখানে যাওয়ার পথে কলকাতা থেকে তিনি ঢাকায় আসেন, কিন্তু সন্ধ্যা ৭টার সময় মানিকগঞ্জগামী স্টীমারে আরোহণ করে অবগত হলেন যে, ঢাকা শহর পুলিশপ্রধান ইতিপূর্বে উক্ত স্টীমারের

www.nagorikpathagar.org

সারেংকে তাঁর বিনানুমতিতে স্টীমার না ছাড়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। রাত দশটা পর্যন্ত আদেশের জন্য বৃথা অপেক্ষা করার পর জিপগাড়ি করে জাহাজঘাটে উপস্থিত হলেন পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল জাকির হোসেন ; জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ্ এবং ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল জাকির হোসেন ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রহমতুল্লাহ্ এবং ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল ওবায়দুল্লাহ্। সম্মুখের ডেকে উপবিষ্ট সোহ্‌রাওয়ার্দীর সম্মুখে অফিসার এর উপস্থিত হবার পর ওবায়দুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দীর হাতে সরকারি আদেশনামা দিলেন। আদেশনামায় তাঁর মানিকগঞ্জ যাওয়া এবং সেখানকার জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁকে আরও নির্দেশ দেওয়া হল, পরদিনই ঢাকা পরিত্যাগ করার জন্য এবং পাকিস্তানের নাগরিক অধিকার লাভ না করা পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে আসা নিষেধ করে দেওয়া হল। উক্ত ঘটনার কয়েকমাস পর বিশেষভাবে প্রণীত এক আইনের সাহায্যে পাকিস্তান গণপরিষদে তাঁর সভ্যপদ খারিজ করে দেওয়া হল। পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের ক্রমশ মোহমুক্তি হতে থাকল। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আবাঙালিদের মনোভাবই এজাতীয় হাতাশার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিল।

বাঙালিদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য তারা আন্দোলন শুরু করল। পূর্ব পাকিস্তান গণ আজাদী লীগ বাংলার জন্য দাবি করল রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা। ব্যক্তিত্বহীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেন না। সবসময়েই লোকে তাঁকে ভীরু ও দুর্বলচিত্ত বলে জানত এবং লোকের ধারণা ছিল, তিনি তাঁর অনুজ খাজা শাহবুদ্দিনের বুদ্ধিতে পরিচালিত হতেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শাহাবুদ্দিন সাহেব করাচিকেই তাঁর কর্মস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। চক্রান্তে সিদ্ধহস্ত হওয়ায় ঘটনাচক্র পরিচালনায় এবং রাজনীতির গতি নির্ধারণে তিনি সকল নেতাকে অতিক্রম করেছিলেন্। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের নির্বাচনে বামপন্থীদের হাতে পর্যুদস্ত হবার পর থেকে তিনি বাংলার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। অতএব এখন একা নাজিমুদ্দিনকে সমস্যার মুকাবিলা করতে হল। মূলত সরকারি দফতরের অবাঙালি সেক্রেটারিরাই এই সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। ভাষা আন্দোলন শুরু হবার মাত্র কয়েকমাস পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরার পাকিস্তানে যোগ দেবার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সেখানকার রাজমাতা স্যার নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু স্যার নাজিমুদ্দিন তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ কথাবার্তা বলতে অস্বীকার করেন।

১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাকে সরকারি ভাষায় উন্নীত করার গতিবেগ বর্ধিত হল। মার্চের প্রথম সপ্তাহে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল, তা বাংলা ভাষার দাবিকে দিল আরও সুস্পষ্ট রূপ। বাংলাকে গ্রহণ করতে হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে, এই হল তাদের বক্তব্য। ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট আর বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে বের হয়ে এসে বড় বড় মিছিল বের করল ঢাকার রাস্তাগুলিতে। পুলিশ বলপ্রয়োগ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার চেষ্টা করল। শত শত ছাত্র গ্রেফতার হল। ১২ তারিখের বিক্ষোভ প্রদর্শন আরও অধিক তীব্র আকার ধরণ করল এবং ১৪

www.nagorikpathagar.org

তারিখে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা প্রদেশে। স্যার নাজিমুদ্দিন ভীত হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে ১৯শে মার্চ জিন্নাহ্ সাহেবের ঢাকা আগমন এই ভীতির একটা বিশেষ কারণ ছিল। স্বাধীনতালাভের পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষবারের মতো ঢাকা আগমন। নাজিমুদ্দিন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের কাছে আপোসের জন্য কথাবার্তা বলতে পাঠালেন। সংগ্রাম পরিষদ ফজলুল হক মুসলিম ছাত্রাবাসে তাদের দাবি প্রণয়নের জন্য মিলিত হল।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায় ছিল আলাপ-আলোচনার সময় চীফ সেক্রেটারি উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু তিনি তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী সবগুলি দাবিই মেনে নিলেন এবং পরদিন ১১টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি এবং সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক চুক্তিনামায় স্বাক্ষরদান করলেন। অতঃপর ঢাকা জেলে অবরুদ্ধ নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্য আহ্বায়ককে অনুমতি দেওয়া হল। বাংলাকে সরকারি ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করলেন নাজিমুদ্দিন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ১৫ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বেই কারার অন্তরালে অবরুদ্ধ সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল এবং সংবাদপত্রগুলির উপর থেকে প্রত্যাহার করা হল সমস্ত নিষেধাজ্ঞা। জীবনযাত্রা ফিরে আসতে লাগল স্বভাবিকভাবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জিন্নাহ্ সাহেব সম্ভবত অবাঙালি সেক্রেটারিদের পরামর্শমতো চুক্তির শর্তগুলিকে অস্বীকার করে বসলেন এবং ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানের জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এতে একদল লোক সে সভা থেকে প্রতিবাদ করে বের হয়ে গেল। বাঙালি মানসে এত বড় আঘাত লাগল আর ছাত্ররা এত ক্রুদ্ধ হল যে, তারা সমস্ত শিক্ষায়তন থেকে তাঁর ছবি অপসারণ করল। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জিন্নাহ্ সাহেবকে জোর গলায় জানিয়ে দিল—ভাষা সম্পর্কে যদি তাঁর মত পরিবর্তন না হয়, তা হলে তারা তাঁকে তাদের সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করতে অস্বীকার করবে। জিন্নাহ্ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় পুনরায় উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই পূর্ব উক্তি, আর সঙ্গে সঙ্গে সভায় শুরু হল এক ভীষণ গোলযোগ। ফলে, বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই তিনি সভাকক্ষ থেকে চলে গেলেন।

জিন্নাহ্ সাহেব তাঁর জীবনে এই প্রথমবার এত অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। সংগ্রাম পরিষদের সভ্যদের সঙ্গে ২১ তারিখ বিকেলে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হবেন বলে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আলোচনার প্রারম্ভেই জিন্নাহ্ সাহেব বললেন যে, স্যার নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের যে চুক্তি হয়েছিল, সরকার তা মানতে রাজি নয় ; কারণ উক্ত চুক্তিতে জবরদস্তির মাধ্যমে তাঁর স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে। যখন তাঁকে বলা হল, উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তখন তিনি উত্তর করলেন—এজন্য বিক্ষোভকারীদের তরফ থেকে আইন পরিষদের সদস্যদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। তিনি যুক্তি প্রদর্শন

www.nagorikpathagar.org

করলেন, যদি সমগ্র দেশে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা না থাকে, তা হলে কোনো স্থায়ী সরকার সম্ভব হবে না। এক ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব হবে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে একতা আনয়ন। তিনি আরও প্রতিপন্ন করতে চাইলেন, উর্দুকেই গ্রহণ করা সমীচীন হবে ; কারণ উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা নয়। সুতরাং এই কারণেই পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির অধিবাসীর মধ্যে কোনো বিদ্বেষ থাকবে না। তিনি প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমেরিকার অধিবাসীরা মূলত ভিন্ন ভিন্ন দেশাগত হলেও ইংরেজি সেখানকার একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়েছে।

জিন্নাহ্ সাহেবের যুক্তির উপরে সংগ্রাম পরিষদের সভ্যরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ যেখানে গণপরিষদের করার কথা, সেখানে তাঁর এ প্রাকার ঘোষণা কি গণতন্ত্রবিরোধী হচ্ছে না ? সভ্যরা তাঁকে জানিয়ে দিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে পারেন বা নেতা হিসাবে দেশকে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করার কোনো আইনগত ক্ষমতা তাঁর একার নেই। তাঁরা আরও বললেন, সোভিয়েত রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকা সত্ত্বেও সেখানে স্থায়ী সরকার বিদ্যমান। একথা মিথ্যা যে, একটি রাষ্ট্রভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ঐক্য আনা সম্ভব ; কারণ আমেরিকা এবং আয়ার্ল্যান্ড এক ভাষাভাষী আর এক ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেনের সঙ্গে একত্র থাকতে পারেনি। তর্ক প্রসঙ্গে সভ্যরা উল্লেখ করলেন, কোনো দেশের একতা বজায় থাকতে পারে তখনই, যখন সেখানে প্রবর্তন হবে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—যা এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাঁরা নিবেদন করলেন, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার জন্য দেশের বাইরে থেকে যদি কোন ভাষা আমদানি করতেই হয়, তা হলে সেটা ইংরেজি হবে না কেন? ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং এর সাহয্যে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়াও দেশের পক্ষে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আর কারিগরি জ্ঞানের সহিত অবহিত হওয়া সম্ভব হবে। বাংলা এবং উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে দেশের দুই অংশকে একত্র রাখার জন্য কেন্দ্রীয় দফতরের ভাষারূপে ইংরেজিকে গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। আর ভাষা সম্পর্কে যদি আমেরিকার উদাহরণ গ্রহণ করতেই হয়, তা হলে রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি একমাত্র বাংলারই। কারণ, পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন জনের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা, পাঞ্জাবি হচ্ছে শতকরা সাঁইত্রিশ জনের, আর অবশিষ্ট শতকরা সাতজনের ভাষা সিন্ধি, পশ্‌তু, উর্দু ও বেলুচি। জিন্নাহ্ সাহেব তর্ক বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর শেষ কথা হল—উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু ভারত গ্রহণ করেছে হিন্দিকে। এ বিষয়ে তিনি আর কোনো আলোচনা করতে চাইলেন না। ফলে, উভয় পক্ষের মধ্যে হল উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় এবং সম্পূর্ণ হট্টগোলের মধ্যে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এইভাবেই সমাপ্ত হল স্বাধীনতার পর জিন্নাহ্ সাহেবের পূর্ববঙ্গের শেষ এবং একমাত্র সফর। পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজ উপলব্ধি করল যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রীরূপে আরম্ভ হয়েছিল যাঁর জীবন, সারাজীবন ধরে যিনি বিশ্বাস করে এসেছিলেন ব্রিটিশের আদর্শে

www.nagorikpathagar.org

গঠিত ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত সরকারেই হবে দেশের মঙ্গল, তিনি হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলেন ইসলামের একজন বড় সমর্থক হিসাবে ; এর ফলে তিনি তাঁর উদারনৈতিক গণতন্ত্র আর ইসলামের ধারণার মধ্যে সমতারক্ষায় অসমর্থ হলেন। গণপরিষদের প্রথম সভাপতিরূপে তিনি তাঁর ভাষণে বললেন :

"আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রইল আপনাদের মন্দিরে যাবার, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রইল আপনাদের মসজিদে যাবার বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে-কোনো তীর্থক্ষেত্রে অথবা উপাসনাকেন্দ্রে যাবার আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রইল। আপনারা যে-কোনো ধর্ম, জাতি বা মতাবলম্বী হউন না কেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই...... এখন, আমি মনে করি আমাদের সম্মুখে রাখতে হবে এই আদর্শকে এবং কালক্রমে আপনারা দেখবেন, হিন্দু আর থাকবে না হিন্দু, মুসলিম আর রবে না মুসলিম—ধর্মীয় অর্থে নয় অবশ্য, কারণ তা হচ্ছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে।"

এই নীতি ঘোষণার ছ'মাসের মধ্যেই ইসলামী গণতন্ত্র আর ইসলামী সমাজবাদ জিন্নাহ্ সাহেবের বক্তৃতার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

জিন্নাহ্ সাহেব অসুস্থ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। জিন্নাহ্ সাহেবের আধিপত্যে অসহিষ্ণু লিয়াকত আলী খান স্থির করলেন দুর্বল এবং সহজে নমনীয় কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচিত করতে হবে। সে পদের জন্য সহজেই নির্বাচিত হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। অতঃপর পৃকতপক্ষে রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি নীতি-নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মন্ত্রিপরিষদ। এ ব্যবস্থা যথাসঙ্গত হলেও দুর্ভাগ্যবশত প্রধানমন্ত্রী আমলাতন্ত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেন না। মন্ত্রিসভায় প্রাধান্য বিস্তার উপলক্ষে পাঞ্জাবি আর বাঙালি মন্ত্রীদের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকল। কদাচিৎ গোলাম মোহাম্মদ ও ফজলুর রহমানকে কোনো ব্যাপারে একমত হতে দেখা যেত। মন্ত্রিপরিষদ গঠনতন্ত্রের মৌলিক নীতিসংক্রান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোনো ফরমুলা আদায় করতে অক্ষম হলেন। সময়-সময় ভোটের মাধ্যমে তিনি মন্ত্রীদের সম্মতি নিতেন। অযৌক্তিক হলেও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এর বেশি আশা করা যাচ্ছিল না।

মুহাজিরদের পুনর্বাসন, কাশ্মীর, খালের পানি, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, সংখ্যালঘুদের সমস্যা এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ইত্যাদি ছিল এমন সব সমস্যা, যা প্রধানমন্ত্রীর আশু মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। প্রথম চারটি মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যা ছিল, যার সমাধান তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় একরূপ হয়নি বললেই চলে। তিনি মূল নীতি নির্ধারণ সাব-কমিটির রির্পোট গণপরিষদে পেশ করলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তার খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। রির্পোটের সুপারিশসমূহের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য অবিলম্বে গঠিত হল এক সংগ্রাম পরিষদ। এর আহ্বায়ক সমস্ত জেলা ও মহকুমা-শহরগুলিতে পরিভ্রমণ করে সেসব জায়গায় পরিষদের শাখা স্থাপন করলেন। সংগ্রাম পরিষদ পরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমিতিরূপে (Central Committee for

www.nagorikpathagar.org

Democratic Federation) পরিচিত হল।

দিন দিন বিক্ষোভ তীব্রতর হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হল এক মহা জাতীয় সম্মেলন। সেখানে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এক বিকল্প প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের দাবিগুলিকে সুস্পষ্ট রূপ দেওয়া হল। সম্মেলনে গৃহীত বিকল্প প্রস্তাবগুলি স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকের গণ-আন্দোলনগুলির আদর্শস্বরূপ হয়ে রইল। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হয়ে থাকতে অস্বীকার করল। পরিস্থিতি সঙ্কটময় হয়ে উঠছিল বিধায় লিয়াকত আলী খান নিজে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনোভাব যাচাই করতে পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলেন। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করলেন, যে গঠনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবার ব্যবস্থা থাকবে না, তিনি যেন তা পাশ করাবার জন্য চেষ্টা না করেন। প্রতিনিধিদল জানালেন, তাঁদের মূল দাবি শুধু একটি প্রদেশ হিসেবে নয়, পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দিতে হবে। যেহেতু এখানে পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশ বাস করে, সেহেতু এজাতীয় স্বীকৃতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সুফলপ্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে। পূর্ববাংলা তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চায়, সেইসঙ্গে চায় পশ্চিম পাকিস্তান ও তার নিজের মধ্যে একই মুদ্রানীতি, বাণিজ্য ও শুল্কব্যবস্থা বর্তমান থাকুক। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এর অর্থ হবে—পূর্ব পাকিস্তানে তা হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুর মতো পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাও স্বীকৃতি পাবে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক জীবনে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির বিষয়ে পাকিস্তানের অংশ দু'টি স্বচ্ছন্দে ও সমপর্যায়ে পরস্পরের সহযোগিতা করতে পারবে। পূর্ব পাকিস্তান যখন লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র দাবি করল তার অর্থ হল, পূর্ব পাকিস্তান যখন লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র দাবি করল তার অর্থ হল, পূর্ব পাকিস্তানীরা যে সরকার নির্বাচন করবে, তারা তাদের বিবেচনানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং ঐসব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হবে। তারা চাইল, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিজেদের সঙ্গতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ; তারা দাবি করল, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, যার দ্বারা বৈদেশিক, আন্তঃপ্রাদেশিক আর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অধিগত করার ক্ষমতালাভ সম্ভব হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে দেশের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান পক্ষপাতী ছিল; কিন্তু শর্ত হল—তা পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে কার্যকর হতে হবে।

এসব যুক্তি লিয়াকত আলী খানের বোধগম্য না হলেও তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পারলেন, গণপরিষদে তিনি যে রির্পোট পেশ করেছিলেন—তা এখন মুলতবি রাখতে হবে। পাকিস্তানের সমগ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এতদিনে কেন্দ্রীয় শাসনপন্থী ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনপন্থী—এই দুই দলের বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিত্তশালী শিল্পপতিরা, প্রথম গণপরিষদের অধিকাংশ সভ্যরা, আমলা আর জমিদার শ্রেণী, অর্থাৎ দেশের যাঁরা

www.nagorikpathagar.org

শোষকগোষ্ঠী তাঁরা চাইলেন কেন্দ্রীভূত একটি শাসনব্যবস্থা। কৃষক আর শোষিত জনসাধারণের আস্থা হল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায়। করাচি আর পাঞ্জাব দাঁড়াল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয়করণের পক্ষে ; কিন্তু পূর্ববাংলা, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্তান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এই সঙ্কট থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকলেন।

একথা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য যে, সাম্প্রতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রায় সকল দেশে ক্ষমতার গতি কেন্দ্রাভিমুখী। এমনকি, ঔপনিবেশিকতার খোলসমুক্ত যেসব রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) উপাদান ছিল, কাগজে-কলমে না হলেও কার্যত তারা সেসব বর্জন করে চলেছে দ্রুতগতিতে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি আর রাজনৈতিক স্থায়িত্ব উভয়ের খাতিরেই প্রয়োজন জাতীয় সরকারের পক্ষে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার।

নূরুল আমিন, যিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না বা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনুমোদন করলেন না। এজন্য তিনি কতখানি দায়ী বা এতে চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহ্‌মদের কতখানি হাত ছিল, তা সঠিক জানা না গেলেও সুস্পষ্টভাবেই বোঝা গেল যে নূরুল আমিন তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি। ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে প্রথম উপনির্বাচন হল। তাতে জনৈক অল্পবয়স্ক কর্মী শামসুল হকের নিকট সর্বশক্তিমান মুসলিম লীগের প্রার্থী খুর্‌রম খান পন্নী পরাজিত হলেন। এই উপনির্বাচন মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলাতেই অনুষ্ঠিত হল। এই পরাজয়ে নূরুল আমিন সরকার এতদূর আত্মবিশ্বাসহীন আর ভীত হয়ে পড়ল যে, এর পর থেকে তাদের আর কোথাও উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সাহস হল না। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিপর্যস্ত হল। উপনির্বাচান না হওয়ার দরুন চৌত্রিশটি আসন শূন্য থেকে গেল। সাধারণ নির্বাচন হবার কথা ছিল ১৯৫১ সালে, কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সৃষ্ট এক আইনের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে তাকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হল এবং ১৯৫২ সালেও নূরুল আমিন গণপরিষদের সহায়তায় ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন পুনরায় মুলতুবি রাখলেন। সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কয়েক সহস্র রাজনৈতিক কর্মী আর ছাত্রদের নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ করা হল।

১৯৪৯-এর মার্চ মাসে সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানে বাস করার জন্য করাচি এলেন। মুসলিম লীগ সরকার একটি ফ্যাসিবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি স্থির করলেন, একটি বিরোধীদল খাড়া করতে হবে। কিন্তু লিয়াকত আলী খান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানে কোনো প্রতিপক্ষকে বরদাস্ত করতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী স্থির করলেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর ফ্যাসিস্ট মতবাদের মোকাবেলা করবেন।

আজীবন উদারনৈতিক গণতন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী সংকল্প করলেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদল গঠন করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি আইনসঙ্গত উপায়ে লড়াই করবেন। 'জবরদস্তি নয় স্বাধীন ইচ্ছাই হচ্ছে শাসনতন্ত্রের প্রকৃত বুনিয়াদ'—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

www.nagorikpathagar.org

জবরদস্তির বদলে স্বাধীন ইচ্ছাকে যেন অধিকতর আমল দেওয়া হয়, সেজন্য তিনি দাবি করলেন বাক্‌স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। কারণ, বাক্‌স্বাধীনতা পেলে জনসাধারণ বর্তমান সরকারের কাজ ও নীতির সমালোচনা করতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তারা যেন বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনেরও প্রস্তাব করতে পারে। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল, সংঘবদ্ধ হবার অধিকার নাগরিকদের থাকা উচিত, যাতে জনসাধারণ রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হতে পারে, যার মাধ্যমে তারা পরিবর্তিত আকারে সরকার গঠনের জন্যও সুপারিশ করতে পারে। জনসাধারণ যাতে নিজ পছন্দানুযায়ী সরকার গঠন করতে পারে, সেজন্য যথাসময় অবাধ সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

১৯৪৯ সালে বিরোধীদল খাড়া করার পূর্বে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ঢাকায় তশরিফ আনলেন মিয়া ইফ্‌তিখারউদ্দিন, মানকী শরীফের পীর সাহেব এবং মৌলানা ভাসানী। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ আর আসামের পূর্বতন মুসলিম লীগের সভাপতি। ঠিক হল, নতুন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সংগঠক চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে তাঁরা মুসলিম লীগকে একটি উদার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করবেন। কিন্তু যদি এ প্রস্তাব তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তা হলে তাঁরা নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করবেন।

১৯৪৯ সালে সোহ্‌রাওয়াদী তাঁর পূর্ববঙ্গীয় পুরাতন কর্মীদের একত্র করলেন। তারপর স্থির করলেন, স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দল দঠন করবেন। মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পাকাপাকিভাবে আসাম ত্যাগ করে ঢাকা আগমন করার পর তিনি এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী যে রাজনৈতিক দলটি গঠন করলেন, শেষ পর্যন্ত তা 'আওয়ামী লীগ' নামে পরিচিত হল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তৎক্ষণাৎ সোহ্‌রাওার্দীকে ভারতের দালাল বলে আখ্যায়িত করলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নবগঠিত দলের সভাগুলিতে গোলযোগ সৃষ্টি এবং তাঁর কর্মীদের উপর হামলা ও নির্যাতন করার জন্য সমাজের বিপজ্জনক ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের উৎসাহিত করা হল। মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা হল বিরোধীদলীয় সমর্থকদের। বিনা বিচারে তাদের অনেককে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হল।

পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ সরকার-বিরোধী দলের কর্মীদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করায় নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীরা দূরেই রয়ে গেলেন। নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে আওয়ামী লীগ একটি প্রতিবাদকারী দলে পরিণত হল। জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় হবে যে দল, তা স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর-বিরোধী মতাবলম্বীদের নিয়েই গঠিত হয় এবং সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মনোভাবকে একই পথে চালনা করে। তিক্ততা, ক্ষোভ আর বিরোধিতা প্রকাশের মুখপাত্র তাকে হতেই হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য বর্জন না করে অন্য কিছু হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আওয়ামী লীগের ঘাঁটি পূর্ব পাকিস্তানে হবার দরুন পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

লীগের তুলনায় তা বেশি আঞ্চলিক ভাবাপন্ন হল। যে স্থলে মুসলিম লীগের সমর্থক হল শিল্পপতিরা, ভূস্বামীরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকপালরা আর ক্ষমতাসীন সরকার, যেখানে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সমর্থনের উৎস হল বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যদিও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ছিল—তার সংগ্রাম হবে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব আর কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা ক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করল। নিজেদের স্বার্থ কায়েম করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি যে-কোনো প্রগতিশীল আন্দোলনকে হিন্দু বা কমিউনিস্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত অথবা প্রাদেশিকতা বলে অভিহিত করতে থাকল। এসময়ে এজাতীয় চক্রান্ত অবিরাম চলতে থাকল, কিন্তু তার দ্বারা সাধারণ লোকের রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হল না। ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠল আওয়ামী লীগ. আর সেই তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা খর্ব হতে লাগল। সোহ্‌রাওয়াদী আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের সার্বজনীন দলে উন্নীত করতে অসমর্থ হলেন ; কারণ, প্রথমত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি সর্বপ্রকার গণআন্দোলনে সন্দিহান জমিদার, শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা-পূর্বযুগে ঐ অঞ্চলে সোহ্‌রাওয়ার্দীর কোনোরূপ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ না থাকায় সেখানে এমন কোনো কেন্দ্র ছিল না যেখান থেকে তিনি নতুন করে কাজ আরম্ভ করতে পারেন। তৃতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতার ধারণা ছিল, গণতন্ত্রের দিকে যে-কোনো প্রকার পদক্ষেপ হবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূল ; কারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার দরুন সেখানকার অধিবাসীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত প্রাধান্য লাভ করবে। গঠনতন্ত্র প্রণয়ন বা দেশে সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা কেন উৎসাহী ছিলেন না—এ হল তার প্রধান কারণ।

এই সময়ে ছাত্রবিক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছাত্রবিক্ষোভের উর্বর ক্ষেত্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গঠিত হয়েছিল। বেতনবৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন করল। তারা দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে তাদের ক্রিয়াকলাপের দরুন প্রাদেশিক সরকার একদল ছাত্রকে করারুদ্ধ করলেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষরা ছাত্রদের বহিষ্কার করতে লাগলেন। এর ফলে গঠিত হল পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে এই দল আধিপত্য বিস্তার করল এবং সে-বৎসর ভাষা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন এই দলের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা। কেন্দ্রীয় সরকার একবার চেষ্টা করল বাংলা ভাষার উর্দুলিপি প্রবর্তনের, কিন্তু পূর্ববাংলার বীর ছাত্র যুবসমাজ সেই প্রচেষ্টাকে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করল।

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ প্রতিফলিত হয়েছে। পাকিস্তান অর্জনের সময় মুসলিম লীগের নেতারা ছাত্রবিক্ষোভকে কেবল বরদাস্তই করেননি, সরকার ও শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে উৎসাহিতও করেছেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সেই নেতারাই আবার ছাত্রদের নিকট

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষালয়ে ফিরে যাবার জন্য আবেদন করলেন, কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বিদ্রোহী ভাব প্রশমিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। রাস্তার বেকার ছেলেদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ল। পুলিশ প্রহৃত হল কয়েকবার— রাস্তার যানবাহন উল্টে ফেলে সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হল, অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বেকার আর গুণ্ডাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, ছাত্রদের মধ্যে তা সংক্রমিত হল না। পশ্চিম পাকিস্তানে এজাতীয় কোনো সমস্যা ছিল না বললেই হয় ; কারণ, স্বাধীনতার জন্য সেখানে কোনো গণআন্দোলন হয়নি এবং স্বাধীনতার ঠিক পর সেখানে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে, তার সাহায্যে কোনোরূপ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

স্বাধীনতালাভের পর সরকারি নীতিকে প্রভাবান্বিত করার জন্য সাধু প্রচেষ্টা পূর্ববাংলায় সবসময়েই ব্যর্থ হয়েছে। কেবলমাত্র যখন গণআন্দোলনের দরুন দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিপদাপন্ন হত, তখনই সরকার কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজি হত। আইনসভায় মুসলীম লীগ দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য ছিল ; সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে গড়িমসির দরুন বিরোধীদলের সম্মুখে তাঁদের বর্তমান উদ্দেশ্যসাধন আর সেইসঙ্গে সরকারের সুনাম নষ্ট করার জন্য একমাত্র যে পথটি উন্মুক্ত ছিল, তা হল রাস্তায় রাস্তায় হৈচৈ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা। এ কাজের জন্য রাজনীতিকরা কিছুসংখ্যক ছাত্রদেরও ব্যবহার করেছেন।

এ সমস্ত গোলযোগ সত্ত্বেও লিয়াকত আলী খানের সময়ে দেশের সার্বিক অবস্থা সুসঙ্গটিত হয়ে উঠছিল। বিশেষ করে কোরিয়ার যুদ্ধের দরুন অভাবিতপূর্ব আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সচ্ছল হল। প্রস্তুত হল সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য কলকারখানা, সেচব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য আরম্ভ হয়ে গেল প্রাথমিক কাজকর্ম। একশ' ত্রিশটি চা-বাগান ছাড়াও প্রায় এক ডজন কাপড়ের কল ও অন্যান্য কারখানা আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান ছিল। করাচি এবং তার শহরতলিতে যেসব উদ্বাস্তু গিয়ে ভিড় করেছিল, তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্থির করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প ও কারখানা স্থাপন করতে হবে। তিনি পাটকলগুলি পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হওয়া দরকার বলে মনে করলেন। কারণ, কেবলমাত্র এখানেই পাট জন্মে এবং এখানে জনসংখ্যার গরিষ্ঠতার দরুন মজুর অপেক্ষাকৃত সস্তা ছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে অবিলম্বে কোনো আশঙ্কা ছিল না ; কারণ, নারায়ণগঞ্জের কাপড়ের কলগুলিতে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকায় পাটকলগুলিতে সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব ছিল। শিল্পায়ন বৃদ্ধি পেতে লাগল আর সরকার পুঁজিবাদকে পুষ্ট হতে উৎসাহিত করল। কারণ, সরকার পুঁজিবাদের মধ্যে দেখতে পেল রাজস্বের এক আকর্ষণীয় উৎসস্থল, জাতীয় সম্পদ আর মর্যাদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা। শুধু পাকিস্তান নয়, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই একথা সত্য। এশিয়ার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের অভিমত হল—পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে গড়া কল্যাণরাষ্ট্রের

www.nagorikpathagar.org

কাঠামোর ভিত্তিতে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি উপকৃত হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানে দীর্ঘদিন যাবৎ শান্তি বিরাজমান থাকার পর ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি হল। কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে মুসলিমনিধনের ফলস্বরূপ ঢাকা শহরে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াশীল মহল যে অজুহাতে এই দাঙ্গা সমর্থন করল, তা হল এখানে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে ভারতের হিন্দুরা মুসলিমনিধন বন্ধ করবে না। একই অজুহাত প্রদর্শন করল মুসলিমনিধনকারী ভারতের হিন্দুসমাজের লোকেরা। এতে উভয় দেশের সুস্থবুদ্ধি ও বামপন্থী ব্যক্তিরা ব্যথিত হলেন, কিন্তু ক্ষমতাহীন বিধায় এই উন্মত্ততা রোধ করতে তাঁরা অসমর্থ হলেন। উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অবাঞ্ছিত প্রকৃতির লোকেরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য একাজ করেছে। দাঙ্গায় যারা প্রাণ হারিয়েছে বা বিতাড়িত হয়েছে, এসব লোকেরা তাদের ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে, আর লুণ্ঠন করেছে তাদের সম্পত্তি। দাঙ্গার অব্যবহিত পরে লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আগমন করে এখানকার নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য সমাধান বের করতেই হবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে কূটনীতিক দপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য দিল্লিতে গমন করলেন। সময়োচিত তৎপরতার সঙ্গে উভয়ে একমত হয়ে স্বাক্ষর করলেন 'লিয়াকত-নেহরু প্যাক্ট'। বিরাট কৃতিত্বের পরিচায়ক হলেও এ চুক্তি ব্যর্থ হল ; কারণ উভয় দেশের সরকারি কর্মচারীরা, যাদের উপর এর বাস্তবায়ন ন্যস্ত হল, রাজনীতিকদের অনুরূপ তাদের মধ্যে মানবতাবোধ না থাকায় তারা এর অন্তর্নিহিত ভাবকে বুঝতে অসমর্থ হল এবং আইনগত দিক থেকে যেটুকু করা প্রয়োজন, তারা তার বেশি কিছু করল না। আমলাতন্ত্র মনে করল, এই চুক্তি কার্যকর করা যেতে পারে যদি অন্যপক্ষ চুক্তির শর্ত পালন করে। মানুষের দুঃখের চেয়ে বড় হল পারস্পরিক ব্যবহার। তবুও এই চুক্তির দ্বারা উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপকৃত হল।

১৯৫১ সালে কাশ্মীরসমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করল। তখন সেখানকার প্রধান-মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ্ কাশ্মীরের ভাগ্য-নির্ধারণের জন্য রাজ্যে একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বান করলেন। লিয়াকত আলী খান শেখ আব্দুল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, পাকিস্তান এজাতীয় কোনো কাজ বরদাস্ত করবে না। কিন্তু যখন কাশ্মীরে উক্ত গণপরিষদ গঠন করা হল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। উপযুক্ত দূরদৃষ্টির অভাবে তাঁকে কূটনৈতিক পরাজয় বরণ করতে হল। এই ঘটনার পর তিন বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। রাওয়ালপিণ্ডিতে জনৈক আততায়ারী গুলিতে তাঁর অকালমৃত্যু হল। একজন পুলিশের লোক সেখানেই সেই আততায়ীকে হত্যা করল, যদিও সেখান থেকে আততায়ীর পালিয়ে যাবার কোনো পথ ছিল না। লিয়াকত আলী খানকে যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রদায়গুলির সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি ঐ বিষয়ে কিছুটা সফলতা অর্জন করলেও তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরা সমস্যাটির গুরুত্বকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। ভারতে বাস করে পাঁচকোটি মুসলমান আর পূর্ব পাকিস্তানে এককোটি হিন্দু বাস করে। কাশ্মীরি মুসলমানদের অনুরূপ তারা স্থানবিশেষে কেন্দ্রীভূত নয় ; সীমান্তবর্তী এলাকাতেও তাদের বাস নয়, তারা সমগ্র ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে আছে। তাদের কোনোরূপ নিরাপত্তা নেই, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিরাজমান এই বিরাট জনসংখ্যার নিরাপত্তা বিধান করা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদিচ্ছার উপর। এটা ছিল একটা বিরাট সমস্যা এবং এমন প্রকৃতির যে, এর সমাধানও প্রায় অসম্ভব ছিল।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায় করা এখনও বাকি—একথা সত্য, কিন্তু তাদের জীবনের নিরাপত্তার আশু আশঙ্কা নেই। ভারতীয় এবং পাকিস্তানী নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাটির প্রকৃত চেহারা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছেন। উভয় দেশেরই কিছু লোকের ধারণা সংখ্যালঘুদের সমস্যা ভারতবিভাগসম্ভূত। এবম্বিধ চিন্তা ব্যাপারটির গুরুত্ব নষ্ট করে এবং এজাতীয় বিশ্লেষণে শুধু এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এ চিন্তাধারা আর আফ্রিকার আন্তঃগোত্রীয় যুদ্ধগুলির জন্য তাদের অকালে প্রদত্ত স্বাধীনতাকে দায়ী করা একই কথা। উৎকট স্বাদেশিকতা হচ্ছে এশিয়ার সমস্যা। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় মনে করে দেশ তাদেরই এবং তারাই দেশের একমাত্র অধিবাসী। তাদের মতে সংখ্যলঘুরা হচ্ছে বিদেশী এবং যে-দেশে তাদের সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সে-দেশের প্রতি তারা আনুগত্যসম্পন্ন। ভারতবর্ষের হিন্দু, পাকিস্তানের মুসলমান, সিংহল, বর্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েৎনামের বৌদ্ধসম্প্রদায়, ফিলিপাইনের খ্রিষ্টান সকলের এই একই অভিমত। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সর্বদাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় দলটিকে সন্দেহের চোখে দেখবে। এই কারণে ভারতে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন হচ্ছে, ফিলিপাইনে, বর্মায় খ্রিষ্টানদের উপর, পাকিস্তান ও সিংহলে হিন্দুদের উপর এবং ভিয়েৎনামে খ্রিষ্টানদের উপর নিপীড়ন হচ্ছে। এমনকি, কমিউনিস্ট চীনেও সিংকিয়াং-এর মুসলমানদের মনে চীন সাম্যবাদীরা আজও আস্থা জন্মাতে পারেনি। এর কারণগুলো ঐতিহাসিক। ভারতবিভাগ না হলে এসমস্ত থাকত না বলে যাদের বিশ্বাস, তারা এ সমস্যার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এই সমস্যার বিচার করলে এ সমস্যার কোনো সমাধান হয়তো পাওয়া সম্ভব হত। 'লিয়াকত-নেহরু চুক্তি'র ব্যর্থতায় লোকের উপলব্ধি হয়েছে যে, পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা তা কার্যকর হবে না। এশিয়ার যেখানে এজাতীয় সমস্যা একরূপ অনুপস্থিত সেখানে তার সদর দফতর স্থাপন করে, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার অনুরূপ—তা না হলে জেনিভায় কোনো একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থায় শ্রমিক, মালিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের মতো এখানেও মিলিত হবে সংখ্যালঘুদের নেতারা, সংখ্যাগরিষ্ঠদের নোতারা এবং সরকারি প্রতিনিধিরা। এরা

www.nagorikpathagar.org

কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের সমস্যা আলোচনা করে নীতিমালা গ্রহণ করবে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্তত অর্ধেক দেশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরিদর্শক দল গঠিত হবে। এরা প্রতিটি দেশে উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখবে সেইসব দেশের সরকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠানের সুপারিশগুলো কতদূর বাস্তবায়িত করেছে। তদন্তের ভিত্তিতে তারা যে রির্পোট দেবে, তা ভাবাবেগবর্জিত মন নিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা করা হবে। এটা অবশ্য সত্য যে, প্রথম কয়েক বৎসর এই প্রতিষ্ঠান তেমন কিছু কাজ দেখাতে পারবে না, কারণ এতে যেসব সরকারি প্রতিনিধিদল থাকবে, তারা কেবল নিজ নিজ সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থার গুণগান করবে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার অগ্রগতিও প্রথম অবস্থায় বিলম্বিত ছিল, কিন্তু তা পরবর্তীকালে সুফল অর্জন করেছে। বর্তমান শতাব্দীর পাঁচদশকের শেষদিকে এ বিষয়টি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে কূটনীতিকদের মধ্যে আলোচিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী পদে লিয়াকত আলী খানের উত্তরাধিকারী হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি এমন একটি মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা নিযুক্ত হলেন, লিয়াকত আলী খানের মৃতুর পর যার কোনো বৈধ অস্তিত্ব ছিল না। অতএব প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্তি বেআইনি এবং অগণতান্ত্রিক ছিল। নাজিমুদ্দিনের সেদিনকার ঘোষণা সত্যই হাস্যকর শোনাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, "মন্ত্রিসভা আজ আমার উপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন।" কিন্তু যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক তখন পাকিস্তানের শাসক ছিলেন, তাঁদের জন্য নাজিমুদ্দিনই সম্ভবত একমাত্র পছন্দসই ব্যক্তি ছিলেন। পাঞ্জাবি নেতারা সম্মতি দিলেন যেহেতু বাংলার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নাজিমুদ্দিন দুর্বলতম ব্যক্তি ছিলেন। ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের বাঙালি দল ভাবল তারা নাজিমুদ্দিনের মাধ্যমে রাজত্ব করবেন আর তিনি হবে তাঁদের হাতের পুতুল মাত্র। শাসকচক্রের পাঞ্জাবিদলের নেতা গোলাম মোহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল করা হল, আর তার চেয়েও খারাপ কাজ যা করা হল তা হচ্ছে সেক্রেটারি জেনারেল এবং স্থায়ী পাঞ্জাবি সরকারি কর্মচারি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে তাঁর স্থলে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করা হল। ছ'মাস যাবৎ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী একাধারে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং সরকারী কর্মচারী থাকলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এইভাবে গণতন্ত্রের সমস্ত নিয়ম, রীতি ও আইন উড়িয়ে দিলেন। মুসলিম লীগ পার্টি এই অবস্থাকে স্বীকার করে নিল এবং আইনসভা বিনা তর্কে একে সমর্থন জানাল। এসব লোকের মুখে গণতন্ত্রের বুলি অবাস্তব শোনাল। খাজা নাজিমুদ্দিনের চেহারা, কথাবার্তা ও বা কাজকর্মে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে মনে হতে পারে যে, তিনি মানুষ বা ঘটনাপ্রবাহকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ ছিলেন। নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল প্রথমে ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারি এবং পরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হয়েছিলেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথম থেকেই তিনি ভিক্টোরিয়া যুগের একজন ভাইসরয়ের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনকে তিনি কার্যকরী পরিষদের জনৈক প্রবীণ সভ্য হিসাবে গণ্য করলেন।

www.nagorikpathagar.org

খাজা নাজিমুদ্দিনের নতুন সমস্যা সৃষ্টি করার বিশেষ দক্ষতা ছিল। প্রধানমন্ত্রীরূপে ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" তাঁর এই ঘোষণা সবার নিকটে এক প্রচণ্ড আঘাতের মতো এল ; কারণ বিশেষভাবে তিনিই ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় এক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হল। ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হল। বিরোধীদলের রাজনৈতিক নেতারা স্থির করলেন, সরকারের তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হলে তাঁরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন, কিন্তু ছাত্ররা এবং যুবলীগ এজাতীয় আদেশ বলবৎ হলে তাকে লঙ্ঘন করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হল। ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে এক সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হল, কিন্তু সকাল ন'টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিস্থিতি বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল। ধরপাকড় আরম্ভ হল এবং দুপুর পর্যন্ত তা এভাবেই চলল। কয়েকশত লোক গ্রেপ্তার হল। বেলা দুটোর সময় পুলিশবাহিনী মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখের জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করবে বলে ঠিক করল। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং কাঁদুনে গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যেসব ছাত্র মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে পুলিশের উপর পালটা আক্রমণ চালায়। পুলিশ তখন ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই চারজন শহীদ হল এবং আহত হল আরও কয়েকজন ছাত্র। অবিলম্বে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ; সকল শ্রেণীর লোক আন্দোলনে যোগ দিল। সমস্ত শহরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল, সামরিক বাহিনীকে ডাকা হল এবং ২২-২৩ তারিখেও গোলাগুলি চলল। আন্দোলন ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করতে লাগল। মন্ত্রীরা পালিয়ে গিয়ে মিলিটারি ব্যারাকে আশ্রয় নিলেন। আন্দোলনের নেতারা আত্মগোপন করলেন, কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই এক পোড়োবাড়ির মধ্য থেকে সংগ্রামশীল নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাহায্যে শান্তি স্থাপিত হল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছত্রভঙ্গ ও হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব প্রবল হয়ে দেখা দিল।

এরপর জমায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে কাদিয়ানী ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লাহোর ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরিস্থিতির এতদূর অবনতি হল যে, সামরিক বাহিনীকে আহ্বান করতে হল এবং আইন ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য সামরিক আইন জারি করতে হল। জমায়াতের নেতা মৌলানা মৌদুদীকে কাদিয়ানী মুসলমান-নিধনের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল এবং ফাঁসির হুকুম দেয়া হবে বলে স্থির হল। পরে অবশ্য তাঁর প্রতি সরকার সদয় হয়ে তাঁকে মুক্তি দেন।

কোনোরূপ পরিকল্পনা না থাকার দরুন খাদ্য-পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করল। প্রতিশ্রুতি আর কাজের মধ্যেকার অসামঞ্জস্যের দরুন অনিবার্যভাবে মোহমুক্তি ঘটল। খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় পাকিস্তান তার রাজনীতির তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হল, যার নাম হল 'ব্যর্থতা'। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্বার্থের

www.nagorikpathagar.org

সংঘাত বেড়েই চলছিল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিষ্ফল ধর্মীয় কলহ আর দুর্নীতির প্রকোপে জনসাধারণের জীবনযাত্রা বিষময় হয়ে উঠল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটল। কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি এবং তজ্জনিত পাট ও তুলার বাজারদরের পতন নাজিমুদ্দিন সরকারের সমাধি রচনা করল।

১৯৫৩-এর এপ্রিল মাসে গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করলেন। ঘোষণায় গোলাম মোহাম্মদ বললেন, "আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে, নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে, দেশ আজ যে-সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন তাদের মুকাবিলা করতে তারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। যে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বর্তমান মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার জন্য প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে পাকিস্তানের প্রতি কর্তব্যপালনে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন একটি নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা সম্ভব হতে পারে।"

বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, যিনি ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তাঁকে সেখান থেকে বিমানযোগে করাচিতে নিয়ে এসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হল। তিনি আইনসভার সদস্য ছিলেন না। এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্টারি পার্টির নির্বাচিত নেতাও ছিলেন না। কিন্তু তিনিই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং পদচ্যুত খাজা নাজিমুদ্দিনের সহকর্মীদের প্রায় সকলেই মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করলেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নেতা নির্বাচিত হলেন ; ফলে গভর্নর জেনারেলের আচরণ সমর্থিত হল। পরে মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগের সভাপতি হলেন এবং এটাও গণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হল। মোহাম্মদ আলী একজন অল্পবয়সী অভিজাত ব্যক্তি এবং কিছুটা আমোদপ্রিয় ছিলেন। রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না এবং এসব নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাতেন না। সরকারের কোথাও তাঁর একটি স্থান থাকলেই তনি খুশি থাকতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা না করেই গোলাম মোহাম্মদ যখন তাঁর মন্ত্রিসভা নির্বাচন করলেন তখন তিনি মোটেই দুঃখিত হলেন না। যতদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীরূপে আখ্যায়িত হতে থাকবেন ততদিনই তিনি নিজেক সুখী মনে করবেন।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে স্থির হল। ১৯৪৫-৪৬ সালে তাঁর দলের সম্পূর্ণ পরাজয় হবার পর থেকে জনাব ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের নির্বাসন হয়েছিল। তিনি এখন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। নূরুল আমিন তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঐ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি পদের জন্য নূরুল আমিনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করার পর কৃষক প্রজা পার্টির মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল ; অনেকে তাঁকে ঐ দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে পরামর্শ দিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গে জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন হওয়ায় 'প্রজা' শব্দটি তিনি ব্যবহার করতে চাইলেন না। অতএব ১৯৫৩

www.nagorikpathagar.org

সালের অক্টোবরে তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্ব করবেন বলে স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে বামপন্থীরা শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্য জনমত সংগ্রহের অভিযান আরম্ভ করে দিয়েছিল। যুবলীগ, গণতন্ত্রীদল এবং বামপন্থী ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকল ; তারা আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা ভাসানীকে ফজলুল হকের সহযোগিতা করার জন্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্ররোচিত করল। ফজলুল হককেও আওয়ামী লীগে যোগদান করানোর জন্য চেষ্টা করা হল, সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সেটাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হবার মতো উপযুক্ত কোনো লোক পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। সোহ্‌রাওয়ার্দী ইতিপূবেই কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বামপন্থীরা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে যুক্তফ্রন্টের জন্য আবেদন জানাল। তারা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের বিরোধী ছিল না, কিন্তু তারা এমন একজনকে চাইল, যিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন। ফজলুল হকের রাজনীতিতে যোগদান করাকে তারা দৈবপ্রেরিত মনে করল। তারা জানত, নিজের কোনোরূপ সংগঠনী প্রতিভা না থাকায় ফজলুল হক স্বভাবতই তাদের উপর নির্ভর করবেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী বামপন্থীদের এই মতলব রোধ করার জন্য খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা তার উপর যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিল তা মেনে নিতে তিনি বাধ্য হলেন। এইভাবে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল। সরকারবিরোধী দলগুলি সংগঠন করার জন্য এর দফতর ঢাকায় স্থাপিত হল। আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে এর কার্যকরী পরিষদ গঠিত হল, সোহ্‌রাওয়ার্দী হলেন এর সভাপতি। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার সাথে সাথে ফজলুল হক নেজামে ইসলাম নামে একটি দলকে এর মধ্যে টেনে আনলেন। বামপন্থী প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্রী দল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টে প্রবেশাধিকার দেওয়া হল না। যা হোক, পীড়াপীড়ির মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টে গণতন্ত্রীদলের যুবক কর্মীদের মনোনয়ন দান করা সম্ভব হল এবং একজন সুপরিচিত কমিউনিস্ট কর্মীর জন্য আসন খালি রাখা সম্ভব হল।

কার্যকরী পরিষদ সিদ্ধান্ত করল নির্বাচনী এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থীকে তারা মনোনয়ন দান করবে। স্ব স্ব এলাকায় প্রার্থীর পারিবারিক প্রভাব, প্রতিপত্তি, সমাজকর্মী হিসাবে তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনদ্বন্দ্বের ব্যয় বহন করার উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি তাদের বিবেচ্য বিষয় হবে। প্রার্থীদের তরফ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিটির সাক্ষাৎ চলল, কিন্তু যে-কোনো প্রার্থীরই মনোনয়ন সম্পর্কে তিন দলের প্রতিনিধিরা কদাচিৎ একমত হলেন। তাঁদের আলোচনায় সবসময় সন্দেহপ্রবণতা ও একের প্রতি অন্যের অবিশ্বাস দেখা দিত এবং প্রায়ই তা এমন পর্যায়ে পৌছাতে লাগল, যাতে মনে হল যুক্তফ্রন্ট বোধ হয় ভেঙে যাবে। কিন্তু সকলের সাধারণ শত্রু মুসলিম লীগ-ভীতি তাদের একত্র করে রাখল। যে-কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে এটা স্পষ্ট হল যে, যদি মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে ধসে পড়ে, তা হলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ফ্রন্ট আর কাজ করতে পারবে না। মুসলিম লীগ যদি শতকরা ৪৫টি আসন পায়,

www.nagorikpathagar.org

তা হলেই ফ্রন্টের একত্র থাকা সম্ভব হবে।

একুশ দফা কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে নির্বাচনযুদ্ধ চালানো হল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে মর্যাদা দেবার দাবি জানাল। অপরাপর দাবির মধ্যে ছিল নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীর কারামুক্তি, যৌথভাবে চুক্তি করার দাবিকে বলবৎ করার জন্য শ্রমিকদের স্বাধীনতাপ্রদান, পাট সম্পর্কে বাস্তবনীতি অনুসরণ এবং পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা।

সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল ; আইনসভার ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি পেল। এরূপ বিপুল জয়লাভ জনসাধারণ আশা করতে পারেনি, যদিও সোহ্‌রাওয়ার্দী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুসলিম লীগ এক ডজনের বেশি আসন পাবে না। যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের কারণগুলি হচ্ছে :—

(১) বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য জনসাধারণের হাতে অস্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগের গোড়ায় ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতিরা, যারা গ্রামাঞ্চলে কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিনিধিস্থানীয়।

(২) নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের আমলাতন্ত্রে পাঞ্জাবিদের প্রাধন্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল।

(৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ উদ্দীপিত হয়েছিল।

(৪) মুসলিম লীগ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিল, কিন্তু ঐ ভাষা কায়েমি স্বার্থবাদী আর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির ভাষারূপে বিবেচিত হয়েছিল।

(৫) পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং নির্বাচন পিছিয়ে দেবার জন্য অগণতান্ত্রিক কাজ আর নিরাপত্তা আইনের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জনসাধারণ ভোট দিয়েছিল।

নির্বাচনের পর শিল্পপতিরা আর গণপরিষদের মুসলিম লীগ সভ্যরা যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করার জন্য অনুমতি না দিয়ে তার ফলাফল ব্যাহত করার চেষ্ট করল। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতিরাই সর্বপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কারণ মুসলিম লীগ প্রার্থীদের নির্বাচনের ব্যয়ভার তারা বহন করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তারা ভীত হয়ে পড়ল। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নির্বাচিত নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডেকে পাঠালেন। এই ছিল তখন রাজনৈতিক চিত্র।

এই সময় কমিউনিস্ট মতবাদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যকে কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে রক্ষা করতেই হবে ; অতএব একটি মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন করার মতলবে আলাপ-আলোচনা চলছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের এমন তীব্র বিরোধিতা করল আরব রাষ্ট্রগুলি,

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ করে মিশর যে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বর্জন করতে হল। ১৯৫৪ সালে ম্যানিলায় পাকিস্তান আঞ্চলিক সামরিক চুক্তি (Regional Military Pact) স্বাক্ষর করল। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীরা হল ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। এই চুক্তি সিয়াটো (SEATO) চুক্তি নামে পরিচিত হল। এর অব্যবহিত পরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান পারস্পারিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হল। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, তুরস্ক মিলে এক সমারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল, যা পরবর্তী কালে সেন্টো (CENTO) চুক্তি বলে অভিহিত হল। এসব চুক্তির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল—সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনকে সামরিক শক্তি দ্বারা বেষ্টন করে রাখা, যাতে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রসারিত হবার সুযোগ না পায়।

গোলাম মোহাম্মদ, স্যার জাফরুল্লাহ্ এবং জেনারেল আইয়ুব খাঁ এসব চুক্তিতে স্বাক্ষর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার বেশ কিছুদিন পর তাদের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ অবগত হয়েছিল। বগাদাদ চুক্তি স্বাক্ষর করার ব্যাপারে উদ্যোক্তা ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খাঁ এবং সিয়াটো চুক্তি স্বাক্ষর করার উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার জাফরুল্লাহ্। এতে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী নিজেকে অবহেলিত বোধ করলেন এবং এই বিষয় উপলক্ষ করেই তিনি ফজলুর রহমানের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হলেন। নাজিমুদ্দিনের পদচ্যুতির পর থেকে গোলাম মোহাম্মদকে উৎখাত করার জন্য শেষোক্ত ব্যক্তি চক্রান্ত করছিলেন। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে ফজলুর রহমান গণপরিষদে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগাবেন স্থির করলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ১০ ধারাকে সংশোধন করে এক আইন পাশ করা হল এবং এই আইনের সাহায্যে গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হল। স্বল্পায়ু হলেও এটা ফজলুর রহমানের পক্ষে একটা রাজনৈতিক বিজয়। ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর অর্থাৎ আইনটি পাশ হবার পর একমাস অতিক্রান্ত না হতেই গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে গোলাম মোহাম্মদ এর প্রতিশোধ নিলেন এবং এক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ঘোষণাটিতে বলা হল :

"দেশ এখন যে সঙ্কটের সম্মুখীন, তা বিবেচনা করে গভর্নর জেনারেল গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অতএব তিনি পাকিস্তানের সর্বত্র এক জরুরি অবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলে ঘোষণা করতে প্রয়োজন বোধ করছেন। বর্তমানে গঠিত গণপরিষদ জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলায় এটি আর কোনো কাজ করতে সমর্থ নয়।"

নিঃসন্দেহেই গভর্নর জেনারেলের এই কাজটি অগণতান্ত্রিক ছিল। তবে খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণ এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ গঠন অনুরূপ অগণতান্ত্রিক ছিল। গভর্নর জেনারেলের পদে গোলাম মোহাম্মদের নিযুক্তি ছিল বেআইনি ; প্রধানমন্ত্রীর পদে মোহাম্মদ আলীকেও অনিয়মিত উপায়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এসব অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি কাজকে গণপরিষদ সবসময়েই আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করে আসছিল। ১৯৪৭ সালে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য এই গণপরিষদের সৃষ্টি হয়,

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে একটি স্বেচ্ছাচারী শাসকচক্ররূপে দেশকে শাসন করে আসছিল। ভারতীয় গণপরিষদ তাদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ করে ১৯৫২ সালে উক্ত গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে তারা সমগ্র দেশব্যাপী সাধরণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছিল। ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হয়ে এলেও পাকিস্তানে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যাপারে কিছুই হচ্ছিল না। দুষ্কর্মের জন্য গণপরিষদের প্রত্যেকটি লোকের প্রকাশ্য আদালতে বিচার হওয়া উচিত ছিল। তারা গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজকে ব্যাহত করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করার মতলবে এবং দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা এসব কাজ করেছিল। গোলাম মোহাম্মদ যদি দোষী হন, তা হলে অধিক দোষী সাব্যস্ত হওয়া উচিত গণপরিষদের সদস্যদের। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কয়েক হাজার যুবকের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল, ছাত্ররা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হল। জনসাধারণ ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করে, কিন্তু গণপরিষদের সদস্যরা যুক্তফ্রন্টের সদিচ্ছাকে ব্যাহত করার জন্য কম চেষ্ট করেনি। নির্বাচনের তিন মাস পর পূর্বপরিকল্পিত শ্রমিক হাঙ্গামা শুর হল, যার ফলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা থেকে মাত্র দশমাইল দূরে নারায়ণগঞ্জে এবং পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাগজের কলে হাজার হাজার শ্রমিক প্রাণ দিল। এ সর্ম্পকে দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন না করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে এক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হল। জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হল। নিপীড়ন চলতে থাকল। ফজলুল হক স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন ; অসুস্থ অবস্থায় সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশ ছেড়ে সুইজারল্যান্ড চলে গেলেন এবং সেখানে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার এই কাজের উপর বিধানসভারূপে গণপরিষদের এক অধিবেশনে যে বিতর্ক হল, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং তাদের নেতাদের চরম দেউলিয়া মনেরই পরিচয় পাওয়া গেল। তারা দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল না, কিন্তু আইনের ছিদ্র অন্বেষণ করে তারা দেশকে শাসন করে আসছিল এবং জনমতের বিচারের সামনে তাদের হাজির করার কোনো উপায় ছিল না।

এসব পরিবর্তনের মধ্যে নিগূঢ় রহস্যও নিহিত ছিল। খাজা নাজিমুদ্দিনের পতন পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্তপ্রথার উপর ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রতীকস্বরূপ বিবেচিত হয়েছিল। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে যে গণতন্ত্র বিরাজমান ছিল, তা হল সমন্তপ্রথাভিত্তিক। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রেরণা লাভ করে যখন পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান হচ্ছিল, তখন পুঁজিবাদী সমাজে গণতন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশ দেবার লোকের অভাব হওয়ায় পাকিস্তানে ফ্যাসিবাদ বৃদ্ধি পেল। যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ব্রিটিশ-প্রবর্তিত গণতন্ত্র বিরাজ করছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার পর ফ্রন্টের সমস্ত নির্বাচিত সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতারা এক যুক্ত ইস্‌তাহারে পাকিস্তান সরকারকে সামরিক চুক্তিগুলি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নেবার পক্ষপাতী

www.nagorikpathagar.org

ছিল এবং অতিমাত্রায় কমিউনিস্টবিরোধী ছিল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট মতবাদে পক্ষপাতিত্ব এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে অনমনীয় মনোভাবের দরুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হল। এই হল পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদের প্রথম আঘাত ; কিন্তু মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেও ১৯৫৯-এর পূর্বে পুঁজিবাদ এখানে জয়যুক্ত হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান হল সামন্তপ্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর শেষ এবং চরম আঘাত।

যখন গোলাম মোহাম্মদ সার্বভৌম গণপরিষদ ভেঙে দিলেন, তখন তাঁর এই অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদে কারুর কণ্ঠে কোনো শব্দই উচ্চারিত হল না। গোলাম মোহাম্মদকে এ ব্যাপারে অভিনন্দন না জানালেও জনসাধারণ এ ব্যাপারে কিছুটা খুশি হল। মাত্র পাঁচমাস পূর্বে যারা একজোট হয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণের উদ্দেশে অপমানসূচক গালিগালাজ করেছিল, জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের নিপীড়ন করার জন্য জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পাঠিয়েছিল, তারাই এখন ইঁদুরের মতো করাচি থেকে পালাতে লাগল।

মোহাম্মদ আলী, জেনারেল আইয়ুব খাঁ, জোনারেল মির্জা এবং হাসান ইস্পাহানিকে দেশে ফেরার জন্য গোলাম মোহাম্মদ তলব করলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে এলেন। করাচি বিমানবন্দরে পৌঁছে মোহাম্মদ আলী নিজেকে বন্দীদশায় দেখতে পেলেন। গোলাম মোহাম্মদের আদেশ ছিল বিমানবন্দরে পৌঁছার সাথে সাথেই যেন মোহাম্মদ আলীকে বাড়লাট ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুত রাখা জাতির উদ্দেশে বেতার- ভাষণ দিতে বাধ্য হলেন। এই কাজের জন্য মোহাম্মদ আলীকে গোলাম মোহাম্মদের খুব প্রয়োজন ছিল ; এর কারণ পরে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। প্রথমত, তাঁর কাজকে সমর্থন করার জন্য একজন বাঙালির দরকার ছিল ; দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ালে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরূপতা কম হবে। সঠিক আচরণ করলে গভর্নর জেনারেলের নূতন মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে তাঁকে বহাল রাখা হবে— এই মর্মে গোলাম মোহাম্মদের নিকট থেকে আশ্বাস পেয়ে ভোরের দিকে মোহাম্মদ আ্যালী মুক্তিলাভ করলেন। তাঁর এই কাজে গোলাম মোহাম্মদ সেনাবহিনীর, আমলাচক্রের, শিল্পপতিদের, বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুর জমিদারদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের সমর্থন পাওয়া তাঁর বাকি ছিল। জেনারেল মির্জা, যিনি ডাঃ খান সাহেবের ব্যক্তিগত সুহৃদ ছিলেন, তাঁকে মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করাতে সক্ষম হলেন। গোলাম মোহাম্মদ বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী লীগের সমর্থন লাভ করার জন্য তখন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক উসমানীর শরণাপন্ন হলেন। উসমানী এবং গোলাম মোহাম্মদ একই পীরের মুরিদ ছিলেন ; পীরভাইকে সাহায্য করার জন্য উসমানী আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের নেতা আতাউর রহমান খানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য ঢাকায় আসলেন। উসমানী তাঁকে সাবধান করে দিলেন, যদি বাংলাদেশ গোলাম মোহাম্মদকে সমর্থন না

www.nagorikpathagar.org

করে, তবে তার শাসনভার সামরিক বিভাগের উপর তুলে দেওয়া হবে। আতউর রহমান খাঁ তার ব্যক্তিগত সমর্থন জ্ঞাপন করলেন এবং সদ্যরোগমুক্ত সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সুইজারল্যান্ড রওয়ানা হলেন। ইউরোপ যাবার পথে আতাউর রহমান খাঁ গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর শাসনের প্রতি সমর্থন জানালেন। আতাউর রহমানের নিকট সব শুনে সোহ্‌রাওয়ার্দী অবাক হলেন, কারণ তাঁর সবসময়ে ধারণা ছিল ব্রিটিশের আদর্শ ও ঐতিহ্যে পুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনী কখনও দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। আতাউর রহমান খাঁ সেনাবহিনীর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁকে যা বললেন, তার কিছুই সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কিন্তু যখন শুনলেন দেশরক্ষামন্ত্রীরূপে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব শপথ গ্রহণ করছেন, তখন সবকিছুই তিনি বিশ্বাস করলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী আতাউর রহমানকে জানালেন যে, তিনি তাঁর কর্মপন্থা দেশে ফিরে স্থির করবেন।

যখন এসব আলাপ-আলোচনা চলছিল, তখন হাসান ইস্পাহানির নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতিরা গোলাম মোহাম্মদকে তাঁর সরকারে আওয়ামী লীগকে অর্ন্তভুক্ত না করার জন্য আবেদন জানালেন। জেনারেল আইয়ুব এবং জেনারেল মির্জা গোলাম মোহাম্মদকে যথেষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে, মন্ত্রিপরিষদে সোহ্‌রাওয়ার্দীর অন্তর্ভুক্তি তাঁদের পছন্দ নয়। তাঁদের আশঙ্কা হল, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে দিলে লিয়াকত আলী সরকারের সময় সামরিক অভ্যুত্থানের অপরাধে দণ্ডিত সেনানায়কদের মুক্তিদানের জন্য তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। তাঁদের বিচারকালে সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, এই হল তাঁদের সন্দেহের ভিত্তি। এতে গোলাম মোহাম্মদ অপ্রস্তুত বোধ করলেন ; কারণ ইতিমধ্যে তিনি উসমানী ও আতাউর রহমানের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব সোহ্‌রাওয়ার্দীর হাতেই ন্যস্ত করবেন যদিও প্রথমাবস্থায় তাঁকে একজন সাধরণ মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে হবে। তাঁকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য মোহাম্মদ আলীকে ডেকে পাঠালেন। মোহাম্মদ আলীও সোহ্‌রাওয়ার্দীকে মন্ত্রিপরিষদে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এসে ফজলুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে বললেন, যদি তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং আওয়ামী লীগকে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁদের পরিচয়পত্রকে চ্যালেঞ্জ করতে রাজি থাকেন তা হলে তাঁর (ফজলুল হকের) কৃষক-শ্রমিক দলকে প্রদেশের শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হবে এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে। জেনারেল মির্জা ও মোহাম্মদ আলী কর্তৃক অভদ্রভাবে বরখাস্ত হলেও দলের লোকের চাপে জনাব ফজলুল হক এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। স্থির হল, গোলাম মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে এবং মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের সঙ্গে পৃথকভাবে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবেন। এইভাবে বাংলার দুই নেতাকে শাসকচক্রের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আলাদা করে রাখা হল। পূর্ববাংলায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর ১৯৫৪ সালের মে মাস থেকে মৌলানা ভাসানী লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর করাচি বিমানবন্দরে সোহ্‌রাওয়ার্দী বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল তার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানতে পারলেন না। গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে যা বললেন, তা-ই তিনি আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করলেন। গোলাম মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে জানালেন যে, মোহাম্মদ আলী নামেমাত্র প্রধানমন্ত্রী থাকলেন, আসল প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনিই। সোহ্‌রাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করলেন ফজলুল হকের মনোনীত আবু হোসেন সরকার। এ বিষয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হল না। তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তিনি শাসকচক্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহণ করায় পাকিস্তানে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রতিক্রিয়া হল বিরূপ, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মতে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উচিত কাজই করেছিলেন। এমনকি, পূর্ব পাকিস্তানে যাঁরা সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর এই কাজকে সমর্থন করলেন না। তিনি তাঁর কর্মীদের বললেন, আপোস ব্যতীত গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না, যদিও তাঁর অভিমত হচ্ছে কেবলমাত্র বিতর্কিত বিষয়ের উপর আপোস করা যেতে পারে ; মূলনীতির উপর নয়। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা আছে, কিন্তু কোনো বিমূর্ত বা ভাবপ্রবণ চিন্তাধারা নেই। তাঁর ধারণা ছিল, আবেগপ্রধান চিন্তাধারা রাজনীতিকদের মধ্যে গোঁড়ামির সৃষ্টি করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রী হিসেবে তিনি সকল গোঁড়ামির বিপক্ষে ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এইসব সঙ্কটমুহূর্তে পাকিস্তানের বিচার বিভাগ তার স্বাধীন সত্তার মহান ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল। মৌলভী তমিজউদ্দিন খাঁর মামলায় পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের রায় দেশের ইতিহাসে চিরদিন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে। যখন দেশের শাসকগোষ্ঠী এবং বিধান পরিষদ একে অপরের উপর আধিপত্য লাভ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল, সেনাবাহিনী, আমলাচক্র আর পুঁজিবাদীদের সমর্থন লাভ করে শাসকগোষ্ঠী বিধানসভার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছিল, একমাত্র বিচার বিভাগই তখন ক্ষমতার সমতারক্ষার জন্য প্রয়াস পেয়েছে এবং তাদের সুচিন্তিত অভিমত দ্বারা ছিনিয়ে নেয়া ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করেছে। সুপ্রীম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশেই গোলাম মোহাম্মদ দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তান বিচার বিভাগ সবসময়েই ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতিকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছে।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হল। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি ফরমুলা অনুযায়ী সমস্ত ব্যাপারে দেশের উভয় অংশের প্রতিনিধিত্ব সমপরিমাণ হবে বলে স্থির হল। এই ফরমুলা স্বীকার করে নেওয়ায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সময়-সময় জনসাধারণের নিন্দার পাত্র হয়েছিলেন। যখন মারিতে বিধানসভার বৈঠক বসল, কার্যত সেই অধিবেশন সোহ্‌রাওয়ার্দীই পরিচালনা করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশে ফেরার পূর্বেই গোলাম মোহাম্মদের অনুগ্রহলাভের আশায় আতাউর রহমান খাঁ ও ফজলুল হকের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। গোলাম মোহাম্মদকে মাল্যভূষিত করার জন্য দুপুর রোদে যেভাবে এই দু'জন নেতা বিমান-বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন, তা সত্যিই দৃষ্টিকটু। শাসকচক্রের হাতে বাংলার নেতারা পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন।

পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং ফজলুল হকের মধ্যে এক চুক্তির ফলে নেতৃত্বে রদবদল হল। ফজলুল হকের সমর্থন পেয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং বাংলায় ফজলুল হকের দল ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হলেন এবং গোলাম মোহাম্মদকে অবসরগ্রহণে বাধ্য করা হল। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী সহায়-সম্বলহীন রাজনৈতিক এতিমে পরিণত হলেন। গোলাম মোহাম্মদকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গদিতে থাকার খাতিরে তিনি এতদিন নোংরা রাজনীতিতে মেতেছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল তখন তিনি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেন। ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রীরূপে নাজিমুদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হতে তিনি যে চাকুরি ত্যাগ করে করাচি এসেছিলেন, পুনরায় তিনি সে চাকুরিতে ফিরে গেলেন।

যে দু'বছর মোহাম্মদ আলী গদিতে ছিলেন সেই সময়টা দেশ যেন অতিক্রম করল অস্থিরতা ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান ফ্যাসিবাদী না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে? পাকিস্তান কি ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে, না ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাবে? দুর্নীতিকে কি দমন করা হবে, না তাকে সুযোগ দেওয়া হবে তার বিনাশক কাজ চালিয়ে যেতে? পাকিস্তানের কি কোনো স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি থাকবে—যা পরিচালিত হবে পক্ষপাতশূন্য স্বর্থের দ্বারা অথবা পাকিস্তান কি কোনো একটি শক্তিবর্গের সঙ্গে যোগদান করবে? উপর্যুপরি দু'জন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন আর বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর সম্মুখে এই প্রশ্ন-গুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং জাতিকে পরিচলনা করতে উভয়েই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

নতুন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী দেশকে অন্ধকার থেকে টেনে তুলতে এবং তাকে একটি গঠনতন্ত্র প্রদান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারীরূপে জীবন আরম্ভ করেন এবং স্বাধীনতার পর তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রথম এবং একমাত্র সেক্রেটারি জেনারেল—যা ছিল পাকিস্তানের বেসামরিক বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ। দেশ বিভাগ পরিষদে তাঁর প্রশংসনীয় কার্যের জন্য পুরস্কারস্বরূপ তিনি এই পদ প্রাপ্ত হন। জিন্নাহ্ সাহেব এবং লিয়াকত আলী খান উভয়েই তাঁর যোগ্যতায় আস্থাবান ছিলেন। আমলারা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার জন্যই তাঁর সুবিধা হয়েছিল। তাঁর নীতি বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাদের উপর নির্ভর করতে পারতেন। প্রশাসনিক এবং বিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে সমতা রক্ষা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে দেশ শাসন করার জন্য তাঁর যে অভিপ্রায় ছিল, তার প্রতি সমর্থন এল বিরোধীদলের তদানীন্তন নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিকট থেকে। উভয় নেতা একমত হলেন যে তাঁরা নির্ভেজাল গণতন্ত্র

www.nagorikpathagar.org

প্রবর্তন এবং একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য চেষ্টা করবেন। প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে বিরোধীদলের নেতার নিকট হতে সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করলেন, যদিও বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দল সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল—যাতে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর আস্থা ছিল না।

পূর্ববাংলার যুবসমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করেছিল এবং তারা প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছিল। সরকারি দমননীতি সত্ত্বেও তারা জয়যুক্ত হয়েছিল, কারণ স্বাধীনতার পর তাদের মধ্যে এসেছিল এক শুভ পরিবর্তন। পুরোহিত-অধ্যুষিত সমাজকে বর্জন করে জীবনের নতুন এবং আধুনিক উদ্দেশ্যগুলি তারা খুঁজে ফিরছিল। পূর্ব পাকিস্তান কতদূর সমৃদ্ধ আর তার সম্পদ কতটুকু তাদের উপকারে আসে, তারা তা বেশ বুঝতে পারছিল। নিজগৃহে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের বয়স পঁচিশের নিচে, তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাদের অভিলাষ হল তারাই তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি—বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধরা—বিভাগপূর্ব ও পরবর্তী ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাদের দিন অতিবাহিত হয়েছিল তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সমবায়ে গঠিত এক যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ববাংলার শ্রমিক ও কৃষকদের উপর স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজের আমূল পরিবর্তনের মতবাদ তখনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাধ্যমে আরও অধিকসংখ্যক চাকুরির ব্যবস্থা করায় বুদ্ধিজীবীরা বেশি মাত্রায় আগ্রহান্বিত ছিলেন। এইসব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে শাসন-ক্ষমতা সমপরিমাণে ভাগ করে নিতে চাইলেন। তাঁরা মনে করলেন কোনো আধুনিক সমাজের পক্ষে তার নিজ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, যদি অর্থ, ধন আর শুল্কনীতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তার না থাকে। পাকিস্তানে এসব বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সেখানে অতিমাত্রায় প্রতিপত্তি পশ্চিম পাকিস্তানীদের ছিল। আওয়ামী লীগের ধারণা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্দেশ্য যদি সাধন করতে হয়, তা হলে পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়টি সম্বন্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা একমত হয়ে বিরোধিতা করছিলেন। তাঁরা বাঙালি নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁদের দেশ হচ্ছে সমগ্র পাকিস্তানের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র এবং যদিও সেখানেই জনসংখ্যার অধিকাংশের বাস, সেই জনসংখ্যার এক অংশের আবার পাকিস্তানের প্রতি কোনোরূপ আনুগত্য নেই। এর প্রত্যুত্তরে আওয়ামী লীগ নেতারা বললেন, এর বিকল্প হবে হয় পাকিস্তানের ধ্বংস—নয়তো বড়জোর অশান্তি, অস্থায়িত্ব এবং তার ফলস্বরূপ হবে আর্থিক অবস্থার অবনতি। এমন কোনো কারণ নেই যাতে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের সন্দেহ করতে থাকবেন। বাংলার বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অভিমত হল, বিচ্ছিন্নতা হবে একটা প্রতীপগতি ব্যবস্থা, কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রবণতা

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা অপেক্ষা স্বৈরাচারী সরকার স্বীকার করে নেওয়া। পশ্চাদ্‌মুখী জাতীয়তাবাদ দ্রুতবর্ধিষ্ণু জাতির সমস্যাসমূহের সমাধানের সহায়ক নয়। যারা বিচ্ছিন্নতা বা দেশকে খণ্ড খণ্ড করার কথা উল্লেখ করছিল, তাদের যুক্তির ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ :—

(ক) যেহেতু পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের একমাত্র যোগসূত্র হবে ধর্ম, তাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার জন্যে সর্বদা সচেষ্টা থাকবে।

(খ) শিল্পপতি এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা ধর্মকে ব্যবহার করবে অশিক্ষিত জনসাধারণকে শোষণ করার জন্যে।

(গ) দূরত্ব এবং নৈকট্যহীনতার দরুন কৃষক আর মজুরদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না একত্র হয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং কায়েমি স্বার্থবাদীদের সঙ্গে লড়াই করা। কিন্তু পুঁজিবাদী আর ভূস্বামীদের কোনো অসুবিধা হবে না উভয় অংশের মধ্যকার ব্যয়সাপেক্ষ যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণকে শোষণ করতে।

(ঘ) উভয় অংশের লোকদের একত্র রাখতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সবসময়েই খোঁজ করতে হবে একটি বিপজ্জনক সাধারণ শত্রুর—হয় চীনা কমিউনিস্ট, নয় ভারতীয় হিন্দু।

(ঙ) বাক্‌স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা দেশে বড় একটা থাকবে না।

(চ) পাকিস্তানে যেসব রাজনৈতিক সংস্থা ধর্মভিত্তিক হবে না এবং যারা বেশি জোর দেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার উপর, তারা সফলতা অর্জনের কোনো সুযোগই পাবে না।

পূর্ববাংলা সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী মনোভাব পোষণ করা অন্যায় হবে। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে শেষ পর্যন্ত তার উপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল। গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অভিমত হল, পাকিস্তান সুইজারল্যান্ডের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে। কারণ, তা হচ্ছে একাধিক ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মৈত্রীবদ্ধ কয়েকটি জাতির অমিতশক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্তি প্রদর্শন করলেন, বাঙালিরা যদি বোধশক্তির পরিচয় দেয়, আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি যুক্তির সামনে নতি স্বীকার করে, তা হলে পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ হবে দৃঢ়।

এটি ছিল একটি কঠিন সমস্যা, কাজেই চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাবধানে অথচ স্থির গতিতে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি অপোসের সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হলেন। যদিও আওয়ামী লীগ সদস্যরা শেষ দিন বিধানসভা বর্জন করে বেরিয়ে আসেন এবং গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষর প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন, তথাপি বিরোধীদলের নেতা হিসাবে সোহ্‌রাওয়ার্দী তাতে স্বাক্ষর করলেন এবং ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ গৃহীত হল উক্ত গঠনতন্ত্র। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে বহু কিছু বলবার থাকলেও দেশবাসী গঠনতন্ত্রের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। গঠনতন্ত্রটি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ হলেও

www.nagorikpathagar.org

এবং তার বাস্তবায়ন দুরূহ হবে জেনেও সকলের মনে হল কাজটি ঠিকই করা হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মির্জা আর ফজলুল হকের সঙ্গে চুক্তি করে যে ভুল করেছিলেন তার ফলে বৎসরপূর্তির পূর্বেই তাঁর পতন ঘনিয়ে এল। প্রথমেই যে বিরাট ভুলটি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন তা হল জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করতে সম্মতি দেওয়া। ব্রিটিশের রাজনৈতিক দালাল এবং চক্রান্তে সিদ্ধহস্ত জেনারেল মির্জা সেনাবাহিনীর আস্থাভাজন ছিলেন এবং সেখানেই ছিল তাঁর ক্ষমতার উৎস। স্থায়ী এবং গণতান্ত্রিক সরকার তাঁর অপছন্দ ছিল ; কারণ এতে তাঁর ক্ষমতাহীন নামমাত্র শাসকে পরিণত হবার সম্ভবানা ছিল। এই অবস্থা স্বীকার করে নিতে তিনি একান্ত পারুঙ্মুখ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পরিষদের নেতা এবং বিরোধীদলের প্রধান উভয়েই পরীক্ষামূলকভাবে গঠনতান্ত্রিকতা চালু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী গণতন্ত্রে অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন ; কারণ তিনি ছিলেন সম্মিলিত দলের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতা। বিধানসভায় তাঁর সমর্থকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল।

কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তাঁর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন—এটা জেনারেল মির্জার অভিপ্রায় ছিল না। অতএব তিনি ডাঃ খান সাহেবকে তাঁর রিপাবলিকান দল গঠন শুরু করে দিতে প্ররোচিত করলেন। এই নতুন দল প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে গভর্নর গুরুমানীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় বিধানসভায় মুসলিম লীগ দলে ভাঙন ধরল এবং প্রধানমন্ত্রিত্ব বজায় রাখা এতদূর অসম্ভব হয়ে উঠল যে, ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে উক্তপদে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ইস্তফা দিলেন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর আর একটি ভ্রম হয়েছিল ফজলুল হকের প্রস্তাবমতো আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করতে দেওয়া। ফজলুল হকের সমর্থন পাবেন এই আশায় গণতান্ত্রিক নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি এই কাজ করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভায় আবু হোসেন সরকারের সমর্থকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না এবং দেখা গেল, নূরুল আমিনের তুলনায় তিনি গণতন্ত্রে অনেক কম বিশ্বাসী। নূরুল আমিন অন্তত বিধানসভার মোকাবিলা করেছিলেন, যদিও তিনি জনসাধারণের মোকাবিলা করতে রাজি হননি। কিন্তু আবু হোসেন সরকার বিধানসভা বা জনসাধারণ— কোনোটারই সম্মুখীন হতে চাইলেন না। এমনকি, বিধানসভায় বাজেট পেশ না করেও আবু হোসেন সরকার প্রায় ষোল মাস যাবৎ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল থাকলেন। বিধানসভার চলিত প্রথা ও রীতি তিনি অগ্রাহ্য করলে সম্পূর্ণরূপে। গঠনতন্ত্রের অবর্তমানে জনসাধারণ বিক্ষোভকারীদের প্রতি হল অধিকতর সহানুভূতিশীল। দিন দিন খাদ্য-পরিস্থিতিতে অবনতি ঘটতে লাগল। রাজধানীতে বুভুক্ষু জনতার মিছিল গ্রাম থেকে এসে ভিড় করতে থাকল। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে তারা হত্যা করল অনেককে এবং আহত করল তার চেয়েও বেশি লোককে। প্রশাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল—১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আহ্বান করা

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হক সাহেবের অন্য কোনো উপায় রইল না। এই ঘটনা গণতন্ত্রের বিজয়স্বরূপ বিবেচিত হল। আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এর নেতারা রাজনীতির প্রাথমিক স্তর থেকে কাজ শুরু করে উপনীত হয়েছিলেন নেতৃত্বের উচ্চস্তরে। শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠানে ইস্কান্দার মির্জা উপস্থিত ছিলেন। ঐ রাত্রেই সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নর জেনারেল ঢাকা ত্যাগ করলেন। পরদিন জনসাধারণ জানতে পারল, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর জায়গায় সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্বেই তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গভর্ণর জোনারেলকে জ্ঞাপন করেছিলেন।

আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন গঠিত সম্মিলিত সরকারে কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মন্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারিও। তাঁর অনুচরদের স্বপক্ষে রাখবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ঘুস ও পারমিট দিতে হল। তাঁর সবচেয়ে খারাপ কাজ হল পারমিটের ভিত্তিতে সরকারি দলের লোকদের কাছে সমস্ত মজুত চাল খুব কম দামে বিক্রি করে দিয়ে সেই চাল খোলা বাজারে তিনগুণ চড়া দামে বিক্রয় করার জন্য তাদের অনুমতি দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া। এতে খাদ্যঘাটতি সম্পর্কে উদ্বেগের সঞ্চার হল এবং পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। কিন্তু আবু হোসেন সরকারকে তাঁর প্রাপ্ত কৃতিত্ব দিতেই হবে। কারণ তদানীন্তন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের প্রদত্ত ২১ দফা প্রতিশ্রুতির রূপায়ণের জন্য। তিনি আরও প্রশংসা দাবি করতে পারেন এইজন্য যে, তাঁর ব্যক্তিগত সাধুতা তাঁর শত্রুদেরও সন্দেহাতীত ছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী আহুত হলেন এবং পরদিন অভিষেক হল তাঁর মন্ত্রিসভার। সোহ্‌ওরায়ার্দী এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আওয়ামী লীগ ছিল সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তার কোনো সমর্থক ছিল না বললেই হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেশের উভয় অংশেরই সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় তাঁকে সেখানকার রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে যোগ দিয়ে গঠন করতে হল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। আশিজন সদস্যসম্বলিত বিধানসভায় আওয়ামী লীগের সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র তেরো জন, আর সে-স্থলে রিপাবলিকান পার্টির সভ্যসংখ্যা ছিল সাতাশ জন। কোয়ালিশন সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হওয়ায় তাতে যোগ দিতে অন্যান্য দলগুলিকেও আমন্ত্রণ করা হল। বহু লোকের মতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে এজাতীয় কোয়ালিশনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা অবিজ্ঞজনোচিত হয়েছিল। কোয়ালিশনে আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘুত্ব ছাড়াও রিপাবলিকান পার্টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সুবিধাপ্রাপ্ত এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, অথচ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পূর্ব পাকিস্তানী অনুগামীদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের লোক। সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকার-গঠনের পূর্বে বিধানসভায় তিনি নিজে না হলেও বাংলাদেশের সমস্যার মধ্যে তাঁর দলীয় লোকেরা

www.nagorikpathagar.org

তাঁদের বক্তৃতা সীমিত রাখতেন। তাঁদের দাবি ছিল—পূর্ববাংলাকে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি আর মুদ্রাব্যবস্থা বাদে আর সব ক্ষমতা দিতে হবে। তাঁরা সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন—সময়-সময় তাঁদের বক্তৃতায় এমন আভাসও পাওয়া যেত যে, তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। এটা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ সৃষ্টির পর থেকেই মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে তারা আন্দোলন করে আসছিল। অতএব উভয় দেশের নেতাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এ অবস্থায় এক দলের পক্ষে অন্যদলকে বুঝে ওঠা অসম্ভব ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক কার্যক্রমের মর্ম উপলব্ধি করতে অসমর্থ হলেন। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সমর্থন করল, কারণ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের ধারণা হল সহানুভূতিসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারলে তারা অধিকতর মনোবল নিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে যেতে পারবেন। প্রায় একদশক কাল মুসলিম লীগ সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তানকে করা হয়েছিল অর্থনৈতিক শোষণ, তার উপর চাপানো হয়েছিল রাজনৈতিক নির্যাতন, তার বিরুদ্ধে করা হয়েছিল সামাজিক পক্ষপাত এবং তার উপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপানো হয়েছিল। এখন তারা পাকিস্তানে এসবের অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এতে বিশেষ ঝুঁকি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো গত্যন্তর ছিল না।

গণতান্ত্রিক একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাই হল চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। গঠনতন্ত্র হল এর প্রথম পদক্ষেপ, দ্বিতীয়টি হল বিধানসভায় বিরোধীদলের ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতিপ্রদান। গণতন্ত্রে তাঁর শেষ অবদান হল বিধান পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আস্থা হারানোর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পদত্যাগ। তাঁর পূর্বগামীদের নীতি ছিল সৎ বা অসৎ উপায়ে গদি আঁকড়ে থাকা। কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের অভাব থাকায় তিনি তাঁর দলকে স্বমতে আনতে খুব কমই সক্ষম হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানকে এক 'ইউনিট' করা হল ১৯৫৫ সালে এবং এ ব্যবস্থা গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হল। পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তারা সংগ্রাম করেছিল, কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সাফল্যও অর্জন করতে পারেনি। তারা একটি যৌথ নির্বাচনপদ্ধতির জন্য সুপারিশ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বিধান-সভার আইন দ্বারা সিদ্ধান্ত হবে—এই অজুহাতে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বিষয়টিকে অমীমাংসিত রেখে দেন। ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে বা কোনোরূপ নির্দেশ দিতে তিনি ব্যর্থ হলেন। সুয়েজখালের ব্যাপারে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর সরকার তালগোল সৃষ্টি করল। তাঁর পররাষ্ট্র সচিব লন্ডনে কমনওয়েলথের এক সভায় যোগদান করতে যাবার পথে প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে পাকিস্তানের মতামত তাঁকে জ্ঞাপন করালেন, কিন্তু ফস্টার ডালেস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। Foster Dulles পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের ভয় প্রদর্শন করে তাঁর উপদেশ পালন করতে বাধ্য

www.nagorikpathagar.org

করলেন। প্রতিনিধি তখন প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপদেশ চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু তিনি তাঁদের যথাযথ নির্দেশ দিতে সক্ষম হলেন না। এর ফলে কেবলমাত্র মিশরের সঙ্গে নয়, অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সঙ্গেও পাকিস্তানের সম্প্রীতি নষ্ট হল। এই সঙ্কটের মধ্যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলেন। আমলারা যাঁরা স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শাসনকাজ চালিয়ে আসছিলেন, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর আমলে দেশের শাসনভার তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কব্জা করেছিলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন এই ছিল দেশের অবস্থা। কিছুসংখ্যক লোকের ভীতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিযুক্তিতে বিরাট আশা জনসাধারণের মনে জাগরিত হল। জিন্নাহ্‌ সাহেব যখন বড়লাট ছিলেন, সেই সময় থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি উপরতলার লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হতে পারে এমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন দেশে ছিল না। কিন্তু আওয়ামী লীগের কাজ একেবারে গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল, অতএব এর মনোযোগ প্রাথমিক ভোটারের দিকে নির্দেশিত হয়েছিল। দেশে সংহতি সৃষ্টির জন্য লিয়াকত আলী খান থেকে আরম্ভ করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পর্যন্ত সব আমলেই ইসলামকে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় আওয়ামী লীগ মুসলিম জনসাধারণের ভাবাবেগের সাহায্যে কাজ উদ্ধার করার জন্য কখনও ধর্মকে ব্যবহার করেনি। তারা জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই যদি তমসার অবসান হয়ে থাকে, তবে সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় উষার আবির্ভাবে সূচনা হল। সমস্ত দেশ আলোকিত হল যখন মুক্তকণ্ঠে সোহ্‌রাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন—পাকিস্তান জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তার সকল অধিবাসীকে সমান নাগরিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তাঁর এই ঘোষণা যাতে কেবলমাত্র বক্তৃতায় আর কাগজে-কলমে সীমিত না থেকে যায়, তা দেখবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। নির্বাচকমণ্ডলী, যাদের ইচ্ছানুযায়ী সরকার ক্ষমতায় সমাসীন হয়, ধর্মের ভিত্তিতে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। তাঁর ঘোষণার পর তিনি বিধানসভায় যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার জন্য এক বিল উত্থাপন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেটা বিধানসভার অনুমোদন লাভ করল। তাঁর যুক্তি হল ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা সঙ্গত নয় ; দেশের বিভিন্ন অংশে বিরাজমান নানারূপ শোষণব্যবস্থার উচ্ছেদের মাধমেই ঐক্যবিধান সম্ভবপর হতে পারে। ১৯৫৬ সালের ১০ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদে এক স্মরণীয় বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন : "দেশবিভাগ এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যবিশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সমবায়ে রাষ্ট্রগঠনের সমর্থনে মুসলমানেরা যে দ্বিজাতিতত্ত্বের মতবাদ তখন পেশ করেছিল, সেই রাষ্ট্র গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকারিতা মুসলমানদের জন্যও নিঃশেষিত হয়েছে।" জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী উক্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের মতবাদকে আরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন ; এমনকি, তিনি দাবি করেন—ভারত- বিভাগের পর জিন্নাহ্‌ সাহেব কখনও এই মতবাদের উল্লেখ করেননি। কারণ যে-শর্তে জিন্নাহ্‌ সাহেব পাকিস্তান গ্রহণ করেন, তা হল ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত না করার শর্ত।

www.nagorikpathagar.org

বহু বৎসর পর চৌধুরী খালিকুজ্জামান তাঁর Pathway to Pakistan গ্রন্থে একই কথার উল্লেখ করেন, যদিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের মতবাদ সম্পর্কে জিন্নাহ্ সাহেবের মত পরিবর্তনের কৃতিত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয়, আমাদের বিদায় সাক্ষাৎকারের ফলে জনাব জিন্নাহ্ তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব মতবাদ বর্জন করার আশু সুযোগ গ্রহণ করলেন—পাকিস্তানের মনোনীত গভর্নর জেনারেল এবং গণপরিষদের সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁর ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট তারিখের বক্তৃতায়।"

জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর প্রথম বেতারভাষণে সোহ্রাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন, তিনি একটি নতুন স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবেন। প্রথম যে-দেশ তিনি সফর করলেন তা হল কমিউনিস্ট চীন। তাঁর এই ঘোষণায় পুরতন প্রতিক্রিয়াশীলপন্থীরা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন ; কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কমিউনিস্ট মতবাদ হচ্ছে একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং মানবতার বিপদস্বরূপ। আমলাতন্ত্র ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল, মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল জমিদারশ্রেণী, শিল্পপতি এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা ভয়ানকভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কিন্তু সোহ্রাওয়ার্দী তাদের নিষেধে কর্ণপাত না করে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠনের তিন মাসের মধ্যে পিকিং যাত্রা করলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সোহ্রাওয়ার্দীই প্রথম, যাঁর ঐ কাজ করার মতো সাহস ও দূরদৃষ্টি ছিল। লিয়াকত আলী খান সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মস্কো যাননি। তার পরিবর্তে উক্ত আমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করে ওয়াশিংটন থেকে দাওয়াত আদায় করেন। সোভিয়েত রাশিয়া ঐ অপমান অনেকদিন ভুলতে পারেনি। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁদের প্রথমবার ভারতসফরকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধানরা ঘোষণা করেছিলেন—কাশ্মীর ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইরান, তুরস্ক, থাইল্যান্ড এবং ফিলিপাইনস ব্যতীত পাকিস্তানের কোনো মিত্ররাষ্ট্র এশিয়ায় ছিল না। এই রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবার কারণ হল—তারা সাবাই ছিল ইঙ্গ-মার্কিন জোট কর্তৃক সৃষ্ট সামরিক চুক্তিগুলির সদস্য। পাকিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, লালচীন ও আফগানিস্তান সকলেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। বার্মার মনোভাব অবন্ধুজনোচিত, সিংহলের ঔদাসীন্যপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান বার্মার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল, তা যেমন দুঃখজনক, তেমনই সমর্থনের অযোগ্য। জন্মের শুরু থেকেই পাকিস্তান বিপরীতধর্মিতায় ভুগছিল। জনাব জিন্নাহ্‌র নিজের জীবনে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাব ছিল স্ব-আরোপিত নিঃসঙ্গতার দরুন, তেমনি সুবৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভয়ে পাকিস্তানও অনুরূপ একাকী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিল এবং সর্বদা কে তাকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং ভৌগোলিক বাস্তাবতার হাত থেকে তার আত্মরক্ষার উপায় কি—তারই খোঁজ করছিল। এই সত্য পাকিস্তানকে ভুলে যেতে বাধ্য করেছিল নিজেকে একটি এশীয় দেশ বলে। সোহ্রাওয়ার্দীর চীনসফরের পর সেখানকার প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাল্টা পাকিস্তান সফরে এলেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য পাকিস্তানের ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভার

www.nagorikpathagar.org

আয়োজন করা হল। পাকিস্তানের বামপন্থীরা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরা অস্বাস্তি অনুভব করল। কমিউনিস্ট মতবাদের চিরশত্রু সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে চীন সরকারের বন্ধুতামূলক আচরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে তারা অক্ষম হল। সোহ্‌রাওয়ার্দী ও চৌ এন লাই-এর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হল এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে দু'টি দেশ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল। সোহ্‌রাওয়াদীর লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর সম্পর্কে এশিয়া এবং রাশিয়ার সমর্থনলাভ এবং চৌ এন লাই- এর আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতকে একঘরে করে এশিয়ার নেতৃত্বলাভ।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আর কায়েমি স্বার্থবাদীরা যতই বাধার সৃষ্টি করুক না কেন, প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলল এবং কূটনীতিক রাজনীতিতে তিনি নেহরুর সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতে লাগলেন। একজন পার্লামেন্টারিয়ান এবং বক্তা হিসাবে সোহ্‌রাওয়ার্দী নিঃসন্দেহে নেহরুর চেয়ে বড় ছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক সংগঠনে তিনি সমভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুর খ্যাতি সোহ্‌রাওয়ার্দীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। নেহরু ছিলেন এশিয়ার ব্যক্তিত্ব আর মানসের প্রতীক। ঔপনিবেশিকতা এবং বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীর ভূমিকা নেহরুর ছিল, কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুরূপ দাবি ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ সেকালে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামে বিশেষ আগ্রহান্বিত না থাকায়, তারা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই কৃতিত্বের বিষয়ে একরূপ অন্ধ ছিল। সোহ্‌রাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তায় বেসামরিক কর্মচারীরা ত্রস্ত হয়ে উঠল। কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পূর্বে তাদের অহংকার এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের সঙ্গে একটি নির্বাচনমূলক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। আমলাতন্ত্রে এজাতীয় মনোভাব সংশোধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের চাকুরির অবসান আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরপরই ঘটানো হল।

আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার বেশ উন্নতি হচ্ছিল। ১৯৩৭ সালে জনাব ফজলুল হক কর্তৃক সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ আর হস্তক্ষেপের বাইরে থেকে কাজ করতে সক্ষম হল। ১৯৩৭ সালে জনাব ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কাজ পরতে পেরেছিলেন। কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারাটি তখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ বাংলার কৃষকেরা অনুভব করেছিল যে, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের শাসনকর্তা। পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ সরকার কেবল স্বাধীনতাই ভোগ করে নাই, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছিল। এর ফলে সরকার সক্ষম হয়েছিল বহুসংখ্যক দেশগঠনমূলক পরিকল্পনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী একজন দেশনায়ক হয়ে উঠলেন এবং দেশের উভয় অংশে তাঁর জনপ্রিয়তা যেভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাতে প্রেসিডেন্ট মির্জা ভীত হয়ে পড়লেন এবং

www.nagorikpathagar.org

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে যাতে ধ্বংস করতে সক্ষম হন, সেজন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালের গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর প্রতি গণসমর্থনে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে তিনি সাধারণ নির্বাচনে জয়যুক্ত হবেন। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য জমিদারশ্রেণী, আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্ত করলেন। প্রেসিডেন্ট মির্জার বাসভবন ষড়যন্ত্রকারীদের লীলাভূমিতে পরিণত হল।

সম্মিলিত জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিকে কাশ্মীর প্রশ্নটি আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী উপদেশ দিয়ে পাঠালেন নিরাপত্তা পরিষদের একটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে। ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসবে বলে স্থির হল। সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যস্ত সেই সময় চক্রান্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে স্বাদেশে চক্রান্ত করছিল। মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতদ্বৈধতা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য আকার ধারণ করল। প্রধানমন্ত্রীর অনুসৃত বৈদেশিক নীতি মৌলানা ভাসানী সমর্থন করলেন না। তিনি মনে করলেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বর্জন করে দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন শিবিরের দিকে। এই বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য তিনি কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের এক বৈঠক আহ্বান করলেন। ১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ যে-সময় নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা হবার কথা—ঐ সময়েই এই বৈঠক আহূত হল। যেসব রাষ্ট্রপ্রধানরা সোহ্‌রাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির সঙ্গে একমত ছিলেন না, মৌলানা ভাসানী এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন। ভারত থেকে বেবল পণ্ডিত নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কেই নয়, সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর সহানুভূতিহীন বলে পরিচিত কয়েকজন কবি ও লেখককেও আমন্ত্রণ জানানো হল। রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে কেউ অবশ্য সম্মেলনে যোগদান করলেন না। কিছুসংখ্যক ভারতীয় কবি ও লেখক সম্মেলনে অতিথি হয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য সম্মেলনের স্থান পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় তোরণ নির্মাণ করা হল। পণ্ডিত নেহরু, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, মাও সেতুং, স্ট্যালিন এবং ইস্কান্দার মির্জার নামে তোরণ নির্মাণ করা হল। আশ্চর্যের বিষয়, সম্মেলনের সমস্ত খরচ জনৈক শিল্পপতি বহন করলেন ; বলাবাহুল্য তাঁর সহধর্মীদের সঙ্গে একমত হয়েই তা করেছিলেন।

মৌলানা ভাসানী ইস্পাহানি ও মাহমুদাবাদের রাজার দলের লোকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে পড়েছেন বলে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বুঝতে পারলেন ; তাঁর চ্যালেঞ্জকে মুকাবিলা করবেন স্থির করে তিনি সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য কাগমারী গেলেন। সেখানে প্রতিনিধিদের কাছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলেন এবং সেন্টো ও সিয়াটো সামরিক চুক্তিদ্বয়কে সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। করাচি ফিরে যাবার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভাতেও বক্তৃতা করলেন এবং তাঁর অনুসৃত বৈদেশিক নীতির যুক্তিগুলি সমর্থন করলেন। তাঁর নির্ভিকতা ও আন্তরিকতায় আওয়ামী লীগ কাউন্সিল এবং

www.nagorikpathagar.org

ছাত্রসমাজ উভয়েই তাঁর নীতিকে সমর্থন করল। প্রেসিডেন্ট মির্জা যিনি মৌলানার কাগমারী সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তিনিও পশ্চাদপসরণ করলেন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী ও তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে সরকারিভাবে সমর্থন জানালেন।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাফল্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল, যেহেতু মৌলানা ভাসানী কেবল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টই নন, জনদরদি নিঃস্বার্থ কর্মীরূপে তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেছেন, অতএব পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের উপর তাঁর কর্তৃত্ব অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার প্রতি অনুকূল কোনোরূপ বৈদেশিক নীতি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিশেষ পছন্দনীয় ছিল না। এখানকার বুদ্ধিজীবীরা সর্ব সময়েই মার্কিন উদ্ভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত সামরিক চুক্তিগুলিকে তীব্র নিন্দা করেছে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, বাঙালিরা শান্তিপ্রিয় ; বরঞ্চ তাদের ধারণা ছিল যে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুললে বেসামরিক শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্র ভেঙে পড়বে। দেশের সামরিক বাহিনীর শক্তি যদি জনসাধারণের সামগ্রিক প্রতিরোধের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে তা হলে তা দেশকে গ্রাস করবেই, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানে আমেরিকান সাহায্যেরও বিরোধী ছিল ; কারণ স্বাধীনতার পর থেকে উক্ত অর্থসাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন এবং সেচব্যবস্থায় নিয়োগ করা হচ্ছিল। এই বিপুল সাহায্যের দরুন দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে স্থলে শিল্পায়ন ও সেচব্যাবস্থার উন্নতিতে উপকৃত হল, সে স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা কেবল মুদ্রাস্ফীতিজনিত অসুবিধা ভোগ করতে থাকল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর অবস্থার আরও অবনতি হল। কালাহান নামে 'নিউইয়র্ক টাইমস' প্রত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল। সে সরকারি দফতরে গিয়ে কতকগুলি নথি তলব করল এবং তাকে দেখতে না দেওয়ায় সে কর্মচারীদের কমিউনিস্ট পৃষ্ঠপোষিত যুক্তফ্রন্টের সমর্থক বলে অভিহিত করল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঢাকাস্থ মার্কিন কনসালের দফতর কালাহানকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোনোরূপ চেষ্টা করেনি। ফলে তার ব্যবহারে মনে হল সে-ই যেন সি.আই.এ.-এর প্রধান। এখানকার লোকের সঙ্গে তার দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ সমারিক চুক্তিগুলির বিরোধিতাজ্ঞাপক স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযান আরম্ভ হল। যুক্তফ্রন্টের প্রায় সকল নেতাই স্বাক্ষর করলেন উক্ত প্রতিবাদপত্রে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ চিন্তাধারার সর্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতী ছিল।

উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে এই বিষয়ের উপর সোহ্‌রাওয়ার্দী কিভাবে জয়যুক্ত হলেন—তা বোধগম্য হল না। আরও আশ্চর্যের কথা, তিনি জয়লাভ করলেন বিরোধীদলের নেতারূপে নয়, দেশের প্রধান শাসকনর্তা হিসাবে ; যদিও ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের মতো পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা সবসময়েই ক্ষমতাসীন সরকারের বড় সমালোচক এবং এখনও তা-ই রয়েছে। সোহ্‌রাওয়ার্দী যতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে জানিয়েছে অবিরাম সমর্থন। এসবের পিছনে কি কারণ থাকতে পারে সেগুলি

www.nagorikpathagar.org

ভাবতে গিয়ে তারা বিস্মিত হল। এ কি তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের জন্যই সম্ভব হয়েছে? না শাসক হিসাবে তাঁর দক্ষতার জন্য? কিংবা জনসাধারণের প্রতি তাঁর আস্থা এবং তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর জনসাধারণের বিশ্বাসের দরুনই এটা সম্ভব হয়েছে? এও কি সম্ভব, তিনি তাঁর কর্মসূচির বাস্তবায়নে সক্ষম, এই বিশ্বাস লোকের মনে ছিল? তা বিশ্লেষণ করা আজও সহজ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটি প্রহেলিকা।

যখন নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হল, ভারতের কৃষ্ণ মেনন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে এবং নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকবার মতো যুক্তিসঙ্গত কোনো জরুরি অবস্থা বিদ্যমান নেই—এইসব প্রমাণ করার জন্য কাগমারী সম্মেলনের বিবরণী সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করলেন। পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা ঐ সময় এক সংকটের সম্মুখীন হলেন। তাঁরা বহু আয়াস স্বীকার করে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বোঝাতে সমর্থ হলেন যে, কাগমারী সম্মেলন আওয়ামী লীগের ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ফলস্বরূপ এবং তা প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নয়। পাকিস্তানের অভিযোগের উত্তর দিতে উঠে কৃষ্ণ মেনন সাতদিন বক্তৃতা করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। সভার কার্যশেষে যে প্রস্তাব পেশ করা হল—একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের নিশ্চিত সমর্থন তাতে ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম দিনকার প্রস্তাবে নিরপেক্ষ থেকে পরদিন প্রস্তাবটির কার্যকর ধারাটির বিপক্ষে ভোট দিল। পোলান্ডও পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এটি পাকিস্তানের একটি বড় রকমের কূটনৈতিক বিজয় বলে গণ্য হল। জাতিসংঘে সাফল্যলাভ করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মনে হল তিনি অনুরূপ সাফল্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেহরুর সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারবেন। এটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সোহ্‌রাওয়ার্দী যদি জাতীয় সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ দিতেন তবে তাঁর পক্ষে খুবই ভাল হত।

সুয়েজ সম্পর্কে সোহ্‌রাওয়র্দীর নীতি কিংবা আরবজাহানে নাসেরকে একঘরে রাখার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা কোনোটাই পূর্ব পাকিস্তানে প্রশংসিত হল না। নাসেরকে প্রধানমন্ত্রী একঘরে করতে পারতেন কি না, কেউ সঠিক না বলতে পারলেও বোঝা গেল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন। কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রীদের সম্মেলনে তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন অন্যান্য নেতাদের উপর। তিনি লন্ডন থেকে আমেরিকায় সরকারি সফরে গেলেন। সেখানে শুধু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকেই নয়, তিনি মার্কিন জনসাধারণকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করলেন। আমেরিকার কংগ্রেসে তাঁর উপস্থিত বক্তৃতা কেবল যে ভাষণপটুতার উদাহরণস্বরূপ প্রশংসা পেল তা-ই নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুদক্ষ বিশ্লেষণ বলেও স্বীকৃতিলাভ করল, যদিও অনেকের মনে হয়েছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রশংসা করতে গিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী মাত্রা অতিক্রম করেছেন।

পাকিস্তানী শিল্পপতিদের প্রধান অসুবিধা ছিল কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য বিদেশী মুদ্রার সীমিত পরিমাণ। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের পাট রফতানি কারবার

www.nagorikpathagar.org

থেকে পাকিস্তানে বিদেশী মুদ্রার শতকরা ষাট থেকে আশি ভাগ লাভ হচ্ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানাগুলির প্রয়োজন মিটানোর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি বৈদেশিক মুদ্রা বণ্টন এবং রফতানি ও আমদানি লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে সমতার দাবি জানাল। সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত এই অসমতা দূর করার জন্য প্রথম পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল সাবেক আমদানিকারকদের বিভিন্ন শ্রেণীর পুনর্বিবেচনান্তর আমদানি বাণিজ্যে নবাগতরা বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের উপেক্ষিত অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা যাতে প্রবেশাধিকার পায়—তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এ ছাড়াও বিদেশী মুদ্রাবণ্টন ব্যাপারে দু'টি প্রদেশের মধ্যে সমতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল।

সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং প্রেসিডেন্ট মির্জার মধ্যে অসচ্ছন্দ সহযোগিতার বিষয় অবগত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা শেষোক্ত জনের সঙ্গেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। সম্মিলিত বণিক ও শিল্পসংঘের বার্ষিক ভোজে প্রেসিডেন্ট মির্জাকে প্রদত্ত এক মানপত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের নীতিকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করে বললেন :

"আমাদের রাজনীতিবিদরা পরিস্থিতির তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন এবং দলীয় রাজনীতিতে শুধুমাত্র দেশের রাজনৈতিক মর্যাদারই হানি হয়নি, উপরন্তু দেশের অর্থনৈতিক জীবনকেও তা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে....রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা একটি কার্যকর আপোসরূপে গণ্য হতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য বিবেচনা না করে তা প্রয়োগ করলে আমরা হয়তো এমন এক কানাগলিতে গিয়ে হাজির হব—যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় থাকবে না।"

সোহ্‌রাওয়ার্দী দৃঢ়ভাবে তাঁর সরকারের নীতিকে সমর্থন করে দাবি করলেন, দেশকে বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিকভাবে ; তার এক অংশকে বঞ্চিত রেখে অপর অংশের শ্রী-বৃদ্ধি করা চলবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর খাপ্পা হয়ে উঠল যখন সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকার যেসব কলকারখানগুলি তখন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন অসুবিধা ভোগ করেছিল, তাদের আধুনিকীকরণ, সম্পূর্ণকরণ এবং সম্প্রসারণের বিশেষ উদ্দেশ্যে আই. সি. এ. প্রদত্ত এককোটি ডলার পরিমাণ অর্থসাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করলেন পূর্ব পাকিস্তানী এবং নূতন শিল্পপতিদের অনুকূলে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই সাহায্য বিতরণকে বহিরাগত প্রভাবদুষ্ট বলে অভিযুক্ত করলেন এবং প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করলেন এর প্রতিকারের জন্য।

সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকার এবং কায়েমি স্বার্থবাদীদের মধ্যে সংঘাত বেড়ে উঠল যখন বাণিজ্য ও শিল্প দফতর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে উপকূলবর্তী বাণিজ্যের জন্য একটি সরকারি নৌচলাচল সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করা হল। উপকূল এলাকায় বাণিজ্য এতদিন জাহাজের মালিকদের ছিল। পাকিস্তানের জাহাজ-মালিকদের সমিতি

www.nagorikpathagar.org

সরকারের একচেটিয়া নৌচলাচল সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলিতে পূর্ণ এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন ছাপালেন ; যার শেষে ব্যবসায়ীসুলভ দোষারোপ ছিল : "এটাই কি স্বাধীন সমাজের ধ্বংসের আরম্ভ?" এই বিজ্ঞাপনের পুনরাবৃত্তি হতে থাকল যতদিন না সোহ্‌রাওয়র্দী প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিলেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে তাঁর পতনের জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী নিজেই দায়ী ছিলেন ; কারণ দেশে যা ঘটছিল তার প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কে বলা যায় যে, জনসাধারণের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে তিনি একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতালাভ করার পর তাঁকে মনে হত অনেকটা স্বেচ্ছাচারী। মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের বা তাঁর দলীয় অনুগামীদের উপর তাঁর কদাচিৎ আস্থা ছিল। তিনি ভাব দেখাতেন যেন তাঁর সহকর্মীরা হচ্ছেন সব পুতুলবিশেষ, আর সব কাজ তিনি একাই করছেন। সব কাজ নিখুঁতভাবে করা তাঁর স্বভাব ছিল, সব জিনিসের খুঁটিনাটি তিনি লক্ষ করতে চাইতেন। কাজেই তাঁকে কঠিন প্ররিশ্রম করতে হত। যখনই তাঁর হাতে ক্ষমতা আসত, তিনি দৈনিক আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। কিন্তু অপরের কাছ থেকে কাজ আদায়ের ব্যাপারে তিনি ততখানি দক্ষ ছিলেন না।

১৯৫৪ সালে যখন মুসলিম লীগের পতন হল, যুক্তফ্রন্টের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অঙ্গ হিসাবে আওয়ামী লীগের অভ্যুত্থান হল। কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ উপদল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি দলে আধিপত্য লাভ করেছিল, দলের মধ্যে একটি অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল, যার দরুন শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব হল। ক্ষমতালাভের পর আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক ভিত্তিকে প্রসারিত করার প্রভূত সুযোগ লাভ করেছিল, কিন্তু তা করেনি। এর ফলে তার গঠনমূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সক্ষম হয়নি সুধী বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক জীবন ছিল সক্ষম সংগঠকের। বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে সংগঠন ক্ষমাতাসম্পন্ন কর্মীদের সম্বন্ধে তিনি অনেক বেশি আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার পতনে পাকিস্তানের শিল্পপতি সম্প্রদায় আর আমলাতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হল।

সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বলা হল কিন্তু বিধানসভার সম্মুখীন হতে তাঁকে দেওয়া হল না। প্রেসিডেন্ট মির্জার অগণতান্ত্রিক কাজে এই মতবাদই প্রমাণিত হল যে, এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে স্বৈরতন্ত্রের আমল মেনে নিতে হবে—যতদিন পর্যন্ত শাসক হিসাবে আমলাচক্র এবং সরকারি কর্মচারীরা অকৃতকার্য প্রতিপন্ন হচ্ছে না। জনসাধারণকে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্র অর্জন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে প্রদেশব্যাপী খাদ্য-সংকটের মুকাবিলা করতে হয়েছিল। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা খুবই পরিশ্রম করলেন। বার্মা, থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশ থেকে চাল ও গম কেনা হল। প্রয়োজনীয় জাহাজ না পাওয়ায় সেসব খাদ্যশস্য বহন করে আনা হল অনির্দিষ্ট পথচারী

www.nagorikpathagar.org

মালবাহী সব জাহাজে। ১৯৪৩-এর মহা মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা থাকায় সোহ্‌রাওয়ার্দী জানতেন এক্ষেত্রে কি করা প্রয়োজন। অতএব পূর্ব পাকিস্তান সরকার তার সাহায্য লাভ করে বিশেষ উপকৃত হল। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ লক্ষ রাখলেন যাতে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কোনো অসুবিধা ভোগ না করে। যেখানে প্রকৃত পরিবহণ ব্যবস্থা সম্ভব হল না, সেখানে খাদ্যশস্য বিমানযোগে পাঠানো হল। অনশনে একটি লোকেরও প্রাণ নষ্ট হতে দিল না এবং মন্ত্রিসভাও এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হতে সফলকাম হল। ভূমিহীন জনসাধারণ যাতে রোজগার করতে সক্ষম হয়, সেজন্য টেস্ট রিলিফ বাবত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা যাতে নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পরবর্তী বড় কাজ হল। এই মন্ত্রিসভা শুধু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং যার জোরে সরকার বিনা বিচারে লোককে আটক করে রেখেছিল—সেই নিরাপত্তা আইনও বাতিল করা হল। এটা একটি অদ্বিতীয় ব্যবস্থা, কারণ এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোনো দেশই তখন পর্যন্ত তথাকথিত নিরাপত্তা আইন বাতিল করার সাহস দেখাতে পারেনি। এই আইন বাতিল করার ফলে প্রকাশ্য আদালতে বিচার না করে তখন কোনো লোককে আটক রাখার উপায় আর থাকল না।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র নামেমাত্র ছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন থাকার সময় তাকে পরীক্ষামূলকভাবে আনা হল। বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করে সেখানে আইনের খসড়া ও বাজেট পেশ করা হল এবং পাশ করাও হল। বাধা-বিপত্তিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হল সব ক'টি উপনির্বাচন ; সাতটি উপনির্বাচনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করল ছ'টিতে এবং হারল মাত্র একটিতে। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দশকে ১৯৪৯ সালে মাত্র একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হবার পর থেকে আর কোনো সরকার উপনির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণের মুকাবিলা করতে সাহস করেনি।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার চাপ দিতে থাকল ক্ষমতার অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এবং উক্ত প্রদেশের জন্য আরও অধিক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দাবি করতে লাগল। জনসাধারণের ধারণা হল—সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন না এই বিষয়ে। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সরকারি উক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হল। মার্কিন সাহায্য সম্পর্কেও একই ব্যাপার ঘটল। কিন্তু অন্যান্য আর সব ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা প্রধান- মন্ত্রীর সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করল। প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র গঠনতন্ত্রসম্মত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্থায়ী আমদানি ও রফতানি কন্ট্রোলারের (Controller of Import and Export) দফতর স্থাপন করা হল। নতুন আর্থিক বৎসর প্রবর্তন করা হল পহেলা জুলাই থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে এই ব্যবস্থা বিশেষ সহায়ক হল ; কারণ

www.nagorikpathagar.org

পূর্ব পাকিস্তানে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হওয়ায় এখন থেকে এখানকার কর্মকর্তারা পূর্তকাজ সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট সময় পেলেন। স্থির হল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদেশী মুদ্রা বণ্টন ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা হবে। শিক্ষা ও কৃষি-ব্যবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হল—যদিও তাঁদের যা প্রয়োজন সে পরিমাণ নয়। সরকার সেচের কাজ এবং নদী ও খালগুলির সংস্কার আরম্ভ করে দিলেন ; স্বাধীনতার পর থেকেই সংস্কারের অভাবে এগুলি পলিরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অধিকতর খাদ্য ফলানোর জন্য পানির প্রয়োজনে নতুন নতুন খাল খনন করা হল এবং সেগুলি পুরানোগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। সম্মিলিত জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করে সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণের জন্য মিঃ ক্রুগের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দলের নিযুক্তির ব্যবস্থা করলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়মিতভাবে বন্যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। উক্ত দলের কাজকর্ম ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোশারফ হোসেনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ক্রুগ মিশনের সুপারিশ অনুসারে সিদ্ধান্ত হল প্রধানত বন্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

রাজধানী ঢাকা এবং বাণিজ্য ও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম এই দুইটি শহরের সম্প্রসারণের সমস্যা সম্পর্কে মন্ত্রিসভা সচেতন হলেন। DIT (Dacca Improvement Trust) এবং CDA (Chittagong Development Authority) নামে দুইটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা শহর দুইটির উন্নতিকল্পে স্থাপিত হল। এর ফলে অতি সত্বর নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হতে থাকল। পুরাতন রাস্তাগুলিকে সংস্কার ও প্রশস্ত করা হল। পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক হওয়ায় যোগাযোগ-ব্যবস্থা সবসময়েই প্রতিকূল ছিল। রাস্তার সংখ্যা কম ছিল এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে গমনাগমন ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত হল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সরকারের হর্তাকর্তাদের পূর্ব পাকিস্তানের নদনদী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। তাদের ধারণা বড় বড় রাস্তায় সীমাবদ্ধ ছিল যা এখানকার জনসাধারণের খুব কম প্রয়োজনীয় ছিল। যে প্রদেশে বছরে ১০০ থেকে ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে রাস্তার বাহুল্য ঘটলে, অধিকতর সমস্যার উদ্ভবের সম্ভাবনাই বেশি। এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা IWTA (Inland Water Transport Authority) নাম দিয়ে আর একটি স্বায়ত্তসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, যার কাজ হবে অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহণ-সমস্যার সমাধান করা। রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় JMC (Jute Marketing Corporation) এবং FDC (Film Development Corporation) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান এই মন্ত্রিসভা স্থাপন করলেন।

এই মন্ত্রিসভার আমলে শিল্পসংক্রান্ত উন্নতি একরূপ হয়নি বললেই চলে। এ সম্পর্কে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। খুব সম্ভব এ সরকারের সঙ্গে শিল্পপতিরা সহযোগিতা করতে চায়নি, কিংবা পুঁজি নিয়োগ করার পক্ষে রাজনৈতিক আবহাওয়াকে তারা অনুকূল মনে করেনি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এমনকি

www.nagorikpathagar.org

মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁদের মনোভাব গোপন রাখতে পারেননি।

শিল্পপতিরা খুব সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মৌলানা ভাসানীর মধ্যে বিরোধের ফলাফল লক্ষ করছিলেন। তাঁদের সম্পর্কের ফাটল ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকল যতদিন না মৌলানা ভাসানী তাঁর বামপন্থী অনুচরদের আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে NAP (National Awami party) নামে অভিহিত অন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন। ব্যক্তিগতভাবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের মস্তিষ্কস্বরূপ যেসব ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠনের পিছনে আছেন বলে অনুমান করা হত, তাঁদের কয়েকজন সমাজতন্ত্র মতাবলম্বী ছিলেন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের অনুপস্থিতি হচ্ছে খুব সম্ভব উপরে বর্ণিত কারণগুলির পুঞ্জীভূত ফলাফল। এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সমস্ত রাজনৈতিক দলের অনুরূপ আওয়ামী লীগও প্রতিনিধিত্ব করছিল স্বাধীনতালাভের পর অত্যধিক মানসিক আবেগের প্রথম উচ্ছ্বাসজনিত শক্তিশালী একটি জাতীয় প্রেরণায়। সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতী কোনো প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে সময় তখনও পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি বলেই অনুমিত হল। স্বাধীনতার পরেও মন্ত্রী ও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ গুলি পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে।

ক্ষমতাসীন কোনো রাজনৈতিক দলই সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি। এর কারণ কি? এর কি এই অর্থ যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই কোনো ক্রটি নিহিত ছিল? দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এমনই ছিল যে, পারমিট বিতরণে মন্ত্রীদের ও তাঁদের সেক্রেটারিদের অসীম ক্ষমতা ছিল। এইসব পারমিটের জন্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা অবিশ্বাস্য রকমের মোটা টাকা দেবার লোভ দেখালে কি আর আশা করা যায় মন্ত্রীরা বা তাঁদের অধীনস্থ সরকারি কর্মচারীরা প্রলোভন সংবরণ করতে সক্ষম হবেন? যদি তাঁরা সে লোভ সংবরণ করে থাকেন, তবে জনসাধারণ কি বিশ্বাস করবে যে সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন?

এ থেকেই প্রশ্ন আসে অনুন্নত দেশের জন্য একটি উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজে বের করার। তিন প্রকার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে—উন্মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং আর্থিক ব্যবস্থার মিশ্র পরিকল্পনা। এ তিনটির মধ্যে শেষেরটি সর্বাপেক্ষ ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে ; কারণ এ নিয়ম প্রশাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলবেই এবং শিল্পপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাবসম্পন্ন একটি দল কাজ করার জন্য চক্রান্তকারীতে পরিণত করবে। আর্ন্তজাতিক বাজারে যেসব দেশের কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বা যাদের সাম্রাজ্য কিংবা উপনিবেশ আছে অথবা দেশের কোনো অংশকে বাজার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হচ্ছে স্বাধীন উন্মুক্ত প্রচেষ্টা। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যতীত অন্য কোনোরূপ আর্থিক ব্যবস্থা অনুন্নত দেশগুলির জন্য প্রশস্ত হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা হচ্ছে স্পর্শকাতর জাতিয়তাবদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও গর্বিত। যে-কোনো সাদা চামড়ার লোক বা তার চিন্তাধারাকে এখানে সমীকরণ করা হয় অতীত ঔপনিবেশিক যুগের সঙ্গে এবং তাদের কাছে বিবেচিত হয় সন্দেহের দৃষ্টিতে। পাশ্চাত্য পদ্ধতির নিছক অনুসরণ করলে এ অঞ্চলের অধিবসীদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্তমানে মানুষ খুঁজছে এক নতুন বিশ্বাস, নতুন নিশ্চয়তা। তাদের অতীত সভ্যতার আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজব্যবস্থা গ্রহণ এই সংশয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা ইতস্তত বোধ করছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনকে শ্রদ্ধা করে তাদের আরোপিত প্রস্তাব কঠিন সামাজিক আইন-কানুনের জন্য নয় ; তার কারণ হচ্ছে তাদের কাছে প্রশংসনীয় এইসব দেশের অগ্রগতি, যারা একদা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মতোই অনগ্রসর।

জাতীয় আওয়ামী দলের (NAP) প্রচণ্ড অভিযান সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা জাতিগঠনের কাজে ব্যাপৃত থাকলেন—যদিও ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে সোহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর থেকে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যখন চুন্দ্রিগড় প্রধানমন্ত্রী হয়ে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করলেন, তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা সম্মুখীন হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার। চুন্দ্রিগড়কে দু'মাস পরে অবশ্য পদত্যাগ করতে হল। তাঁর স্বল্পায়ু মন্ত্রীসভার পতনের পর রিপাবলিকান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করল এবং ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় সদ্ব্যবহার পেতে থাকল; পৃষ্ঠপোষকতা যা তারা পেয়েছিল সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের আমলে, তা অবশ্যই তারা আর পেল না।

প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ পূর্ববাংলার ধারণা ছিল আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা সক্ষম হবেন পূর্ব পাকিস্তানকে সৎ এবং স্থায়ী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রদান করতে। কিন্তু অচিরেই জনসাধারণের ভুল ভাঙল, মুখ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সৃষ্টি হল ভুল বুঝাবুঝির। প্রতিষ্ঠানটির দুইজন নেতার মধ্যে কোন্দলই অবশ্য মন্ত্রিসভার পতনের কারণ নয়। আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্যুত NAP দলের সৃষ্টির দরুন সমর্থকের অভাব, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ফজলুল হকের দল ও ইস্কান্দার মির্জার মধ্যে সৃষ্ট চক্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দুই ভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের ধারক ও বাহক। মুসলিম লীগের ভিত্তি ছিল ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন—আওয়ামী লীগ প্রগতির পথে একধাপ এগিয়ে গেল। ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তাদের আদর্শ ও মূলধন হল ; অন্যদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হল সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধিতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ। ন্যাপ প্রচার করতে লাগল যে, আওয়ামী লীগ বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সুতরাং তারা দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করতে স্বাভাবিকভাবেই অপারগ। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রচার করল যে, ন্যাপ একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও কৃষক-মজুরের বিপ্লবের বুলি আওড়িয়ে

www.nagorikpathagar.org

সুবিধাবাদীর ভূমিকা পালন করছে। আসলে তারা আন্দোলনকে ব্যাহত করেও প্রগতিবাদী বলে পরিচিত হতে চায়। ১৯৫৭ সন থেকে এ দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে—দেশ ও দশকে তাদের স্ব-স্ব পার্টির কর্মসূচির প্রতি সমর্থন যোগানের জন্যে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর আন্তর্জাতিক সমাজবাদ এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও উপরোক্ত দু'টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে একে অন্যের দ্বারা ক্রমাগত প্রভাবান্বিত হচ্ছে ; ফলে একদিকে ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদকে আংশিক স্বীকৃতি দিয়ে এর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগও ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশক
(১৯৫৮—১৯৬৮)
পূর্ববাংলার সামাজিক বিবর্তন

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দ্বিতীয় দশকে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতার প্রকৃতিতে এল পরিবর্তন। গতানুগতিকভাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলি দ্বারা এখানে ক্ষমতাদির ব্যবহার হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে ঐ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজনীতিকরা ও রাজনৈতিক দলগুলো। পূর্বে ভূস্বামিত্ব বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ছিল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু এখন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হল যন্ত্র, নৈর্ব্যক্তিক বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র আর প্রচার। ক্ষমতার ব্যবস্থাপনার অঙ্গগুলি পার্থক্যমণ্ডিত হওয়ায় এবং আধুনিক শিল্প ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায়, মানুষ এখন প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শক্তির নতুন নতুন উৎস বের করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্প, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জননিরাপত্তার সরঞ্জামাদি, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, পরিবহণ-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি সহায়ক হয়েছে সমাজের পরস্পরবিরোধী অংশগুলোকে একত্রে গ্রথিত করে এক সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন করতে।

ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সেই ক্ষমতার চালকদের স্বরূপ, নেতৃত্ব আর দৃষ্টিভঙ্গি। ক্ষমতার অধিকারী লোকেরা এতদিন ছিল একটি অপেক্ষাকৃত অনড় দলবিশেষ, যার নেতৃত্ব নির্ধারিত হত বংশকৌলীন্যের দ্বারা। এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকত হয় স্ব-স্ব ধর্মের ঐতিহ্যগত শিক্ষা ও আদর্শের ছাপ ; কিংবা এদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হত স্বতঃস্থায়ী আমলাতন্ত্রের ছাঁচে। বর্তমানে প্রকৃত ক্ষমতার উৎপত্তিস্থল গতানুগতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বহির্ভূত হওয়ায় সামাজিকভাবে ক্ষমতার অধিকারী লোকের স্বরূপ হয়েছে যেমন অস্পষ্ট, তেমনি সংক্ষিপ্ত হয়েছে তা বুদ্ধিবাদের দিক থেকে। এই নতুন ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছে সেইসব ব্যক্তিরা, যারা আধুনিক সমাজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছে কারিগরি বিদ্যায়।

ব্রিটিশের শাসনামলে একজন লোকের পক্ষে বাহিরের জীবনে আধুনিক এবং পাশ্চাত্যরীতিতে জীবনযাপন করে গতানুগতিক ও প্রাচ্যরীতির অনুসরণ করে পারিবারিক জীবনযাপন করা সম্ভব ছিল ; কিন্তু বর্তমানে ঐ নিয়ম পালন করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

www.nagorikpathagar.org

কারণ আধুনিক মানুষ হিসাবে লোকজনকে অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়ন করার জন্য নিজের বাড়িতেও তাকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। শহর অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়িতেই রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি আধুনিক সরঞ্জাম আছে, যা সহায়তা করছে পরিবারের ঐতিহ্যগত আবহাওয়ার পরিবর্তনে।

নতুন শিল্পস্থাপনে রাষ্ট্র এখন নতুন উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বণিকের স্থান দখল করে এখন রাষ্ট্রই আলাপ-আলোচনা করছে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিষয়ে। রাষ্ট্র স্বয়ং বৃহত্তর বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি সম্পাদনার ব্যবস্থা করছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্র আজ হয়েছে জাতির শিক্ষক। তুলনামূলকভাবে সমাজে সবচেয়ে বড় বিপ্লব এনেছে ট্রানজিস্টরের উদ্ভাবন। বহু এলাকায় সরকার থেকে জেলেদের মধ্যে ট্রানজিস্টর বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের দফতরে একটি করে ট্রানজিস্টর রেডিও আছে। গ্রাম্য সমাজে এর পরিব্যাপ্তি বহুদূর গড়িয়ে গেছে। জনসাধারণের একটি বড় অংশ রেডিওযন্ত্রের মাধ্যমে বেতারকেন্দ্রগুলি থেকে প্রচারিত গান ও নাটক শুনে আনন্দ লাভ করছে।

সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিল্পমুখী সমাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সৃষ্টি এবং সেগুলিকে চালু রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজের সৃষ্টি হতে চলেছে যার নিচের শ্রেণীতে আছে শ্রমিক, মধ্যশ্রেণীতে আছে কারিগর, প্রকৌশলি আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। এই শ্রেণীর দিকে সম্মান ও সম্পদ প্রবাহিত হতে বাধ্য। কারণ এইসব লোকেরাই ভবিষ্যতে দেশের সার্থক নাগরিক হবে। অতএব পূর্ব পাকিস্তানকে তার অতীত ইতিহাসের পরিবর্তে এই নতুন শিল্পযুগের বিষয়ে অবহিত হবার জন্য গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশের গ্রামের অধিবাসীরা সবসময় তাদের বদ্ধ সমাজে বাস করার দরুন দিল্লি বা কলকাতার শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনে কদাচিৎ প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৩-এর মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে যখন গ্রাম্য সমাজের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল, তখন ক্ষুধার জ্বালায় তারা শহর অভিমুখে দৌড়াতে বাধ্য হয়েছিল। এক মুষ্টি খাবারের জন্য স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা বাড়িঘর ত্যাগ করে শহরের রাস্তায় ভিড় করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে-না-হতেই প্রায় বিশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল। পল্লীর সরল প্রকৃতির লোকেরা প্রত্যেকের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। এর ফলে সত্য ও সাধুতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাকে তারা বিসর্জন দিল। সমাজের স্বার্থ অপেক্ষা নিজ স্বার্থের দ্বারা তারা বেশির ভাগ পরিচালিত হতে থাকল। সাধু উপায়ে জীবনযাপন করার চেয়ে অর্থসম্পদ আহরণই তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হল।

১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলাদেশের গ্রাম-অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হল। আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিকটি তাদের কাছে ভালমতো বোধগম্য তখনও হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের অর্থ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে হিন্দু জমিদার দ্বারা বাংলার মুসলিম গ্রামবাসীদের শোষণনিরোধ, হিন্দু

www.nagorikpathagar.org

মহাজন আর হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিপাত, তারা খুব ভাল করেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন যে পাকিস্তান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে—তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে এ সম্পর্কে বাঙালি মুসলমান কৃষিজীবীদের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বাংলাদেশে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী তেমন প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি।

পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামবাসীরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ হল, যখন ১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সর্বশক্তিমান মুসলিম লীগ—যা এতদিন ইসলাম ও তার গৌরবময় ইতিহাসের ব্যবসাদারি চালিয়ে আসছিল, এবার জনসাধারণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হল।

মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যান্য কারণগুলি অপর এক পরিচ্ছেদে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৯৫৪ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ লোকেরা সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে এবং তাদের এই সচেতনতা জীবন এবং জীবিকাকে সুদূর পল্লীঅঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। শহরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক নেতারা এই নির্বাচনে অপসৃত হলেন এবং জনসাধারণ ভোট দিয়ে বেশির ভাগকেই জয়যুক্ত করলেন যাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন।

শিল্পায়ন ও নাগরিকীকরণের প্রভাব

প্রকৃত দৃশ্যমান সামাজিক পরিবর্তন ১৯৫৯ সাল থেকে লক্ষিত হল যখন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে আরম্ভ হল। ভূমিহীন এবং উদ্বৃত্ত মজদুরেরা চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, খুলনা এবং অন্যান্য কয়েকটি নতুন শিল্পএলাকায় এসে ভিড় করতে লাগল। গ্রামবাসীরা কেবলমাত্র কলকারখানাগুলিতে নয়, তারা কাজ করার সুযোগ নতুন শহরগুলিতেও পেল। সেখানে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি আর পুরাতন রাস্তাগুলিকে ক্রমাগত প্রশস্ততর করা হচ্ছিল যানবাহনের আধিক্যজনিত অসুবিধা দূর করার জন্য। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এখন হাজার হাজার ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি জেলা-সদর এখন পাকা রাস্তার মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বন্দরগুলির কর্মব্যস্ততা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। গ্রামবাসীরা এখন মোটরলঞ্চ ও মোটরযানে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেছে ; চারপাশের দ্রুততা ও উত্তেজনার অনুভূতি তাদের পেয়ে বসেছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকার সনাতন ধারণা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সমবায়ভিত্তিক লেনদেন এবং ধর্মঘট করার অধিকার তাদের সম্মুখে খুলে দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত এবং উত্তরোত্তর তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদক্ষ গ্রাম্য লোক শিল্প ও শহর এলাকায় এখন কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। গ্রামের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকায় তারা বাংলার গ্রামবাসীদের চিন্তা ও ধারণাকে

www.nagorikpathagar.org

প্রভাবিত করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন মাত্র পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল হওয়ায় এবং এখানকার জনবসতি অত্যন্ত ঘন হওয়ার দরুন পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় এখানে নতুন সভ্যতার প্রসার খুবই দ্রুতগতিতে হচ্ছে। অতএব যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাধীনতার পর থেকেই শিল্পায়ন হতে আরম্ভ করেছে, তবু সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মতো ততটা শহুরে ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারেনি সুদূর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা।

কলকারখানা ও শহরে যারা কাজকর্ম করছে সেইসব লোকদের অর্জিত টাকা গ্রামে যাওয়ায় সেখানকার জীবনযাত্রায় উদ্ভব হচ্ছিল একটি নতুন মানের। টাকার এই গতি অবশ্য ব্যাহত হচ্ছে। কারণ আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামগুলিতে চুরি ও ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতি লোকেরা তাদের পরিবারকে শহরে নিয়ে আসছে। শহরে রেশনপ্রথার দরুনও অনেক পরিবার সেখানে চলে যাচ্ছে। জমির উপর লোকের আসক্তি কমে গেছে ; কারণ উদ্বৃত্ত অঞ্চলে ধান-পাটের বাজারদরের কোনো নিশ্চয়তা নেই অথচ কলকারখানার শ্রমিকদের আয় অধিকতর নিশ্চিত। গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে—তা চলে যাচ্ছে শহরে। আইয়ুব সরকার নেতৃত্ব থেকে রাজনীতিকদের বের করে দেবার জন্য ও সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের হাত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বর্তমান অবস্থায় আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরা মজদুর শ্রেণীর নেতৃত্ব করতে অপারগ হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে একজন মজদুরের কোনো মূল্য না থাকলেও বহুর মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় সে অপেক্ষাকৃত সাহসী নেতৃত্বদানে সক্ষম।

এই নতুন সমাজের কাছে ধর্মের জনপ্রিয় আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের এখন বিশ্বাস যে কেবল খোদার উপর নির্ভরশীল হওয়া তাদের পক্ষে নিরর্থক। যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে চুক্তির মাধ্যমে তারা তাদের আয় বাড়াতে পারে, চাকুরির অবস্থারও উন্নতিসাধন করতে পারে। এই বিশ্বাস গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছেছে ; সেখানকার লোকেরা এখন চাষের জন্য বৃষ্টির ভরসায় বসে না থেকে তাদের জমিতে সেচের প্রয়োজনে দাবি জানাচ্ছে নলকূপের জন্য। আল্লাহ্‌র দরবারে আর্জি না করে সরব দাবি জানাচ্ছে সরকারের কাছে পূর্ত কাজের জন্য। অধিক পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী হলে তাদের দৈব বা অজ্ঞাত শক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমে যাবে। বুভুক্ষার তাড়না বাংলাদেশে নতুন নয় ; কিন্তু নতুন হচ্ছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক বিশেষত যারা শহর বা শিল্পএলাকার অধিবাসী। এরা আর প্রস্তুত নয় দুঃখ-দুর্দশাকে পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যের লেখা বলে স্বীকার করে নিতে।

পূর্ব পাকিস্তানে বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠার গতিবেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট ছোট শিল্পের মালিকেরা আর কৃষকরা পরিণত হচ্ছে নিঃস্ব মজদুরশ্রেণীতে এবং এর দরুন গ্রাম্য লোকের সংখ্যা অবিরত বেড়ে যাচ্ছে শহর ও শিল্পএলাকাগুলিতে। পুঁজিবাদের উদ্ভবে সূচিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রভূত সম্পদ ও বিলাসিতার ক্রমবৃদ্ধি এবং শ্রমিকসমাজের দারিদ্র্য ও তাদের উপর অত্যাচারের দ্রুত

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রসারণ। কিন্তু পুঁজির সাহায্যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাতে গিয়ে বড় বড় কলকারখানাগুলিতে এক বিশেষ শ্রেণীর কর্মীর সৃষ্টি হচ্ছে, যারা পুঁজিবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সক্ষম। তাদের জীবনের পুরাতন পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত এবং শ্রমের মাধ্যমে তারা সব শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করে কারখানা থেকে কারখানান্তরে পাঠিয়ে দৃঢ়ভাবে মেহনতি জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে যাচ্ছে। পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। এবং তাদের মধ্যে একত্র হবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে পাটকল শ্রমিকদের চুয়ান্ন দিনব্যাপী ধর্মঘট এবং তাদের প্রতিটি শর্ত আদায়ে সাফল্য উপরোক্ত যুক্তিগুলির সপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ব্রিটিশ ও মার্কিন আদর্শ অনুসরণকারী কিছু লোকের ধারণা শিল্পসংক্রান্ত গণ- তন্ত্রের সম্প্রসারণ ঐ দুই দেশের পদ্ধতি অনুসারে হওয়া উচিত। অন্যান্যদের মতে এ- জাতীয় সম্প্রসারণের কিছুটা অর্থ হয়তো থাকতে পারে ইউরোপ বা আমেরিকায়, কারণ সেখানকার সমাজ হচ্ছে অখণ্ড। কিন্তু যে-সমাজে মাটি থেকে পুঁজিবাদের জন্ম হয়নি, সেখানে তা নিরর্থক হবে। সুতরাং মালিকের কি পরিমাণ লাভ হচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন ও অন্যান্য সুবিধার ন্যূনতম পরিমাণ কত—তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সরকারের। একশ্রেণীর শিল্পপতিদের যুক্তি হল অনুন্নত দেশগুলির ক্রমবিকাশশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যৌথ লেনদেনভিত্তিক আইন অনুমোদন করা উচিত নয়। তাদের মতে বেতন নির্ধারণ পরিষদের রোয়েদাদ স্বীকার করে নেওয়া এবং দেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কাজ করার জন্য শ্রমিকদের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানে পাটকলগুলি স্থাপিত হবার পর পাটের দর পড়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ পাটচাষী অনাহারে ও বস্ত্রহীন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। শিল্পপতিরা যাতে দ্রুত লাভবান হতে পারে সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাটকলগুলি স্থাপিত হবার পর থেকেই বাজারে পাট আমদানি হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিদেশী, বিশেষ করে ভারতীয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বাতিল করে দেবার নিয়ম প্রবর্তন করলেন। খরিদের সময় প্রতিযোগিতা না থাকায় দেশের পাটকলের মালিকরা তাদের প্রয়োজনমতো পাট অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকার ও শিল্পপতিদের মধ্যে এই চক্রান্ত মানুষের জীবনকে এতই দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল যে, তারা সব উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলে পরিচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ইংরেজরা চাষীদের বার্মায়, আসামে, এমনকি মালয় দেশেও পাঠাত। এখানকার লোকেরা সর্বোৎকৃষ্ট সমুদ্রগামী নাবিক বলে বিবেচিত হত ; এই পেশায় কমপক্ষে দু'লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকরা আসামে তেলের খনিতে, আসানসোল ও বিহারে কয়লার খনিতে কাজ করত। জামসেদপুরে ইস্পাতের কারখানায় তারা অপরিহার্য বিবেচিত হত, ভারতের অন্যান্য অংশে এবং যুক্তরাজ্যের কলকারখানার মালিকরা তাদের নিযুক্ত করত। কিন্তু স্বাধীনতার পর তারা অদক্ষ ও অক্ষম হয়ে পড়ল। অনাহার ও অর্ধাহারে অপুষ্ট কৃষিজীবী ও শ্রমিক কৃষি ও শিল্প উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

www.nagorikpathagar.org

অবিলম্ব লাভের উদ্দেশ্যে সরকার ও শিল্পপতিদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। স্বাধীনতার সময় পূর্ব পাকিস্তানে ১০.৩ লক্ষ টন পাট উৎপন্ন হত আর পৃথিবীতে তার চাহিদার পরিমাণ ১০.৫ লক্ষ টন ছিল। ঐ চাহিদার পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ টন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে পাটের উৎপাদনের পরিমাণ রয়ে গেছে সেই ১০.৩ লক্ষ টন। ভারতে যেখানে পূর্বে উৎপন্ন হত মাত্র ৩ লক্ষ টন পাট, এখন সেখানে হচ্ছে ১০.৫ লক্ষ টন। বার্মা, চীন, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল এমনকি সোভিয়েত রাশিয়াতেও এখন পাট উৎপন্ন করা হচ্ছে ; তবু পৃথিবীব্যাপী পাটের চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে, অন্তত আগামী পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শিল্পপতিদের উপকারের জন্য পাটের কোনো চাহিদা নেই, পাটের বিকল্প বস্তু উদ্ভাবিত হয়েছে—এজাতীয় তথ্য পাকিস্তান সরকার সদাসর্বদা প্রচার করে প্রকৃত অবস্থা দেশবাসীর কাছে গোপন রেখে যাচ্ছিলেন এবং ফলে বিশ্বের বাজারে পাকিস্তান একটি মূল্যবান জিনিসের উপর তার একচাটিয়া অধিকার হারিয়েছে।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংঘাতে ভেঙে পড়ছে পূর্ব পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিত্বভিত্তিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত সমাজের পুরাতন নিয়ম-কানুন। কিন্তু এখন আমাদের উপলব্ধি করার মতো সময় এসেছে যে, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি তাসের ঘরের মতোই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে—যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয় আমাদের নতুন অর্থনীতির ভিত্তি। আমাদের ভুললে চলবে না যে, শহরগুলি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী উৎপাদনকেন্দ্র।

ভারত থেকে ছিন্নমূল হয়ে এবং আমাদের গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে চলে এসেছিল যারা নতুন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে, তাদের আপন আপন স্বার্থের যোগাযোগ হয়েছিল বলেই এরা হল আমাদের সমাজের বুর্জোয়া আর পাতি বুর্জোয়া। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসনামলে এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চল ছিল। বুর্জোয়া সমাজ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করল, কিন্তু আমাদের বুর্জোয়ারা বেশির ভাগই হচ্ছে বহিরাগত এবং অন্যান্য দেশের বুর্জোয়ার অনুরূপ তারা সমাজেরই সম্প্রসারিত অংশ নয়, অতএব আমাদের বুর্জোয়া বিপ্লব কিছুটা অস্বাভাবিক হতে বাধ্য।

সম্পদ পুঁজি নয়, উৎপাদনের সংস্থান পুঁজি। ভূমি যেমন সামন্ততান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার সংস্থান, তেমনি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্থান হচ্ছে পুঁজি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল ভূমিদাসদের উৎপাদিত বস্তুর বাড়তি অংশ ভোগদখল করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা অনেকটা তেমনি হলেও সে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী এবং পূর্বের চেয়ে তাই স্বাধীন ; কারণ সে তার মেহনতি ক্ষমতাকে বিক্রয় করে প্রতিযোগিতামূলক দরে এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মজদুরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশে শ্রমিকেরা এখন কাজ করতে পারছে। সুতরাং মজদুর শ্রেণীর উন্নতিবিধান পুঁজিবাদী স্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ ; কারণ উক্ত ব্যবস্থায় বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয়। সামন্তপ্রথায়

www.nagorikpathagar.org

ভূস্বামীদের বিক্রয় করার মতো কিছু ছিল না ; কাজেই চাষীদের হাতে টাকা না থাকার প্রশ্ন তাদের নিকট অবান্তর ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদীকে তার মাল বিক্রয় করতে হবেই ; অতএব শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তাকে অপেক্ষাকৃত সমভাবে বণ্টন করতে হবে—যাতে সমাজের শ্রমজীবীরা পুঁজিবাদীর নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করতে সক্ষম হয়। এই কারণেই পুঁজিবাদ সমান্ততন্ত্রের তুলনায় অধিকতর প্রগতিশীল—যদিও শ্রমিকদের শোষণ করার নীতির উপর উভয় ব্যবস্থারই ভিত্তি গড়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রে শ্রমিকদের উপার্জনের পরিমাণ যেমন অপেক্ষাকৃত বেশি, তেমনি তার ব্যয় করার ক্ষমতাও বেশি। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ব্যয় করার ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাবে, প্রসারমান ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদীদের লাভের পরিমাণও তেমনি স্ফীত হতে থাকবে এবং সেইসঙ্গে পুঁজিবাদীদের দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধি হবে। একটি সদাপ্রসারমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা যে শিল্পায়নের প্রাথমিক শর্ত, পূর্ব পাকিস্তানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে আমরা সেকথা বিস্মৃত হয়েছিলাম। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। একথা বিবেচনা করা হয়নি যে, কেবলমাত্র বিনিময়ের জন্য নয়—সমাজের দশজনের প্রয়োজনের খাতিরেই বিশেষ করে পণ্য উৎপাদন করতে হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কোনোরূপ বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি, যার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করা যেত। এর ফলে এই অঞ্চলে দ্রুত শিল্পায়নের এক দশক অতিক্রান্ত হবার পর এখানকার জনসাধারণকে অনহার ও অর্ধাহারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষিত। সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে পুনরায় নতুন করে সংগঠিত না করলে কেবলমাত্র গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই যে ধসে পড়বে তা নয়, বরং শিল্পায়নের নবব্যবস্থার ধ্বংসও অনিবার্য।

পূর্ব পাকিস্তানী বামপন্থীরা, যারা প্রলেতারিয়াঁদের বিপ্লব সম্বন্ধে চিন্তা করছে, এখানকার অর্থনৈতিক কতকগুলি দিকে তাদেরও দৃষ্টি থাকা উচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই একটি করে মজদুরশ্রেণী বর্তমান। কিন্তু প্রলেতারিয়াঁ সমাজ পুঁজিবাদী সমাজেরই সৃষ্টি। প্রত্যেক প্রলেতারিয়াঁই মজদুর, কিন্তু মজদুরমাত্রেই প্রলিতারিয়াঁ নয়। প্রলেতারিয়াঁ হচ্ছে সেই শ্রেণীর লোক যারা উৎপাদনের পুঁজিস্বরূপ পুঁজিভিত্তিক এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রম বিনিয়োগ করে। তাদের এই পুঁজি টাকার আকারে নয়, বরং হাতিয়ার এবং যন্ত্রপাতির আকারে। ভূমিহীন শ্রমিক তখনই প্রলেতারিয়াঁ পর্যায়ভুক্ত হয়, যখন ভূমিতে তার মালিকানা পুনরুদ্ধারের সমস্ত সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তা ঘটে থাকে, যখন কৃষিকাজ পরিণত হয় বিরাটাকার শিল্পতে এবং যখন ছোট একটুকরো জমিতে কৃষিকাজ আর লাভজনক থাকে না, কেবল তখনই ভূমিহীন কৃষক জমির মালিকানার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

উপরোক্ত মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে—আমাদের দেশে এক লাখের বেশি প্রলেতারিয়াঁ নেই, অন্যান্যরা এখনও গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় রেখে

www.nagorikpathagar.org

যাচ্ছে। ধর্মঘটের সময় তারা বাড়ি চলে যায়, গ্রামে ফেলে আসা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তাদের উপার্জনের একটা অংশ পাঠিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাদের এই সম্পর্ক যতদিন বর্তমান থাকবে, ততদিন তারা প্রলেতারিয়াঁর পর্যায়ভুক্ত হবে না এবং প্রলেতারিয়াঁ বিপ্লবও সম্ভবপর হবে না। বুর্জোয়া বিপ্লব পূর্বাহ্নে সংঘঠিত না হলে প্রলেতারিয়াঁ বিপ্লব অপরিণত হতে বাধ্য। আমাদের সমাজের সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এগুলি সর্বদাই একে অপরের দ্বারা অধিক্রান্ত। বিরাট আকারে যান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার প্রবর্তন, উৎপাদনের উপর থেকে প্রাক-পুঁজিবাদী সর্বপ্রকার বাধা-নিষেধের বিলোপসাধন, ন্যূনতম যে-কোনোরূপ অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন এগুলি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের পূর্বশর্ত।

আদিম গণসাম্যবাদ বঙ্গদেশের সামাজিক রীতি ছিল। দাস শ্রমিক বা শূদ্রদের ধারণার প্রবর্তন আর্যরা করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে মানবতার দিকে পরিচালিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলেরা শোষণের জন্য সামন্ততন্ত্রের প্রচলন করেছিল, ব্যবসাদারি-পুঁজিবাদ ইংরেজদের সঙ্গে এসেছিল এদেশে এবং বর্তমানে আমরা আমাদের সমাজের উপর শিল্প-পুঁজিবাদের ফল অনুভব করছি।

মানুষ জন্ম থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তার সমগ্র জীবন হচ্ছে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার সংগ্রাম। ভয় আর অভাব হচ্ছে দু'টি সবচেয়ে কঠিন শৃঙ্খল, যা মানুষকে ভাঙতে হবে নিজকে মুক্ত করার জন্য। দুনিয়া যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন তাকে নতুন করে গড়তে হবে এবং পুনর্জাগরণের কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সত্য, যে সত্য হচ্ছে মানুষ নিজেই গড়ে তোলে তার ভাগ্যকে। যতক্ষণ না সত্য সর্বস্তরে গৃহীত হবে যে, সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি এবং নিজের প্রচেষ্টায় মানুষ আবার তাকে ভেঙেও ফেলতে পারে—ততক্ষণ সমাজ-বিপ্লব আসবে না।

পূর্ববাংলার গ্রামের মেহনতি মানুষের বিবর্তন

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক-সমস্যাটিকে এর অধিবাসীদের ইতিহাসের পটভূমিতে প্রণিধান করতে হবে। আর্যসমাজ বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর স্ব স্ব কর্তব্য ছিল—ধর্মপ্রচার কিংবা দেশরক্ষা অথবা ব্যবসায় কিংবা কৃষিকাজ। নিজ কর্তব্যে প্রত্যেককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তার বেশি আর কিছু আশা করতে পারবে না। শ্রেণীর মধ্যে সমত্ব থাকলেও শ্রেণীগুলির পরস্পরের মধ্যে অসাম্য বিদ্যমান ছিল। ইসলামিক সমাজে ধর্ম এবং দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে কোনো নিশ্চিত বিভাগ নেই ; এটা ধরে নেওয়া হয় যে, প্রতিটি কর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিচারের অধীন। সকল অর্থনৈতিক স্বার্থ হচ্ছে বিবেকনির্ভর—যার ফলে যেমন ব্যক্তিগত আচরণে তেমনি অর্থনীতিতেও নৈতিক নিয়মাবলীর বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে। সুদ নেওয়া বা দেওয়া নিষিদ্ধ এবং শ্রমিকের নির্ধারিত মজুরি তার শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই দিতে হবে—এ-ই ইসলামের নির্দেশ। অতএব কাজের ন্যায্য মূল্যের ধারণা

www.nagorikpathagar.org

দ্রব্যমূল্যের কম বা বৃদ্ধি কিংবা চাহিদা ও সরবরাহ নীতির দ্বারা প্রভাবিত নয়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ স্থাপিত হয়েছিল পরিবারের ধারণার উপর। কেবলমাত্র পিতামাতা এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং তাদের আদেশ-নির্দেশই যে কেবল বাধ্যতামূলক ছিল তা-ই নয়, সামন্ত প্রভু এবং সর্বশেষে আল্লাহ্‌র প্রতিও অনুরূপ মনোভাব সামন্ত্রতন্ত্রের অঙ্গীভূত ছিল। সমাজের একেবারে তলদেশ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি বা শ্রেণী অনুভব করত যে, তাকে বা তাদের রক্ষা করার জন্য কেউ-না-কেউ তাদের উপরে আছেন। কিন্তু শিল্পপণ্যোৎপাদক এবং প্রতিযোগিতামূলক সমাজে অনুরূপ নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার অনুভূতি বিদ্যমান থাকতে পারে না। যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের নীতি সর্বপ্রকার উৎপাদনের মূলনীতিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদনের উপায় থেকে বর্তমানে শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন কারিগরদের ভাড়াটে শ্রমিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শিল্পায়নের দরুন এক নতুন শ্রেণীর মজুরি অর্জনকারীর উদ্ভব হচ্ছে, যারা নতুন কলকারখানাগুলির চাহিদানুযায়ী অর্জন করেছে নানাবিধ প্রকৌশলিক দক্ষতা ; যারা ভূমিহীন, সম্পত্তিবিহীন এবং জীবিকার জন্য মজুরির উপর নির্ভরশীল। এশিয়ার কলকারখানার শ্রমিক প্রধানত কৃষিজীবীদের মধ্যে থেকে যোগাড় করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতিসম্বলিত নতুন কারখানাগুলি এবং বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিশ্রমিকদের মজুরির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে তাদের শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে সক্ষম। এতে লোক আকৃষ্ট হয় কলকারখানার চাকুরির প্রতি। তাই গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে অনেকে। পেশাদার শ্রমিকের নিজেদের সন্তানসন্ততি দিয়ে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি করার সময় এখনও আসেনি। দু'দশক যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে কৃষিসমাজ থেকে অনবরত লোক আসছে কলকারখানায় মজুরি করতে। এ অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন শিল্পায়নের অবস্থা সুস্থ্ হবে না। কর্মবিমুখতা আর সদা-সর্বদা ধর্মঘটের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু শিল্প-মালিক ও পরিচালকদের এ বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ আছে বলে মনে হয় না।

শিল্পায়নের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন—যা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে অনুপস্থিত। প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে জনস্ফীতি। বিপুল জনসংখ্যা এবং চাকুরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার দরুন মজুরি হয়েছে সস্তা এবং মজুরির স্বল্পতা হলে শ্রমিকরা অপুষ্ট হবে এবং অপুষ্ট শ্রমিকমাত্রেই অপেক্ষাকৃত কম কর্মক্ষম হবে। কারখানার অধ্যক্ষরা অদক্ষ ও ভগ্নস্বাস্থ্য শ্রমিকদের ভাল মজুরি দেন না। এইভাবেই এক অসৎচক্রের সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ শ্রমিককেই তাদের পরিজনবর্গের সান্নিধ্যচ্যুত হয়ে দূর শহরে বাস করতে হয় বলে তারা আরও অধিক পরিমাণে মরিয়া হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ—তা নিজের স্ত্রী-ই হোক, ভগ্নী বা মা-ই হোক—মানুষকে দেয় অধিকতর দায়িত্বশীলতাবোধ। কৃষকদের সমাজে একপ্রকার একাত্মবোধ ছিল। সে তার জমিদারকে মুনাফাখোর হিসেবে বিবেচনা করত না। অমানুষ না হলে, সেই জমিদারকে সে শ্রদ্ধা-

www.nagorikpathagar.org

ভক্তিও করত। মালিক আর শ্রমিক উৎপাদনকাজে সমান অংশীদার নয় এবং তাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এ ধারণার দরুন শিল্পোৎপাদনকারী সভ্যতায় উপরোক্ত মনোভাব বর্তমানে অনুপস্থিত।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে পূর্ব পাকিস্তানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনা করত। কাপড়ের কলের শ্রমিক, জাহাজি লস্কর, চা-বাগানের মজুর, জাহাজি কর্মচারী, বিদ্যুৎ কারখানার মিস্ত্রি, নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী, চিনির কলের মজুর, ঝাড় দার, কৃষক—এদের প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কর্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেল ; পূর্ব পাকিস্তানের মজদুর সঙ্ঘগুলি তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কয়েকজন মুসলিম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, যাঁরা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুসারী কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ছিলেন—তাঁরা শূন্যস্থান পূরণ করতে চেষ্টা করলেন। তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নিজমকে মোটামুটিভাবে জীবনের ধারা এবং বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁদের আয়ের বেশির ভাগই মালিকদের নিকট থেকে আসত—যারা ঘুস দিয়ে শ্রমিকনেতাদের মুখ বন্ধ করে রাখত। কৃষকদের নির্ভর করতে হল তাদের ভাগ্যের উপর। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং তাঁর সহকর্মীরা পূর্ব পাকিস্তানে বহুদিন ধরে যে বিরাট কিষান আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন—তা এখন অর্ধমৃত। কৃষকদের দুর্গতির অন্যতম কারণ হল স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এদেশে কৃষক সংগঠনের অভাব। ন্যাপ (NAP) নেতা মৌলানা ভাসানীর কিষান সংগঠনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ কতদূর হয়েছে বলা কঠিন। মৌলানার মধ্যে সংগঠনক্ষমতার অভাব আছে বলে সবাই স্বীকার করেন। তিনি জনসভায় বক্তৃতা আর সংবাদপত্রে বিবৃতিদানের উপর অতিরিক্ত রকম নির্ভরশীল ; তাই লক্ষ লক্ষ কৃষক কর্মী আজও অসংগঠিত। কেবলমাত্র নির্বাচনের সময় তারা হয়ে ওঠে জয়লাভের চাবিকাঠি, নির্বাচন শেষ হওয়ামাত্র তারা বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যায়। কৃষক সমিতির নেতারা অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা দাবি করেন, কৃষকেরা সংগঠিত হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের অভ্যুদয় হবে একটি সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে।

পূর্ব পাকিস্তানী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল এ অঞ্চলে স্থানীয় শিল্পপতিদের অভাব। তাঁদের যুক্তি হল বিদেশী শিল্পপতিরা, যারা পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি নিয়োগ করেছে এবং এখনও করছে, তারা স্থানীয় শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে না। তারা এখানে এসেছে প্রধানত এখানকার কাঁচামাল নিজ নিজ স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য এবং সেইসঙ্গে স্থানীয় শ্রমিকদেরও। পূর্ব পাকিস্তানের মজুদর জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হয়ে উঠেছে ; কারণ এখানকার শিল্পক্ষেত্রে শিল্পপতিদের প্রায় সবাই নবাগত। এদের কারুর পিছনে শিল্পের ঐতিহ্য নেই। বেশির ভাগ শিল্পপতি প্রথমে বার্মায় পুঁজি নিয়োগ করেছিল, কিন্তু সেখানে জাপানি অভিযানের দরুন অসুবিধা দেখা দিলে তারা ভারতবর্ষে চলে যায় এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর বিশ্বের বাজারে তার পাটের একচেটিয়া ব্যবসার পরিপ্রেক্ষিতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করে। এমনও সম্ভাবনা আছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনোরূপ অসুবিধা

www.nagorikpathagar.org

দেখা দিলে তারা এ প্রদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে পারে অন্য কোনো অঞ্চলে বা দেশে। অনুরূপভাবে পাঞ্জাব থেকে যেসব ব্যবসায়ী এখানে এসেছে তাদেরও পূর্ব পাকিস্তানীদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই, তাদের একমাত্র আকর্ষণ হল এখানে এসে আয়কর থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ। লাভের টাকা এখান থেকে তাদের নিজেদের প্রদেশে পাঠিয়ে দিতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিছুসংখ্যক ইরানি পরিবার ভারতে এসে ব্যবসায়ীশ্রেণীভুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। পাকিস্তান হবার পর থেকে তারা শিল্প গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেছে। অন্য এক সম্প্রদায়ের লোকেরাও পূর্ব আফ্রিকা থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছে। মেমন, ইসমাইলি, ইরানি, চিনিয়টি প্রভৃতি বরিহাগত সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের পুঁজি নিয়োগ করেছে। যেহেতু তারা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, মুসলিমপ্রধান পূর্ববাংলায় তারা সুযোগ ও সুবিধা স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেছে। ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা মুসলিম শ্রমিকদের শোষণ করতে সক্ষম। এখানে তারা নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলেছে, তাদের চলাফেরা ও আলাপ-আলোচনা নিজেদের মধ্যেই সীমিত। তারা এমন একটি পুঁজিবাদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যার কোনো স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ নেই।

তাদের নিজ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর উপকারের জন্য স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করেছে। এই দেশ ও জনসাধারণ থেকে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, এমনকি ভারতবর্ষেও ধনতান্ত্রিক সমাজের অবস্থা অনুরূপ। ঐসব দেশে ধনীরা জাতির অংশ এবং অঙ্গবিশেষ। তাদের উত্থান-পতন জাতির উত্থান-পতনের অনুগামী ; তারা দেশত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে পারে না, এমনকি যুদ্ধ, পরাভব, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদির হুমকি সত্ত্বেও। এখানে যৎসামান্য আন্দোলন দেখা দিলেই পুঁজি নিয়োগকারীরা পুনরায় ভেবে দেখতে শুরু করে—তারা সরে পড়বে কি না। এমনকি, সময়-সময় তাদের সম্পদ ও পুঁজি সত্য সত্যই স্থানান্তরিত করে ফেলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অপরিমিত লাভ অর্জন এবং মানুষের জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য এজাতীয় মনোভাবের জন্য দায়ী। যতক্ষণ তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে ততক্ষণ তারা শ্রমিক হাঙ্গামার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। এদেরই নিয়োজিত দালালরা ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব করে এবং যতদিন পর্যন্ত তাদের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ না হয়, ততদিন এরা তাদের অর্থ জুগিয়ে যায়। এর ফলে কোনোরূপ প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আজও গড়ে উঠতে পারেনি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক পূর্বেই মতোই তিক্ত রয়ে গেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের উপরোক্ত সমালোচনাসমূহ সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ লোকের ধারণাও অনুরূপ। তাদের বক্তব্য হল, গণতান্ত্রিক দেশসমূহ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, দেশের যে-কোনো অংশে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হলে দেশের সমৃদ্ধি সর্বত্র বিপন্ন হয়ে পড়ে ; তারা তাদের কলকারখানাগুলির উন্নতি-বিধানে যতখানি সচেষ্ট তেমনি দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি আনয়নের ব্যাপারেও আগ্রহশীল। এই কারণেই অন্যান্য দেশের শিল্পায়ন সেখানকার জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তার অর্থ দাঁড়িয়েছে সমগ্র জাতির সমৃদ্ধির পরিবর্তে শুধুমাত্র কয়েকটি পরিবারের আয়বৃদ্ধি। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতিদের মত অবশ্যই এর বিপরীত। তাদের বক্তব্য হল—দেশের সমৃদ্ধি সর্বত্রই বর্তমান, তা লক্ষ করার মতো দৃষ্টি থাকলেই বোঝা যায়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অধিকসংখ্যক লোকের জামা ও জুতার ব্যবহার, সস্তা মোটরসাইকেল ব্যবহার, সিনেমা হলগুলিতে জনতার ভিড় তাদের উপরোক্ত দাবিকে সমর্থন করে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শিল্পায়ন ব্যতীত এই সমৃদ্ধি, অতএব পৌরায়ণও সম্ভবপর হত না। এদেশের কলকারখানাগুলিতে শতসহস্র ভূমিহীন শ্রমিকের চাকুরির সংস্থান হয়েছে, যার দরুন ভূমির উপর থেকে অনেকটা চাপ হ্রাস পেয়েছে।

বিদেশী শিল্পপতিদের অভিযোগ যে, বাঙালিদের মধ্যে উদ্যমের অভাব ; সিদ্ধিলাভের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করতে তারা অক্ষম। নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের ইচ্ছা, নেই, এমনকি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেও তারা মোটেই আগ্রহী নয়। স্বাধীনতালাভের পর থেকেই শারীরিক, মানসিক এবং বোধশক্তির দিক থেকেও তাদের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। পাকিস্তানলাভের পূর্বে যেসব মন্তব্য মুসলমানদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল, তা বর্তমানে বাঙালিদের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তানের অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে অথচ পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছে প্রাণবন্ত, রূপান্তরিত হয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য রীতির অনুসারী এক নূতন সমাজের বাসভূমিতে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা কঠোর পরিশ্রম করেছে শুধু নিজেদের জন্য নয়—তাদের সমাজের জন্যও।

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম দশকে পুঁজিপতিদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকদের একপ্রকার অস্পষ্ট ঘৃণা ছিল ; কিন্তু দ্বিতীয় দশকে তারা বুঝতে আরম্ভ করেছে—শ্রমিক-সমাজ আর পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান স্বার্থের সংঘাতকে। অত্যাচার সম্পর্কে বিভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হয়ে কি উপায় এবং পন্থাবলম্বনে পুঁজিবাদীর জুলুম তাদের উপর নেমে আসে, তা তারা নির্ধারণ করতে শুরু করেছে এবং নানাবিধ জুলুমের প্রতিবাদ-স্বরূপ তারা বিদ্রোহও করেছে। তারা এখন নানাবিধ সুবিধা দাবি করছে। তাদের দাবি—কাজকর্মের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা, অধিকতর বেতন, কাজের সময়-হ্রাস। প্রতিটি ধর্মঘটই উপরোক্ত শর্তাবলী আলোচনার জন্য প্রস্তুত করে উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাদের প্রকৃত মূল্যায়নে শ্রমিকদের সহায়ক হয় এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপায়ের প্রকৃত সন্ধান দেয়। এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে শ্রমিকদের শক্তির পরীক্ষা হচ্ছে। তারা সংগঠনের কাজ শিখছে। এই সংগ্রামের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং বারংবার সংঘাত শ্রমিকদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অধিকতর দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের দিকে, তাদের মধ্যে ঐক্যের ধারণাবৃদ্ধির দিকে এবং সংহতির দিকে।

সাধারণ জীবনের দুর্নীতি, কুশাসন আর সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা ভুক্তভোগী শহরবাসী শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করছে। তার বেতন কম, অথচ দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি একপ্রকার চিরস্থায়ী অবস্থা, তা ছাড়া তাকে সাহায্য করতে

www.nagorikpathagar.org

পারে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থারও একান্ত অভাব। দেশী কিংবা বিদেশী পুঁজিপতিদের অধীনে তাকে কাজ করতে হয়, তার নিজের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনধারণের ব্যবস্থা আর মনিবের লাভের মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য রয়েছে—সে সম্বন্ধে তার সম্যক জ্ঞান আছে।

শ্রমিকদের মধ্যে যেটুকু সংগঠন আছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর স্বল্পবেতনভুক সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তাও নেই, যদিও মুদ্রাস্ফীতির দরুন তারাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্থ। শিক্ষা অর্জনের জন্য তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে বলে শ্রমিক ও কৃষকদের তুলনায় প্রায়ই তাদের বেশি ব্যর্থতায় ভুগতে হয়। এর ফলে বেকার কিংবা নিম্নপদস্ত বুদ্ধিজীবীরা ঝুঁকে পড়ে নতুন ভাববাদ গড়ে তুলতে। তারা প্রায়ই ঈশ্বরের বিকল্পে মানবতাবাদের এবং অধিবিদ্যার পরিবর্তে বিজ্ঞানের সমর্থনে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল।

বর্তমানে যে আন্দোলন সমাজকে উত্তেজিত করছে তা অন্যান্য ভূতপূর্ব আন্দোলনের চেয়ে পৃথক। বিত্তহীনদের চেতনাপ্রাপ্তির চেয়ে তা কোনো অংশেই কম নয়, উত্থানোন্মুখ এই শক্তির সম্মুখে ক্ষমতাশীল শ্রেণী এখন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর। সমাজবাদী ছাড়া অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এখনও বিশ্বাস করে যে, বিপ্লব নয়—বিবর্তনই নির্ধারণ করবে মানবসমাজের অগ্রগতিকে। সমাজ-বিজ্ঞানীদের অভিমত হল শ্রেণীবিদ্বেষ ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্থান দখল করছে। একথা অবশ্য তারা স্বীকার করে যে, শ্রমিকরা প্রায়ই তাদের মনিবদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়ে এবং একে অন্যকে হত্যাও করে থাকে ; কিন্তু এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।

উপরোক্ত কারণসমূহের দরুন পূর্ব পাকিস্তানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে পারে না। এখন সময় এসেছে তথাকথিক বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সন্তুষ্ট না থেকে রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে সমাজবাদীদের জন্য এইসব সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার। কারখানায় নিজেদের স্বার্থ, মসিজীবীদের স্বার্থ, শ্রমিকদের স্বার্থ, চাষীদের স্বার্থ সবই নিহিত রয়েছে জাতীয় মঙ্গলের মধ্যে। প্রতিটি নাগরিক অপরের উপর নির্ভরশীল এবং জাতির জন্য যা উত্তম তা সকলের জন্যই উত্তম এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্যও উত্তম। শ্রমিকসমস্যাকে অবশ্যই মানবতার সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। অনুন্নত দেশগুলিতে সংগঠিত কারখানার শ্রমিকরা সময়-সময় অসংগঠিত ভূমিহীন কৃষকদের উপর সুযোগ নিয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলির কাজ হবে এই ব্যতিক্রমের সমাধান খুঁজে বের করা।

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের আজাদি-উত্তর মনস্তত্ত্ব

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালিদের অবনতিসংক্রান্ত সমাজবিদ্যাগত হেঁয়ালির ব্যাখ্যা একমাত্র ইতিহাস আর মনোবিজ্ঞানের পটভূমিতেই সম্ভব। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভাবতে লাগল তাদের দেশ একান্ত তাদেরই নিজস্ব দেশ এবং তার সম্পদ

www.nagorikpathagar.org

ও সঙ্গতির সবটুকুর মালিক তারাই। সেনাবাহিনী, আমলা, পুলিশ সবই তাদের এবং তাদের নেতাদের অধীন। তারা দেখতে পেল, কিভাবে শিল্পপতিরা প্রাক্তন রাজধানী করাচি কিংবা অধুনা ইসলামাবাদে সরকারি দফতরকে ঘিরে ধরেছে এবং তাদের চোখের সামনে কেমন করে কলকারখানা গড়ে উঠল করাচি আর পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য শহরগুলিতে। বিদেশী দূতাবাসগুলি নিজেদের কর্মচারীদের বাসস্থান এবং দপ্তরের জন্য শত শত বাড়ি ভাড়া নিল এবং ঐসব দফতরে চাকুরি দিল তাদেরই ভাই-বেরাদরদের অনেককে। তারা তাদেরকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা করছে। তারা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিতে, দেশী কারখানা আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছে। যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজ হিন্দু আর শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল পাকিস্তান অর্জনের পর থেকেই তারা তা পেয়েছে। তাই স্বাধীনতার স্বাদ তারা উপভোগ করেছে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।

অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেনি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গভর্নররা, চীফ সেক্রেটারি, সেক্রেটারিরা সকলেই অবাঙালি ছিল এবং অধিকাংশ জেলা প্রশাসক পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলেন। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীরা অবাঙালি ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বারস্বরূপ ঢাকা প্রথমে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিল—যেখানে BOAC-এর বিমানগুলির নামবার অধিকার ছিল ; কিন্তু PIA সৃষ্টি হবার পর থেকেই সেটা পরিণত হয়েছে একটি ঘরোয়া বিমান-বন্দরে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে একচেটিয়া সকল যাত্রীকে বহন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে PIA-কে। ১৯৬৫ সালের পূর্বে ভারতীয় বিমান ঢাকায় আসত, যুদ্ধের পর তাও বন্ধ হয়েছে। তবে থাইল্যান্ডের বিমান আসা-যাওয়া করছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রথমে করাচিতে হয়েছে. তারপর রাওয়ালপিণ্ডিতে। সর্ব ব্যাপারে উর্দুকেই দেশের একমাত্র ভাষা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্ববাংলার জনসাধারণের কাছে এমন কোনো ইঙ্গিতে ছিল না যাতে তারা বুঝতে পারে—এদেশে তাদের করার মতো কোনো কিছু আছে। তারা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেনি। তারা যে একটি স্বাধীন দেশের অন্তর্গত এটাও তারা অনুভব করতে পারেনি। প্রতিটি ব্যাপারে তাদের নির্ভর করতে হয়েছে এমন এক সরকারের উপর যার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় একহাজার মাইল দূরবর্তী কোনো স্থানে এবং যাতে তাদের কোনো অংশ নেই। একমাত্র সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন বছরখানেক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তানীদের মনোভাবের কতকটা পরিবর্তন হয়েছিল। অন্য কোনো সময় পূর্ব পাকিস্তানী কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া দূরের কথা, সরকারে সমান অংশও গ্রহণ করতে পারেনি। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানীরা সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়নি। এই প্রদেশের অবস্থা উপনিবেশের মতো ছিল এবং উপনিবেশসুলভ নানবিধ ব্যাধি, যথা অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, শ্রমবিমুখতা, স্বার্থপরতা এ সবকিছুরই আগার ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এই ছিল স্বাভাবিক ; কারণ নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে তারা ছিল অক্ষম, তাদের ভালমন্দ দেখার ভার ছিল অপরের উপর। কি জাতীয়, কি আন্তর্জাতিক—কোনো নীতি-নির্ধারণে তাদের

www.nagorikpathagar.org

কোনো বক্তব্য ছিল না এবং বৃহত্তর বিষয়গুলির সম্পর্কে তাদের কোনো মতামতও গ্রহণ করা হত না।

স্বাধীনতার পূর্বে সমস্ত ভারতীয়দের যেসব অভিধায় ব্রিটিশরা বর্ণনা করত উদ্যমহীন, বুদ্ধিহীন, যোগ্যতাশূন্য বলে—বর্ণহিন্দুরাও মুসলমানদের সম্বন্ধে অনুরূপ বিশেষণ ব্যবহার করত বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। স্বাধীনতালাভের পরও পূর্বাঞ্চলের লোকেরা ঐরকম ব্যবহার পাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের নিকট থেকে। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের জাতীয় নেতারা সাধারণত তাদের পুরানো ঔপনিবেশিক প্রভুদের দোষাবলীর উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে, খুব সম্ভব তা স্বাভাবিক বলেই ; কারণ ব্যাধিই হচ্ছে সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। কি শ্বেতাঙ্গ কি অশ্বেতাঙ্গ, শাসকমাত্রেরই সর্বদা বিশ্বাস তারা অপেক্ষাকৃত চতুর, অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল এবং সর্ববিষয়ে তারা অতিমাত্রায় জ্ঞানসম্পন্ন। ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র সফল হবে না যতক্ষণ না শাসিতের উপর তাদের নিজেদের লোকদের আধিপত্য বিস্তারে উৎসাহ দেয়া যাবে।

এই প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে চেতনাহীন লোকেরা মনোনীত হয় এবং বুদ্ধিজীবীরা সেটাকে স্বাভাবিকভাবেই অপমান বলে মনে করে থাকেন। পাটচাষীরা অনুভব করে—তারা প্রতারিত এবং শোষিত, মজদুরশ্রেণীর মনোভাবও অনুরূপ। তাদের জন্য পাকিস্তান কোনো বাণী নিয়ে আসেনি। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান—যা স্বাধীনতার পর থেকে জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে, আইয়ুবশাহীর আমল পর্যন্ত তারা কেবল চেষ্টা করেছে জনসাধারণের মনে ভারতভীতি সর্বদা জাগরূক রাখতে এবং তারা যা কিছু করেছে—ইসলামের নামে খুঁজেছে তারই সমর্থন। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের অবনতি অনিবার্য ছিল।

ছ'কোটি লোককে রক্ষা করা অসম্ভব, যদি না হয় তাদের পুনরুজ্জীবন এবং তা সম্ভব হতে পারে একমাত্র তাদের একথা স্মরণ কারিয়ে দেয়ায় যে, তারাই তাদের ভাগ্যবিধাতা এবং নিজেদের প্রতি, দেশ ও মানবসমাজের প্রতি তাদের যে একটি বিশেষ কর্তব্য আছে—একথা তাদের বোধগম্য করে তোলার উপর। জনসাধারণের মনে দায়িত্বশীলতা জাগিয়ে তুলতে হবে, নচেৎ স্বাধীনতা বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থেকে যাবে।

কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি, যা এতদিন নিয়োজিত করা হত বস্তু-উৎপাদনে, বিশেষত কলকারখানায়, তা এখন দ্রুতগতিতে নব নব ক্ষেত্রে বিস্তৃত হচ্ছে। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য তথ্যাদির দ্রুত অগ্রসরমাণ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে—যার ফলে অফিসের বহুবিধ কাজ এখন সম্পন্ন হচ্ছে যান্ত্রিক উপায়ে। বাস্তব উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তা এবং অন্যান্য কারিগরি উদ্ভাবনগুলি ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যন্ত্রবিদ আর প্রকৌশলিকের কাজের উপর। সমগ্র শ্রমিকশক্তির অন্তর্গত অদৈহিক শ্রমজীবীর অংশ স্থির গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিরিক্ত পরিমাণে শিল্পায়িত দেশগুলি এইসব উদ্ভাবনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি অনুরূপভাবে প্রভাবিত হতে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বয়ংক্রিয়তা সম্প্রসারিত হবে মাত্রাতিরিক্ত রকমে ; তা যে শুধু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সত্যকে উপলব্ধি করার

www.nagorikpathagar.org

জন্য তা নয়, উৎপাদনের প্রচুর বৃদ্ধির সম্ভাবনা বহন করে আনবে—সেজন্যও বটে।

এইভাবে শিল্পায়িত জাতিগুলির গতিশীল উন্নয়নের বহিঃপ্রকাশের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে অদৈহিক কর্মীদের উপর যাদের সংখ্যা এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছে দেশের শ্রমিকশক্তির প্রায় অর্ধাংশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অদৈহিক শ্রমজীবীরা অনেক ক্ষেত্রে এখনও অতি বৃহৎ কৃষিজীবী জনসাধারণ এবং উদীয়মান শিল্প-শ্রমিক শক্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু শ্রেণী হয়ে রয়ে গেছে। তথাপি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ভবিষ্যতে তাদের অংশ-গ্রহণ করতে হবে, তার চেহারা অধিকতর পরিষ্কার হয়ে আসছে। এটা উপলব্ধি করা গেছে যে, উৎপাদন আরম্ভ বা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—যা নতুন পরিবর্তন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপকরণের সরবরাহ ত্বরান্বিত করবে, তার নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকতে হবে। শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার কাজে উৎপাদনের অদৃশ্যমান কারণগুলির অবদান সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে জড়িত দ্রব্য এবং শ্রমের চাহিদার বিস্তৃতি আর বৈচিত্র্যের দরুন সর্বত্রই সৃষ্টি হচ্ছে দৈহিক শ্রসমাপেক্ষ নয় এমন বৃত্তিতে নিযুক্ত মনুষ্যশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা। অদৈহিক শ্রমজীবীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সমান অনুপাতে বৃদ্ধিলাভ করছে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সকল ক্ষেত্রে দক্ষ এবং অধিকতর দক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা।

যেসব বৃত্তি মাত্রিক এবং আঙ্গিক উভয় দিক থেকে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে—বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অনুরূপ প্রচেষ্টা তাদের অন্তর্গত। যেসব পেশার এখন সুদূরপ্রসারী রূপান্তর ঘটেছে—প্রকৌশলিক এবং বৈজ্ঞানিক পেশাগুলি তার মধ্যে রয়েছে। অতিরিক্ত বিচিত্রায়ণ আর বিশেষজ্ঞতার দরুন মিশ্রশ্রেণীর উত্থান হচ্ছে। গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজে যেসব বিবিধ যোগ্যতা আর কারিগরি বিদ্যায় সুশিক্ষিত লোক নিয়োজিত আছে, তাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। শিল্পায়িত দেশগুলিতে এজাতীয় শ্রমিকশক্তির বৃদ্ধির হার বেশ উঁচু। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক কর্মীদের প্রায়-স্থায়ী স্বল্পতা খুবই অনুভূত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গবেষণার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থার বিষয়টি আমাদের আশু মনোযোগ দাবি করতে পারে।

মধ্যম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি কর্মীদের চাহিদা সকল দেশে অবিরাম বেড়ে চলেছে। কারিগরি এবং অনুরূপ কর্মীদের সংখ্যাও শিল্প, গবেষণা, কৃষি এবং ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত রকম পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উচ্চপদগুলির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতিবিধানে একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে এবং এইসব পদের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জটিল ব্যবস্থাপনা আর প্রশাসনকাজও বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রবণতামুক্ত নয় ; এইভাবে আমরা পাচ্ছি সাধারণ ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা এবং গবেষণাসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনায় যোগ্যতাসম্পন্ন

www.nagorikpathagar.org

কর্মীর অল্পবিস্তর স্বল্পতার অভিযোগ প্রায় সব দেশ থেকেই পাওয়া যায়।

পূর্ব পাকিস্তান এখন শিল্পায়নের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। কৃষিভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলছে। গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল-সংখ্যক লোকের শহরাঞ্চলে আগমনে আমাদের চাহিদার চেহারা বদলে যাচ্ছে। দেশ এখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ভবিষ্যতে তার রূপ কি হবে—তা বলা দুষ্কর। কিন্তু একথা সত্য যে, এর ভেতরে এবং চারপাশে যেসব শক্তি বর্তমান, তারা নিশ্চয়ই তাদের চাপ প্রয়োগ করবে। ভাবালুতাভিত্তিক যেসব শক্তি, স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃত্যু হবে। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। বর্তমানের উত্তেজনা বিদায় নেবে। নতুন এক সমাজের উত্থান হবে—যা ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবের উপর হবে।

উন্নয়নশীল জাতিগুলির পক্ষে উন্নত জাতিগুলির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। যতদিন এইসব জাতি বর্তমান উন্নত জাতিগুলির সমতা এবং মান অর্জন করবে, ততদিনে শেষোক্তরা আরও উন্নত হবে। এই পরিস্থিতির দরুন উন্নত এবং উন্নয়নশীল জাতিদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য থেকে যাবে। উন্নয়নশীল জাতি তার এই বর্তমান পার্থক্যও বজায় রাখতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিচার করতে হবে। যারা এ বৈষম্য প্রচলিত অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা রক্ষা করে দূর করতে চান, তারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন বলেই অর্থনীতিবিদদের ধারণা। আমাদের মনে যে-প্রশ্ন জাগে, তা হল কি করে বিচিত্র এবং বিরুদ্ধবাদী শক্তির মধ্যে আমরা টিকে থাকব? আমাদের জন্য যে একটিমাত্র রাস্তা খোলা আছে, তা হল আমাদের জনশক্তিকে সংগঠিত করা যাতে তারা দেশের সম্পদ বলে বিবেচিত হতে পারে। কাজটি বৃহৎ সন্দেহ নেই এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের শিক্ষানীতিকে পুনরায় স্পষ্টভাবে বোধগম্য করে তোলা এবং এর জন্য প্রস্তুত করতে হবে আমাদের যুবসম্প্রদায়কে—যাতে তারা কার্যকরভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারে।

দেশে সুদক্ষ গণশক্তি গঠন করার প্রয়োজনীয়তাকে যদি উপরোক্ত মন্তব্যের যথানুপাতিকে পরীক্ষা করা হয়, তা হলে দেখা যাবে তার উপর বাহুল্যমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫টি বৃত্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রকৌশলিক ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। আমাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলির যে উন্নয়নসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, তা কিন্তু যথেষ্ট মনে হয় না। কারিগরি শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির পুর্নবিচার ও সংশোধন প্রয়োজন।

তবুও আশা করা যেতে পারে, সিদ্ধান্তগুলি একবার বাস্তবায়িত হলে দক্ষ শ্রমিক এবং কারিগরি বিদ্যায় সুশিক্ষিত পরিদর্শকদের সংখ্যাল্পতা—যার জন্য এ যাবৎ শিল্পপতিরা অসুবিধা ভোগ করে আসছে—তা যৎপরোনাস্তি কমে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

যোগ্যতাসম্পন্ন পরিদর্শকদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করেছে শ্রমিক এবং পরিদর্শক কর্মচারীদের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। বর্তমান শ্রমিকশক্তি এবং পরিদর্শক কর্মচারীদের পদগুলি—যা কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে—তা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ প্রচেষ্টার ফল।

মনে হয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচি সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে না। তবে শ্রমিক সংস্থা অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কর্মপদ্ধতির পরীক্ষা করলে যে ছবি পাওয়া যাবে তা আরও দুঃখজনক। তাদের পক্ষে উচিত কোনো কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বয়স্কদের শিক্ষাসূচির সম্পূরণ করা এবং বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য কর্মসূচি প্রবর্তন করা। দেশ আজ যে অবস্থার সম্মুখীন এজাতীয় প্রচেষ্টা তার গুরুত্বলাঘবে অনেকখানি সহায়তা করবে। শিল্পপতিদের দাবি হল, তারা শিক্ষাদানসংক্রান্ত কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এবং সমর্থনও করে। কিন্তু তাদের অবদান ও কাজের মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। শিক্ষিত শ্রমিকশক্তিও যে অন্যান্য উৎপাদনব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ, তা শিল্পপতিরা কোনোদিনই উপলব্ধি করে না। সুশিক্ষিত শ্রমিক শিল্পের বড় উপাদান। সরকারের প্রচেষ্টাকে সম্পূরণ করার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। কেবলমাত্র বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেও প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষায়তন গড়ে তোলা দরকার। পূর্ব পাকিস্তানের সকল কাজে তাদের নিজেদের জড়াতে হবে। এ সম্পর্কে যে-কোনো প্রচেষ্টা বহুবিধ ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবে। যে-দেশে তারা ব্যবসা করবে, সে-দেশের সমস্যা ও সৃমদ্ধির সঙ্গে তাদের পরিচিত হওয়া উচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার ভার অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে থাকতে হবে। যেসব বহিরাগত শিল্পপতি এদেশে কলকারখানা স্থাপন করেছে, স্বাভাবতই তারা প্রশাসনিক কর্মচারী, যন্ত্রবিদ, এমনকি শ্রমিকও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করবে ; কারণ এইসব মালিকরা তাদের চেনে, তাদের ভাষা বোঝে, তা ছাড়া এসব কর্মচারীরা বিদেশী বলে দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করতে চাইবে না। পূর্ব পাকিস্তান সরকার এজাতীয় কর্মচারী আমদানি বন্ধ করে দিলে কিছুদিনের জন্য হয়তো উৎপাদন ব্যাহত হবে, আগের মতো লাভ হবে না, কিন্তু দেশের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এ কাজ তাকে করতেই হবে।

সামাজিক বিবর্তন ও আইনের প্রতিক্রিয়া

সামাজিক বিবর্তন আর আইনগত বিবর্তনের মধ্যে সবসময়ই একটি পারস্পরিক ক্রিয়া বর্তমান থাকে। বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে উদ্দীপনা আসবে। সামাজিক জীবনের পরিবর্তিত আদর্শের মন্থর অথচ ক্রমবর্ধমান চাপে জীবনের হেতু ও আইনের মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হচ্ছে তার কাছে আইনকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

www.nagorikpathagar.org

যারা বিশ্বাস করে আইন হওয়া উচিত অনুবর্তী, পূর্বগামী নয় এবং তার অনুবর্তন সুস্পষ্টরূপে গঠিত সামাজিক ভাবপ্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় মন্থরগতি হবে এবং যাদের ধারণা আইন হওয়া উচিত একটি সঙ্কল্পিত শক্তিবিশেষ, তাদের মধ্যকার এই বিতর্ক হল আইন-বিষয়ক চিন্তার ইতিহাসে এক পুনরাবর্তক বিষয়বস্তু।

সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার আক্ষরিক ও উদারনৈতিক মতবাদের মধ্যে যে বিতর্ক তার সঙ্গে স্থৈতিক আর প্রগতিশীল ব্যাখ্যার অনুসারীদের মধ্যকার মতবিরোধ রয়েছে। প্রথমোক্তরা আইনের ব্যাখ্যাকে অত্যাবশ্যকীয় ব্যাকরণের অনুশীলনরূপে বিবেচনা করে, যার মূলে ব্যাখ্যান ও সংবিধানিক কাজের মধ্যকার পার্থক্য বিরাজমান। শেষোক্তরা একে উদ্দেশ্যমূলক সহযোগিতার প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে, যা সাংবিধানিক উদ্দেশ্যের উপলব্ধির উপর গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বিচারকদের যে মতদ্বৈধতা তা হল পরিবর্তনশীল সমাজের স্থিতিশীল থাকার প্রবল প্রচেষ্টা আর প্রগতির প্রভাবের অনিবার্য প্রতিফলন।

বিখ্যাত আইনজ্ঞ আর বিচারপতিরা একমত যে জনমতের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বিচারকদের শুধু অধিকার নয়—কর্তব্যও বটে। সমকালীন শিল্পোন্নত দেশের যে-কোনো আদালতকে যৌথ চুক্তি আর শ্রমিকসংস্থাকে বৈধ এবং সমবেতভাবে স্বীকৃত সামাজিক কার্যকারণের অস্ত্র হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। এমন-কি, ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের আদালতগুলি ধর্মঘটকে অপরাধমূলক চক্রান্তরূপে বিবেচনা করত ; কিন্তু বর্তমানে এজাতীয় মতামত হাস্যকর বলে গণ্য হবে। মাত্র পনেরো বছর পূর্বেও এই উপমহাদেশে 'বোনাস' দেওয়াকে বিশেষ অনুগ্রহসূচক দান হিসেবে গ্রহণ করা হত। ট্রেড ইউনিয়নগুলি আর বেআইনি এবং উচ্ছিষ্টভোজী নয়, বরং এরা আজ শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হয়েছে ; মালিকদের তালাবদ্ধকরণের মতোই তাদের ধর্মঘটও সমান কার্যকর। জনসাধারণের বৃহদংশের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থ হচ্ছে তাদের শ্রম ও দক্ষতার ব্যবহারের অধিকার এবং তা ব্যবহার করার জন্য নিরাপত্তা। এই উদ্দেশ্যেই আজ আমরা পেয়েছি সর্বনিম্ন বেতনসংক্রান্ত আইন, যৌথ চুক্তি করার অধিকার, যা অন্তত বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিকসম্প্রদায় ও শ্রমিকসংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকর হচ্ছে, অবসারকালীন ভাতার দাবি, স্বেচ্ছাচারমূলক বরখাস্তকরণবিরোধী আইন প্রভৃতি। সরকারি ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন House Building Finance Corporation, জনসাধারণকে বাড়ির মালিকানার সুযোগ দিচ্ছে। সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আইনসঙ্গতভাবে সর্বনিম্ন মান নির্ধারণ বাস্তবগুণের পরিচায়ক।

সামন্ত যুগ ছিল গতিহীন ; শিল্পের যুগ গতিশীল। চাকুরির জন্য চুক্তি-সম্পাদন এবং তা ভঙ্গ করার স্বাধীনতা থাকার অর্থই হল একে অপরের সঙ্গে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাঁধা না থাকা—যেটা ছিল সামন্ততন্ত্রে মনিব ও চাকরের সম্বন্ধ।

নানাবিধ সামাজিক কারণে চুক্তি আইনেরও রূপান্তর হচ্ছে। শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোনিবেশের ব্যাপক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকীকরণ ও জীবনের মান উন্নত করা

www.nagorikpathagar.org

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্পায়িত সমাজে এককের পরিবর্তে যৌথভাবে দরকষাকষি বৃদ্ধি পাওয়ায় মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যৌথ চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। যৌথভাবে দরকষাকষির সুবিধার জন্য মালিক ও শ্রমিকদের দরাদরির ক্ষমতায় সমতা ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে অপরাধমূলক আইনের মতবাদ এবং ব্যবহারিক দিক-সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করার প্রবণতা এখন পশ্চাদপসরণ করেছে। এজাতীয় সমাজে আইনজীবীদের বেশি পছন্দ হল যৌথ প্রতিষ্ঠান, মুসাবিদা, চুক্তিসংক্রান্ত দেওয়ানি মামলা, বাণিজ্যিক আইন, শ্রম আইন ইত্যাদি। এর কারণ শুধু এই নয় যে, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত টাকার অঙ্ক বেশ স্ফীত ; এর কারণ অপরাধমূলক আইনের ব্যবসায়কে সামাজিক এবং পেশাগতভাবে সম্মানহানিকর বলে বিবেচনা-প্রবণতাও রয়েছে। এর ব্যতিক্রম বোধহয় সেইসব মামলা, যেখানে যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তারা অবৈধ লেনদেনের জন্য অভিযুক্ত হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে নাগরিকীকরণ এবং শিল্পায়ন সঞ্জাত সামাজিক ভাঙন অপরাধের মাত্রাকে কতদূর প্রভাবিত করেছে, সেসব তথ্যের মূল্য-বিচার আজও আমরা করে উঠতে পারিনি। আমরা নিঃসন্দেহে জানি, বৃহৎ পরিবারগুলির একত্রীকরণ, মাত্রাতিরিক্ত জনবহুল বস্তিগুলিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কেন্দ্রীভূত হওয়া অপরাধপ্রবণতার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে—যেমন হয়েছে আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে বিপুলসংখ্যক বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের গৃহকর্ম থেকে সরিয়ে এনে তাদের বেতনভুক চাকুরিতে নিযুক্ত করায় অথবা বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলিতে সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরায়। যখন পরিবারে, বিদ্যায়তনে বা অন্যত্র কোনো ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য এবং স্বাস্থ্যের উপর সামাজিক পরিবেশ বা ভাবাবেগের বিশৃঙ্খলার ফলাফল উপলব্ধি করার প্রশ্ন ওঠে, তখন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মনস্তত্ত্ব একে অপরের গা ঘেঁষে চলে। একটি মানুষের গঠনে যেসব জটিল অবস্থা বর্তমান তা যতই আমরা উপলব্ধি করতে পারব, ততই কম পরিমাণে আমরা পাপ এবং প্রায়শ্চিত্ত, অপরাধ এবং শাস্তির সরল সমীকরণকে গ্রহণ করতে সক্ষম হব। কিন্তু পুনরায় আমাদের প্রকৃত ভারসাম্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেমন বিশেষ ধরনের বিক্ষুব্ধচিত্ত ব্যক্তির রোগ বিষয়ে।

যেসব প্রধান উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা, একক বা সমবেতভাবে আধুনিক অপরাধমূলক আইনকে প্রভাবিত করে থাকে তা হল : (১) কোনো ব্যক্তিবর্গের হাতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সঙ্গতিকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ; (২) একক ব্যক্তির বিকল্পে, আধুনিক সমাজে অধিকার ও কর্তব্যের বিষয় হিসাবে যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব ; (৩) আধুনিক রাষ্ট্রের জনহিতকর কর্মের বৃদ্ধি, যার সঙ্গে প্রশাসনিক এবং দণ্ডবিধিমূলক ধারাগুলির একত্রীকরণের মাধ্যমে সামাজিক আদর্শগুলির নিরাপত্তাবিধান জড়িত রয়েছে। যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিই হচ্ছে সর্বাধিক কর্তৃত্বমূলক সংস্থা, অতএব অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সংঘর্ষমূলক ক্রিয়াকলাপে তা শক্তিশালী রক্ষক। অপরাধমূলক কার্যকলাপে এ সত্যের প্রভাব গভীর। যৌথ সংস্থাকে বাস্তব মানুষের আইন

www.nagorikpathagar.org

দ্বারা সমীকরণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু যৌথ সংস্থা একক নয়। যৌথ সংস্থাকে জীবন্ত প্রাণীর বৈশিষ্ট্যপ্রদান হচ্ছে প্রতীকমূলক ইঙ্গিত, এমনকি—যেখানে তা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতার বৈধতার নিছক ছদ্মাবরণও নয়। প্রকৃত প্রশাসনিক অথবা হিতসাধনমূলক অপরাধ ব্যতীত মানুষের কাছে অপরাধমূলক আইনের একটি আবেদন রয়েছে। যৌথ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি বিমূর্ত বস্তু। যেমন নিরবয়ব তেমনি নিজস্ব মন বলে এর কিছু নেই। যখন কোনো সময় সরকারি বিভাগগুলি এবং বহু স্বাধীন যৌথ সংস্থা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বহুবিধ কর্ম ও দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, সরকার বা সরকারি যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির অপরাধমূলক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া সাধারণত নৈতিক কিংবা প্রযুক্তিসংক্রান্ত কারণে সমর্থনযোগ্য নয়।

১৯৬৬ সালের একাদশ সংখ্যক আইনবিধিবলে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিকবিরোধ আইন বর্তমানে যেভাবে সংশোধন করা হয়েছে, তা কোনো দলের অনুমোদন লাভ করেনি।

একক বিবাহপ্রথা আর সীমাবদ্ধ বিবাহবিচ্ছেদের প্রথা প্রবর্তনের দিকে মানুষের সর্বদাই ঝোঁক আছে মনে হয়। পাশ্চাত্য জগৎ এ প্রথাকে স্বীকার করে নিয়েছে, প্রাচ্যও তার অনুগমন করেছে। ভারত ইতিমধ্যে বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করেছে। পাকিস্তান এ সম্পর্কে যে নতুন পারিবারিক আইন ব্যাপকভাবে সংশোধন করেছে তা একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত। এই প্রক্রিয়া আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের নাগরিকীকরণের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হচ্ছে, বর্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক দর্শনের প্রভাবে ধর্মীয় বন্ধনের শিথিলতা তাকে প্রবল করে তুলেছে।

পারিবারিক আইনের বর্তমান সঙ্কট হচ্ছে বহুবিধ। প্রধানত ধর্মীয় কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিরোধিতা ভারতীয় আর্যদের মধ্যে ছিল এবং এখনও রয়েছে ক্যাথলিকদের মধ্যে। কিন্তু এখন ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ। আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক মর্যাদার গভীর পরিবর্তন, বিশেষ করে বিবাহিত স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি, যার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে এবং প্রায় সব দেশেরই পরিবার আইনকে প্রভাবিত করছে।

প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে সেই দর্শনের সহগামী, যার মতানুসারে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের বর্তমান বিশ্বাস—বিবাহিত স্ত্রীলোকসহ সকল স্ত্রীলোকেরই সমক্ষমতার ভিত্তিতে ইচ্ছামতো চলাফেরা করার অধিকার আছে। বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করার এবং নিজের কাজকর্ম নিজেই দেখার অধিকারও স্ত্রীলোকদের আছে। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বা সামাজিক বাধ্যতা পূর্বের তুলনায় পরিবারকে রক্ষা করতে খুব কমই কার্যকর হচ্ছে। এখন প্রায়ই অসুখী দাম্পত্যজীবন দেখা যায় যেখানে সমাজের চাপে জোর করে বজায় রাখা হয় তাদের বিবাহিত জীবনকে। কিন্তু এর ফলে অল্প-বয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছোট ছোট সামাজিক সুসমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে সনাতন সামাজিক ধর্মীয় রীতির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত

www.nagorikpathagar.org

বহুবিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন করার কাজে মনোনিবেশ করেছে। এই আইনানুগ বিপ্লব সেখানে কতখানি সফলতা অর্জন করবে, তা এখনও অনিশ্চিত।

ইসলামের প্রভাব পূর্বের মতো শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র এখন দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে উত্তরোত্তর ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি আর শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রথম এবং প্রধান আইনগত সংঘর্ষ হয়েছে দেওয়ানি ও বাণিজ্যিক আইনের ক্ষেত্রে—যেখানে ইসলামি রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই পাশ্চাত্য প্রথায় সঙ্কলিত আইন প্রবর্তন করছে। অতি অল্পদিন হল পরিবর্তন আর অন্যান্য প্রথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মুসলিম পারিবারিক আইনকে অধিকতর প্রভাবিত করেছে এবং ফলে মুসলিম বিবাহিত নারীদের ভাগ্যাকাশেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অন্তত মিশর, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, পাকিস্তান এবং সুদান আইনের নানাবিধ সংস্কার করতে আরম্ভ করেছে—যার ফলে নানা বিষয়ে নারীজাতির অধিকার অনেক বেড়ে গেছে।

সরকারি কাজকর্মের বিরাট প্রসারকে আইনানুগ শাসনের কোনো সাম্প্রতিক বিশ্লেষণই উপেক্ষা করতে পারবে না। তার কারণ হল, আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং সামাজিক পক্ষপাতিত্বহীনতার ন্যূনতম দাবি, যা এখন সকল সভ্য দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বসাধারণের জীবনদর্শনের অংশবিশেষ। রাষ্ট্র আজ সামাজিক কাজকর্মের রক্ষক এবং বিধায়ক, শিল্পের পরিচালক, অর্থনৈতিক নিয়ামক এবং মধ্যস্থতাকারী। তার কাজ হল রক্ষকের, যা তার ঐতিহ্যগত এবং আইনগত কর্তব্য।

মালিক সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির নৈতিক এবং আইনগত ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলি অধিকতর জাতীয় পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে ; কারণ অধিকাংশ আফ্রো-এশীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা অল্পবিস্তর সঙ্কটাপন্ন। উৎপাদনে স্থায়ী অচলাবস্থা কিংবা মূল্যবৃদ্ধি, লাভ এবং বেতনবৃদ্ধি, যা জাতির অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিতে পারে, এসব তারা সহ্য করতে অক্ষম। কাজেই বেতন নির্ধারক বোর্ড, বিরোধ-মীমাংসার আইনানুগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়।

সম্পত্তি সংরক্ষণের অধিকার আজকাল সমগ্র সমাজের উপর ন্যস্ত হয়েছে। পুরাকালে এই অধিকার শুধু স্বল্পসংখ্যক জমির মালিক ভোগ করত। ক্রমশ নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন আইনের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। বড় জমিদার বা শিল্প সংগঠকের নিজের সম্পত্তিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করার ক্ষমতা আজ নিঃসন্দেহে পূর্বের চাইতে অনেক কম। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে মানুষের স্বাধীনতার অতি আবশ্যকীয় শর্ত, সে কারণ এখনও বৈধ—যদিও পূর্বের তুলনায় এই ধারণাকে আজকাল একদল লোক স্বীকার করতে রাজি নয়। গণতান্ত্রিক আইনের মাধ্যমে সরকারি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার প্রাথমিক অধিকারগুলির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। সরকার এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার উপায় নির্ধারণ করতে হবে। কিভাবে সমতা রক্ষা করতে হবে—তা অবশ্যই অনেকখানি সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সময়ের সঙ্গে সমতালে তাকে বেড়ে উঠতেই

www.nagorikpathagar.org

হবে। তাকে Bentham কিংবা Dicey-র ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক আদর্শবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক মূল্য সমানই থাকবে যার অর্থ হচ্ছে সমাজ কর্তৃক সেসব অবস্থার সম্ভাব্য ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় মানুষ নীতিবাদী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হবে। কিন্তু যে উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে সে উপায় আমাদের সমাজে বর্তমান নেই।

সমাজের প্রয়োজনে পরিবর্তন হয় আইনের ও আদর্শের এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তা চলতেও থাকবে। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে। অতএব পরবর্তী সমকালীন আইনজীবীদের কর্তব্য হচ্ছে মধ্যে মধ্যে তাদের অবস্থার পর্যালোচনা করা এবং তারা যে কাজ করে যাচ্ছে তা যথার্থ কার্যকর হচ্ছে কি না এবং পরবর্তীকালের আইনজীবীরা যাতে আইনের কাজে যথোপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়—তা সুনিশ্চিত করা।

বিদেশী শাসনমুক্ত হওয়ার অর্থ অন্যায় স্থানীয় শাসন থেকে মুক্তিলাভের নিশ্চয়তা নয়—এ সত্য সম্পর্কে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির অধিবাসীরা সচেতন হতে শুরু করেছে। যে জাতীয় অবস্থা স্বাধীন সমাজে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, বিদেশী শাসন তা কখনও করতে পারেনি। স্বাধীনতা হচ্ছে মুক্তির জন্য একটি প্রাক্-আবশ্যকীয় শর্তমাত্র, তার নিশ্চয়তা নয়। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সকল সরকার এখন দু'টি কঠোর কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত তাদের নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে—যার প্রতিশ্রুতি তার জনসাধারণকে পরোক্ষভাবে পূর্বে দেয়া হয়েছে।

নবস্বাধীনতালব্ধ দেশগুলিতে সমাজব্যবস্থা এখন নিরন্তর পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলছে। নাগরিকীকরণ বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে চলেছে—যার দরুন বেকারত্ব, সামাজিক শূন্যতা, অপরাধ, পারিবারিক জীবনে ভাঙন ইত্যাদি সমস্যা আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে। বিত্তহীনদের বিরুদ্ধে নিজেদের নতুন অবস্থাকে সমর্থন করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হচ্ছে। তাদের অবস্থা অধিকতর উন্নত থাকায় তারা সরকারের উপর চাপ দিয়ে কাজ করতে পারে। ফলে সরকার তথাকথিত সুবিধাবাদীর স্বাধীন কাজকর্মকে বাধা দেওয়ার নামে নাগরিক স্বাধীনতা, সংবাদপত্র এবং সভাসমিতি প্রভৃতি সংগঠনের স্বাধীনতা খর্ব করে দেশে আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছে। পুঁজিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার জমির মালিকদের নামমাত্র টাকা দিয়ে জমি দখল করছে। এ-জাতীয় অবিচারের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সজাগ ও সতর্ক হতে হবে।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে আদালতেই কেবল আইনজীবীদের প্রয়োজন হত, কিন্তু বর্তমানে আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে সমাজের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ব্যাপারে আইনের পেশাগত কাজের অত্যধিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক উন্নতির ফলাফল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, বর্ধিষ্ণু যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং জীবনের বিপুল গতিবেগ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির আইনজীবীদের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আইনজীবীরা বড়জোর ভূসম্পত্তির প্রশাসন,

www.nagorikpathagar.org

বন্দোবস্তি এবং ট্রাস্ট সম্পত্তির ব্যাপারে কাজকর্ম করত, কিন্তু স্বাধীনতার পর নগর-পরিকল্পনা এবং তার জন্য বিধিমতে জমির দাবি এবং দখল, শিল্প এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং শ্রম-সংক্রান্ত বিচারালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন সংবিধানগুলি আইনসম্বন্ধীয় কাজকর্মের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে।

কল্যাণরাষ্ট্র মাত্রেরই নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির উপর একটি বড় রকমের প্রভাব আছে। পূর্বে যা পারিবারিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হত, বর্তমানে তা করদাতার দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়।

আইনের কতখানি সংস্কার প্রয়োজন তা বুঝবার যোগ্যতা নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যবহারজীবীর তুলনায় অপর কারোর বেশি নেই। এ বিষয়ে তার বিশদ জ্ঞান আছে—সেটাই একমাত্র কারণ নয় ; সাধারণের উপর তার ফলাফল এবং তার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আইনজীবীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে—সেটাও কারণ বটে। যুদ্ধোত্তরকালে আইনের ক্ষেত্রে গবেষণার কাজের উপর যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের জন্য পরিকল্পনা করা হয়।

অর্থনৈতিক কারণে এবং এই পেশা থেকে সাধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আইনব্যবসায়ীদের ভবিষ্যতে বর্তমান থেকে অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এখন আর কোনো আইনব্যবসায়ী নিজেকে আইনের জগতে একজন সর্বজ্ঞানী বলে দাবি করতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। একমাত্র দূরবর্তী জেলাসমূহ বাদে একক আইনজীবীর সংখ্যা খুবই সীমিত। উপজাতিঅধ্যুষিত এলাকা—যেমন পার্বত্য এলাকায় যেখানে অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার জন্য ফৌজদারি আইনই একমাত্র কার্যকর আইন, সেখানে আইনজীবীদের মিথ্যার সৃজনকারী বলে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণের মতে সমাজে এ আইনজীবীদের কোনো অবদান নেই। এই অভিযোগের পেছনে কিছুটা সত্য বিদ্যমান থাকলেও, আধুনিক উন্নত সমাজে আইনের পেশার উপর দোষারোপ করা যেমনি হাস্যকর তেমনি অযৌক্তিকও বটে।

আইনগত পেশার সভ্যপদের সঙ্গে ঐ পেশাগত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে পূর্ণ অংশ-গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে স্বীকৃত দায়িত্ব জড়িত থাকবে। আইনসম্বন্ধীয় সাহায্য ও পরামর্শদানের পরিকল্পনাসমূহের বন্দোবস্ত ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানের উপর আইনসংস্কারের জন্য একটি পরিকল্পিত জাতীয় কর্মসূচির দায়িত্ব থাকবে। প্রস্তাবিত আইনসমূহের খসড়াগুলি জাতীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভায় উত্থাপন করার পূর্বে এসব প্রতিষ্ঠানের নিকট পেশ করা সরকারের উচিত, যাতে আইনব্যবসায়ীরা একমত হয়ে সম্মতি দেন—নীতি সম্বন্ধে নয়, কেবল শর্তাবলীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে।

আইনব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপারকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বলে গ্রহণ করা চলে না। আইন এবং রাজনীতির অন্তঃক্রিয়া এবং পরিবর্তনশীল জগতে আইনজীবীদের অবিরাম ক্রিয়াকলাপ অনিবার্যভাবে অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জড়িয়ে ফেলবে। বর্তমানে বিবাদের প্রধান দু'টি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আইনের ঐতিহ্য আর মূল্য গভীরভাবে বিজড়িত। প্রথমটার

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্র হল আন্তর্জাতিক, দ্বিতীয়টি প্রতিটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আধুনিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। উভয়েরই মানবাধিকার এবং আইনগত শাসনসমস্যা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আইনগত শাসনের সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চলছে। এক এক দেশে এক এক রকম হলেও সকল দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনা আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে প্রশাসকদের ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারকে বাড়িয়ে দেয়। এ দু'টি কাজের ক্ষেত্র একে অন্যের সাথে জড়িত। কাজেই যে-কোনো দেশের পেশাদার ব্যবহারজীবীরা যখন বহির্মুখী হয়, তখন তাদের সমস্ত জগতে আইনের শাসন ও মানবাধিকার বিস্তারের কাজকে কিভাবে সমর্থন ও সাহায্য করতে পারা যায় তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একদিকে তাদের নিজ নিজ সমাজে আইনের শাসনকে সংরক্ষণ ও লালনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, অপরদিকে তাদের অধিকতর হারে পরিকল্পনা এবং বর্ধনশীল প্রশাসনিক ক্ষমতার সঙ্গে আপোস করতে হবে।

আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং সমস্যা কিভাবে আইনের শাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা উন্নতিশীল দেশগুলি বিশেষভাবে উদাহরণ দেবে ; কারণ ঐসব দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের মত হল কোনোকিছুকেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করতে হবে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনকে জরুরি অর্থনৈতিক অগ্রগতির খাতিরে কিছু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনেক দেশে পরিকল্পনা প্রণয়নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং সেজন্য সকল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপেক্ষায় থাকা নিষ্প্রয়োজন। তবু, এমনকি এসব দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপরে যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, তা সনাতন আইনের শাসন-সম্পর্কিত ধারণাকে বেশ খানিকটা পীড়িত ও নিষ্পেষিত করেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার সর্বত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। এর নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির প্রবণতা হল—বিধানসভাকে প্রশাসনিক বিভাগের পদানত করা এবং এমন সব আইন প্রণয়ন করা যাতে শাসনের আওতাতেই প্রশাসকরা কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন এবং জনসাধারণ ও তাদের অধিকার-সম্পর্কিত সদাবর্ধমান ব্যাপারগুলি আদালতের পরিবর্তে প্রশাসন বিভাগগুলিকে নাড়াচাড়া করার জন্য অনুমোদন দান করবে। উন্নতিশীল দেশগুলির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এটা একটা বড় সমস্যা। এশিয়া এবং আফ্রিকার সরকারগুলির ঝোঁক হল—সব ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ করা এবং নিয়ম ও জরুরি আদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা যাতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নতি অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রেই জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষায় ইচ্ছুক আইনজীবীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আইনের পেশার ভবিষ্যৎ আদর্শ এবং তার অবস্থা আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে। অর্থনৈতিক কাজকর্ম রাষ্ট্রের যত বেশি পরিকল্পনা আর পরিচালনাধীন হবে, ততই আইনজীবীদের জন্য বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এসব কাজ তাদের দক্ষতার সাথে সমাধা করতে হবে—যে কৌশল এবং দক্ষতা অতীতকালের আইনজীবীরা রাজশক্তির শাসনব্যবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দরকার মনে করতেন।

এখন দেখা যাক, আইনজীবীদের নিকট থেকে ভবিষ্যতের সমাজ কি উপকার আশা করতে পারে। প্রথমত আমরা সমাজের আইনগত সাহায্যের প্রয়োজনের কথাটি বলার চেষ্টা করব। জাতি যদি বড় হতে থাকে, উন্নতি করতে থাকে, সে জাতি অধিকতর জটিল হয়ে ওঠে এবং কল্যাণরাষ্ট্রের প্রতি যদি তার বিশ্বাস থাকে—তা হলে এটা সুস্পষ্ট যে, আইন তখন সরল কিংবা সহজ হবে না। জনসাধারণের একটি ভ্রান্ত ধারণা যে, আইনজীবীরাই হল আইনের জটিলতা সৃষ্টিকারী। জনসাধারণ জানে না যে, দ্রুততার মধ্যে এবং আইনজীবীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইন প্রবর্তন করার জন্য জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মহল বিশেষত সরকারের আইন বিভাগগুলি খসড়া প্রণয়ন বা অসঙ্গত আইন প্রবর্তন সম্পর্কে নিজেদের দোষ স্বীকার না করে সবসময় আইনজীবীদের দোষারোপ করে এবং অবিরত প্রচার করে বেড়ায় যে, আইনজীবীরা এবং বিচারকেরা বিচারকার্যকে বিলম্বিত করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

আইনসংস্কার এবং তার সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎকালের আইনজীবীরা সতর্ক ও সরব থাকবে—সমাজ শুধু তা-ই চাইবে না, সে আরও চাইবে যারা এই পেশায় লিপ্ত তারা আইনের সংস্পর্শে আসা লোকের সমস্যা, যথা—কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করুক।

পূর্ববাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এক নতুন চেতনা এনে দিয়েছে। পূর্বে মুসলিম সম্প্রদায় এক অবাস্তব জগতের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু এ যুগের তরুণ-তরুণীরা কঠোর বাস্তবের উপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারা ভালবাসে তাদের দেশের মাটিকে, তার মেঘ ও রৌদ্রকে, বাতাস ও পানিকে, ভাষা ও সাহিত্যকে, সঙ্গীত ও নৃত্যকে, সর্বোপরি—তার সমাজ ও মানুষকে। তারা তাদের জন্মভূমিতে বাস করতে গৌরব বোধ করছে। প্রাচীন মুসলিম সম্প্রদায় বাংলাদেশকে কোনোদিন আপন করে নিতে পারেনি। তাদের ভাবতে ভাল লাগত, তাদের পূর্বপুরুষেরা এদেশে এসেছিল আরব কিংবা পশ্চিম এশিয়ার কোনো মুসলিম দেশ থেকে এবং তারা এখানে এসেছিল বিজেতারূপে, যার জন্য তারা বাংলাদেশকে নিজের বলে কোনোদিন ভাবতে পারেনি। তুরস্কে কিংবা মিশরে যখনই কোনো রাজনৈতিক অভ্যুত্থান হয়েছে, অথবা এশিয়ার দেশগুলিতে ভূমিকম্প বা অন্য কোনোরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে, তখনই তারা অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়েছে, কিন্তু তারা

www.nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানের দুঃখে কখনও বিচলিত হয়ে পড়েনি। নিজ সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তারা মোটেই সচেতন ছিল না। ধর্ম ছিল তাদের কাছে বাস্তব ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এড়ানোর উপায় মাত্র। প্রকৃত সাহিত্য, চারুকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি সৃষ্টিতে তাদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল জীবনের প্রতি তাদের এজাতীয় মনোভাব। এটা অবশ্যই অপ্রত্যাশিত যে, পুরাতন ধ্যানধারণা বাংলার সামাজিক জীবন থেকে হঠাৎ অন্তর্হিত হবে, কিন্তু বর্তমানের যুবসম্প্রদায় নিঃসন্দেহে সঠিক পথে চলছে। সৃজনশীল প্রচেষ্টার জন্য তরুণ সম্প্রদায়কে অবশ্যই জেগে উঠতে হবে।

নতুন সমস্যা

এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির কতকগুলি সমজাতীয় সমস্যা রয়েছে ; তার একটা হচ্ছে—দেশের সংহতিসাধনের সমস্যা। পাকিস্তানের পক্ষে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ; কারণ পাকিস্তানের দু'টি অংশের মধ্যে এক হাজার মাইলের মতো ভারতীয় এলাকা বিদ্যমান। যখন অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলি বৃহত্তর দেশপ্রেমিকতার ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে, সেখানে পাকিস্তান দুই অংশের সংহতি রক্ষার জন্য ইসলামের উপর নির্ভর করছে।

বিগত দুই দশকে সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকার এবং ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সামরিক আইনের আমল ব্যতীত যেসব সরকার ক্ষমতাসীন ছিল, তারা সকলেই রাষ্ট্রীয় সংহতি অর্জনের জন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতির কাছে আবেদন করে এসেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে গুরুত্ব দিতে হবে—অতীতে এই ছিল তাদের মত। এখনও তা রয়ে গেছে—রাজনীতি হবে ইসলামি আইনভিত্তিক, সংস্কৃতি হবে ইসলামি, সমাজকে অবশ্যই ইসলামের মূলমন্ত্র আশ্রয় করে গড়ে উঠতে হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজের সঙ্গে সক্রিয় করে তুলতে হবে—এ হচ্ছে বিশেষ একটি ধর্মীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের দাবি। এ দল বুঝতে পারছে না যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যাপারে ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা নিত্যনতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং দেশকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহের মতো পেছনে ঠেলে দিচ্ছে সর্বদিক দিয়ে। এই মত পূর্বাঞ্চলের সমগ্র সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে এখন যেমন সহায়ক হচ্ছে—ভবিষ্যতেও তেমনি সহায়ক হবে ; কারণ এখানে প্রতি পাঁচ জনে একজন অমুসলমান রয়েছে। এরা সকলেই প্রায় হিন্দু ; তবে এদের মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং প্রাণীউপাসক উপজাতি রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সমাজ নানাবিধ ভৌগোলিক, ভাষাভাষী এবং সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত এবং জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন। সমাজের প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের মনোভাব তাদের পূর্বগামীদের অনুরূপ নয়। গরিব ও ধনী, মনিব ও কর্মচারী, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বৈচিত্র্যকে জীবনের সত্য বলে নতুন যুগের মানুষ ভেবে নিয়েছে। শত রকমের ফুল জন্মানো এবং শতরকম মতবাদকে শ্রদ্ধা করে তারই মধ্য

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে একটি সুসংগঠিত সমাজ কায়েম করা যায়—এটা আধুনিক যুগে অনেকেই বিশ্বাস করে। তবে সে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সন্দেহাতীতভাবে গঠনমূলক, সুষম এবং তা হবে কোনো দল বা সম্প্রদায়ের ক্ষতির বিনিময়ে নয়। ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে নাগরিকদের বাস্তবধর্মী অভিব্যক্তি আর মতামতভিত্তিক অনুভূতির উপর। কেবলমাত্র সৃজনধর্মী মানবতা এবং বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতে সমাজের সংহতি অর্জন করা যায়।

এশীয় দেশগুলির স্বাধীনতা-উত্তর আন্দোলনগুলির মধ্যে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য রয়েছে। জনসাধারণের ব্যাপারে মৌলিক অক্ষরেখা সচরাচর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কৃষকদের অসন্তোষের বিস্ফোরণ বলে মনে হয়। ভূস্বামী, সুদখোর, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক দালাল, উদ্ধত বিদেশী প্রভৃতির বিরুদ্ধে সনাতন গ্রামীণ অভিযোগগুলি আর ব্যক্তিগতভাবে পালন করা হচ্ছে না। তার পরিবর্তে চাষীরা সময়-সময় জনস্ফীতি আর জমির স্বল্পতার দরুন বিতাড়িত হয়ে সর্বদা শহুরে আধুনিকতার চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, যা থেকে সনাতন সামাজিক ব্যবস্থা তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল ; এখন তারা আগ্রহের সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীদের কথা শুনছে। ক্রুদ্ধ চাষীসমাজের নিকট আবেদন করায় মার্কসবাদ চীনদেশে সর্বপ্রকার সফলতা অর্জন করেছে। চীনের পর উত্তর ভিয়েৎনাম এবং কোরিয়া ; এখন পালা হল দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস আর কম্বোডিয়ার। জমিদার, ট্যাক্স আদায়কারী, ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ী, পুঁজিবাদী—এদের কবলমুক্ত হওয়া এবং সেইসঙ্গে দ্রব্যাদির আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থাকে নাগালের মধ্যে পাওয়াকে বলা যেতে পারে চাষীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক সংজ্ঞা। বহু শতাব্দীব্যাপী শোষণ আর পরাধীনতা ভোগের পর এশিয়া এবং আফ্রিকায় নতুন জাতিসমূহের অভ্যুত্থান হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংগঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনগ্রসরতার দরুন ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টায় তারা ছুটে চলেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি মনোভাব গড়ে উঠেছে যে, আইন এবং তার আনুগত্য হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। বর্তমান যুগের মনোভাব হল অসহিষ্ণু। মানুষ বিলম্ব করতে পারে না, জাতির বিলম্ব সহ্য হয় না। ধৈর্যহীনতা আইনের জন্ম এবং তার প্রতি আনুগত্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে না। এই পারমাণবিক যুগে কাল ও স্থানকে অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কোনো স্থানই আজ দূর নয়।

পূর্ববর্তী সম্প্রদায় ঐতিহ্যবাহী আদর্শের প্রভাবাধীনে গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে বিদ্যমান ছিল বিশেষ শক্তিশালী স্থানীয়, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রভাব। তারা এমন এক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল—যেটা তাদের পরবর্তী বংশধরের পরিবেশ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আদর্শের উন্নতি এবং নতুন ভাবধারার বিস্তার পরিবার এবং গ্রাম্য সম্প্রদায়ের ভারসাম্যকে বিক্ষুব্ধ করেছে। ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের পর থেকেই মানুষ অধিকতর আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা, বাস্তুহারাদের অন্তঃপ্রবাহ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, নাগরিকীকরণ এবং দ্রুতগামী যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলস্বরূপ সামাজিক কাঠামোতে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। নাগরিকীকরণ এবং শিল্পায়নের প্রতি প্রবণতাহেতু সনাতন স্বয়ংসম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক জীবন

www.nagorikpathagar.org

বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সামাজিক আদর্শের এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, যারা এই পরিবর্তনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রেখেছিল, তারাও সময়-সময় বিভ্রান্ত ও অভিভূত হয়ে পড়েছে। অতিপ্রগতিশীল ভাবধারার লোকেরাও ব্যক্তিত্ব-দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা ছত্রভঙ্গ, কারণ তারা দেশের উপস্থিত সমস্যাবলীর সমাধান-নির্ণয়ে ব্যর্থ। তারা একে অপরের সঙ্গে কলহ করে। বাজার মন্দা, নীতিভ্রষ্টতা, বিযুক্তিকরণ, মতভেদ এবং দলত্যাগ করার নেশা এখন রাজনীতির স্থান দখল করেছে। রাজনৈতিক নেতারা শুধু প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার শিক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে কি করে—সে শিক্ষা পায়নি। জনসাধারণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা যায় না এবং সেজন্য সে চেষ্টা করাও উচিত হবে না। অসময়োচিত আক্রমণের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আর কায়েমি স্বার্থকে শক্তিশালী করা হবে মাত্র। শিল্পায়নের সংঘাতের পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না, তারা যে সেই নতুন এক জগতের, নতুন এক যুগের প্রান্তে উপনীত—একথা রাজনীতিকরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ব্যর্থমনোরথ হওয়ার কারণ বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তারা যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভিজ্ঞতা তাদের কোনো কাজেই আসছে না, তাদের কোনো ধারণাই নতুন যুগের মানুষের কাছে স্বীকৃতিলাভ করতে পারছে না। শিল্পে ব্যাপক হারে অর্থনিয়োগের জন্য মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে, অভাব বেড়ে গিয়েছে শতগুণ। স্বভাবতই মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ঘূর্ণিবাত্যা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতি জাতীয় দুর্ঘটনাগুলো আর আগের মতো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করছে না। এমনকি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতির জন্য যে অনুভূতি আগে ছিল, তার স্থান দখল করেছে ব্যক্তিগত উন্নতির প্রবল ইচ্ছা। যোগ্য ব্যক্তির টিকে থাকাই এখনকার আদর্শ ।

আইয়ুব সরকারের দশ বৎসর—সাধারণ ফলাফল

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে ধনবান লোকের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিগত দশ বছরে। লোকের কষ্টরোধ করার জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিত্তবান শ্রেণীর ভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে—সেটা হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সাধুতা, সত্যবাদিতা, বিনয়, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, দয়া, অপরের জন্য মমত্ববোধ এসবের কোনো কদর আজ আর নেই বললেই চলে। পুরাতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিষ্পেষিত করা হয়েছে। কারখানা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক এবং শ্রমিকেরা ইতিমধ্যে না হলে, অতি শীঘ্র এই পটভূমিতে অংশগ্রহণ করবে। বর্তমান মুহূর্তে মালিকেরা সব বহিরাগত হওয়ায় তারা শ্রমিকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করছে—এর অর্থ এই নয় যে তারা খুব দরদি মালিক—আসলে তারা কিছুটা উদারতা দেখিয়ে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

অতিমাত্রায় বিদ্রোহী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক আর ছাত্রদের উৎখাত এবং একঘরে করার চেষ্টা করছে। সরকার এটা বুঝতে পারছে না যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চালিয়ে এবং তাদের উৎখাত করার পরই প্রকৃত শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হবে। পুঁজিবাদীরা ইতিহাস পড়ে জেনেছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বুদ্ধিজীবী এবং আদর্শবাদীরা যোগ না দিলে কৃষক বা শ্রমিকদের পক্ষে একা আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একথা আংশিক সত্য কিন্তু সবটুকু সত্য নয়।

আইয়ুব সরকারের শাসনামল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছেও—রাজনৈতিক বিক্ষোভ, শ্রমিকবিক্ষোভ, ছাত্রবিক্ষোভ প্রভৃতি বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। রাজনীতিকরা তাঁর সঙ্গে সেই ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা শুধুমাত্র তাঁর চাকুরি করতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করার এবং সমাজে তার সুনামহানি এবং তাকে হীন প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শিল্পপতিরা ভয়ে অস্থির, কারণ দেশের উভয় অংশকে একত্রিত করার জন্য যেভাবে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল দেশ অসুস্থতায় ভুগছে। সংহতি সম্পর্কে এত আলোচনার এবং প্রচারণার যখন প্রয়োজন হয়েছে, শিল্পপতি আর বিদেশীরা সাধারণভাবেই ভেবে নিয়েছে যে, দেশ বুঝি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সরকারি কাজকর্মে চরম বিশৃঙ্খলা ছাত্রবিক্ষোভের কারণ। শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিকল্পনা রচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু শিক্ষা হচ্ছে প্রাদেশিক বিষয়ভুক্ত। এটা হল কালানৌচিত্য।

এশিয়া ও আফ্রিকার নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মতো পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা ব্যতীত অন্য শহরগুলির উন্নতি হচ্ছে না। বিগত দুই দশকে ঢাকা শহর প্রসারতা লাভ করেছে এবং রাস্তাগুলিকে প্রশস্ত করা হয়েছে এবং জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তথাপি শহরটিকে মৃত মনে হয়। রজনী এখানে নীরস এবং নিরানন্দ, প্রকৃত আমোদ-প্রমোদের কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো থিয়েটার বা অপেরা হল। অনেকের ধারণা, এর কারণ হল ঢাকায় স্থানীয় বড়লোকের সংখ্যা কম বলে। আবার অনেকের ধারণা, বাঙালিরা শত্রুভাবাপন্ন ভারত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় তারা বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তাদের দৃষ্টি হয়েছে অন্তর্মুখী। অতএব তাদের কোনো পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নেই। তারা সনাতন জীবনধারায় সন্তুষ্ট, তারা বিমর্ষ, গভীর চিন্তাশীল এবং দার্শনিক ভাবপ্রবণ ; কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, এটা বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার যুগ, সামন্ততান্ত্রিক যুগ নয়।

এক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান একটা ঐতিহ্যবিহীন দেশ। তাদের মুখ্য ঐতিহ্যগুলি ধার করা, তাতে মৌলিকত্ব নেই। তারা যে ধর্মবিশ্বাস, মতবাদ, আদর্শ বা আচরণই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, তা হল অল্পবিস্তর অনুকরণমূলক। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এখানকার শিল্পীরা, রাজনৈতিক এবং সমাজকর্মীরা নিজ দেশের সংস্কৃতির উন্নতি এবং নিজস্ব জীবনদর্শন সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ঐ উন্নতির প্রথম অভিব্যক্তি হল সংস্কৃতিক্ষেত্রে। এরা এখন দেশীয় সংস্কৃতিভিত্তিক একটি ঐতিহ্য উদ্ভবের চেষ্টা করছে।

www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের লোকের মতো পূর্ব পাকিস্তানীরা স্থিতি ও অস্থিতি বস্তুর মূল এবং পরিণতি বলে বিশ্বাস করত। কাজেই, তাদের বিবেচনায় 'নিষ্ক্রিয়তা' হল সর্বপেক্ষা নিখুঁত অবস্থা এবং তাদের কাম্যবস্তু। কোনো যন্ত্রকে সঞ্জীবিত করা অথবা দেহে গতি প্রদান করার মধ্যে কোনো তৃপ্তি নেই বলে এখনও তাদের বিশ্বাস। যন্ত্রবিদ হওয়ার চেয়ে কেরানি হওয়াটাই তারা সুখকর মনে করে এটাই সম্ভবত স্বাভাবিক, কারণ অত্যধিক গ্রীষ্ম আর আর্দ্রতা শরীরকে ক্লান্ত করে ফেলে। তাই বিশ্রামকে এত সুখদায়ক এবং চলাফেরাকে এত অশান্তিকর মনে হয় যে, এখানকার অধিবাসীরা পদার্থবিদ্যার চেয়ে অধিবিদ্যার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। সন্ন্যাসী, আলেম ও পুরোহিতশ্রেণীর আবির্ভাবের কারণ হচ্ছে জীবনের প্রতি এ ধরনের মনোভাব। এই প্রবণতাকে পরাভূত করার একমাত্র উপায় হল—দেশে এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করা—যাতে দেশের প্রত্যেকটি লোক তাদের শ্রম অনুযায়ী উপার্জন করতে পারে।

ভারত-পাকিস্তান বিরোধ

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সশস্ত্র বিরোধের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে এক নূতন পরিবর্তন এসেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং আকাশপথের যুদ্ধে তারা যে সাহস এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি আস্থাবান হয়েছে। যুদ্ধের সময় থেকেই তারা অধিকতর আত্মনির্ভর হয়েছে এবং নিজেদের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা ও দায়িত্বের দাবি জনসাধারণের কাছে আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দুই দশক ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা গর্ব করে বলত যে, তারা যদি পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা না করত তা হলে বহুপূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানকে ভারত গ্রাস করে নিত। সব-সময়ই তাদের ধারণা ছিল যে, ভারত কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু তাদের সেই ভুল তারা উপলব্ধি করল যখন ভারত পাঞ্জাব আক্রমণ করে লাহোর থেকে কামানের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌঁছাল এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সেখান থেকে হটানো গেল না। অবশ্য ভারতীয় সৈন্যরাও আর অগ্রসর হতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তান কেন আক্রান্ত হল না, একথা ভেবে কিছু লোক আশ্চর্য হয়ে যায়। বিদেশী কূটনীতিকের ধারণা, এর কারণগুলি হল : (১) সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করা যায়নি যেহেতু বর্ষাকালে ভারী ট্যাঙ্ক পূর্ববাংলায় চালানো সম্ভব নয় ; (২) পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের অর্থ হত উভয়বঙ্গের মধ্যে বিপুলসংখ্যক শরণাগতদের গমনাগমন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রজ্বলন—যার ফলে উভয় বঙ্গের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত; (৩) নাগা, মিজো আর পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝখানে পড়ে আমাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হবার সম্ভাবনা ; (৪) নেফার, সিকিম এবং অন্যান্য হিমাচল রাষ্ট্রগুলিতে বিপদের সুযোগ নিয়ে চীনের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা এবং (৫)

www.nagorikpathagar.org

যে সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকটা ডিভিশনকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রাখা লাভজনক হবে, সেই সময় তাদের পূর্বাঞ্চলে দখলকৃত এলাকা রক্ষার জন্য নিযুক্ত রাখা ভারতীয় যুদ্ধ পরিচালকদের পক্ষে খুবই বোকামির কাজ হত। বিশেষত ভারতীয় বাহিনীকে পূর্ববাংলা থেকে আক্রমণ করার বা ভারতের সরবরাহ ঘাঁটিগুলির উপর বোমা ফেলার মতো পূর্ব পাকিস্তানীদের অবস্থা ছিল না।

বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা

আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রসমূহের বর্ধমান ব্যবহারিক গুরুত্বের ফলে এবং সমাজ ধর্মীয় শাসনমুক্ত হওয়ায় আধুনিক ইতিহাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থানীয় পদগুলিতে বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্রের কার্যালয় এবং শিল্প-নিকেতনগুলিতে বিদ্যমান এই বুদ্ধিজীবীরা একটি দলে পরিণত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যাদের কাছ থেকে দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরা সমাজের চরিত্র এবং নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে মতামত নেবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তা ঘটে ওঠেনি। অধিকাংশ অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবী এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং কৃত্রিম সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পার্থিব উন্নতির সম্ভাবনা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ লোকের চেয়ে নিজেদের অনেক যোগ্য বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের যোগ্যতা হল ঢের কম। তাদের মধ্যে শক্তি এবং দৃঢ়সঙ্কল্পের অভাব রয়েছে। একটি সমস্যার প্রতিটি দিক লক্ষ করার জন্য তার সূত্রের অনুধাবনে আর সক্ষম নয় এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্যতাও তাদের নেই। ঘটনার দিক-পরিবর্তনের অক্ষমতার দরুন বুদ্ধিজীবীরা কষ্টভোগ করে থাকে।

অজ্ঞাত ভয়ের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় হল সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে লোককে যুক্তিবাদী করে তোলা। ভয় থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন শিক্ষাদান, অন্যের মতামত সহ্য করার মতো ধৈর্য এবং সহ-অবস্থানের জন্য সহযোগিতা করা। এই আণবিক যুগে বিশ্বশান্তি অর্জন করা যেতে পারে কেবল মাত্র সহ্যগুণ, সহযোগিতা এবং অপরের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে।

মানুষকে অবশ্যই অভাবমুক্ত হতে হবে, তার থাকতে হবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম জীবনমানের অধিকার থাকবে। খাদ্য, বাসগৃহ, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং চাকুরির নিশ্চয়তা দান করতে হবে তাকে। যতদিন পর্যন্ত মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান থাকবে, ততদিন জগতে কোনো শান্তি থাকবে না। মানুষের বিশ্রাম, অবসর, চাকুরি, খাদ্য, ঔষধপত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং মানুষ যখন অসুস্থ অথবা বৃদ্ধ হয়ে পড়বে তখন তার অবসরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আত্মোন্নতির ক্ষেত্রে মানুষকে প্রতিবন্ধকতার হাত থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

সে নির্ভয়ে এবং অবাধে নিজের চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং তার জ্ঞানের সাধনায় রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো হস্তক্ষেপ হবে না। তাকে অবশ্যই মুক্ত বিবেকের স্বাধীনতা দিতে হবে।

মানুষ হচ্ছে সবকিছুর পরিমাপ, কিন্তু সকল মানুষের মধ্যে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের গুণ সমভাবে বর্তায়নি। অধিকাংশ লোকই তাদের এই সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তারা প্রতিটি প্রশ্নের উপর বিতর্ক না করে বরং অপরের অনুগামী হওয়াকে পছন্দ করে। যুক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার প্রকারভেদ বর্তমান, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বর্তমান ; কাজেই কোনো এক ব্যক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা সমাজের স্বার্থের অনুকূল নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে, সংখ্যাগুরুদের অত্যাচার সমপরিমাণে নিন্দনীয়, একতন্ত্র কোনো সমাধান হতে পারে না, কারণ মনুষ জানোয়ার নয়, সে হচ্ছে যুক্তিবাদী প্রাণী। অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য সচেতন সংগ্রামী জনসাধরণকে যখন উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হবে, তখন শ্রেণীগত যৌথবাদ আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

পাকিস্তানের সৃষ্টি হল এই উন্নতির পথে একটি পদক্ষেপ। ভারতরে মুসলমানরা যেহেতু সংখ্যালঘু, আত্মপ্রতিরোধ ভিন্ন অন্য চিন্তা তারা করতে পারত না। বৃহত্তর মানবতার স্বার্থ অপেক্ষা তারা বেশির ভাগ পশুসুলভ প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হত। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা অশিক্ষা আর মনস্তত্ত্বের অভাবে এই বিরাট পরিবর্তনের কিছুই বুঝতে পারেনি। তারা যে এই জগতের অধিবাসী এবং মানব ইতিহাসে যে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই। এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির অনুরূপ পূর্ববাংলাতেও উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে আইনজীবীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই বলে আজও তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে এটা ঠিক নয়। কারণ আইনজীবীরা পেছনে তাকিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে নতুন দিনের সমস্যার সমাধান খোঁজে—যেমন কোনো মক্কেল তার মামলা নিয়ে তার কাছে আসে, তখন সে আইনের বই ঘেঁটে সে সম্পর্কে নজির দেখতে থাকে। তারপর সে হাল আমলের বিচারকের প্রত্যয় জন্মানোর চেষ্টা করে। বিচারকের উচিত—পঁচিশ বছর পূর্বে তাঁর পূর্বগামী যে রায় দিয়েছেন সেই রায় দেওয়া। অতীতের প্রতি তাকিয়ে আইনজীবীদের অতিরিক্ত সময় নষ্ট করার ঝোঁক আছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আইনজীবীর নেতৃত্ব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শিল্পায়িত সমাজে সে নেতৃত্বদানে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে Technological সমাজে জটিল সমস্যাবলীর সমাধান করছে এমন সব লোকেরা, যারা দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন তথ্যাদির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বিগত বৎসরের হিসাব বা ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফা-নির্ণয়ের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে যা খসড়া করা হয়েছিল, এখন তার কেবল ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অতএব পেশাদারি পরিচালকদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পথের নির্দেশ পাওয়ার জন্য অতীতের দিকে তাকায়। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার তুলনায় ইতিহাস আর ঐতিহ্য তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু Technological যুগের দাবি হল দ্রুত

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং দ্রুত কাজ। অতএব স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠান কিংবা কারখানার জন্য ম্যানেজার বা প্রশাসক নিয়োগ করা এ যুগের পছন্দ।

গণতন্ত্র হল সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির উপযোগী। বিশেষ করে কোনো বিষয়ের উপর সংখ্যাগুরু দলের সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে সে সম্পর্কে কিছু লোককে মতপ্রকাশ, বিতর্ক এবং আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগের গতি দ্রুত। প্রতিটি মূল্যবান এবং ভালমন্দ শোনার সময় নেই বললেই হয়। এ যুগ হল ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ; বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী একনায়কত্ব বেছে নিতে হবে সবাইকে। Aldous Huxley বলেছেন : "যে যুগে জনসংখ্যাকে করা হয়েছে দ্রুততর, প্রতিষ্ঠানকে ত্বরান্বিত এবং জনসাধারণের যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত অধিকতর কার্যকর হচ্ছে, সেখানে কি করে আমরা জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হব? কতদিন পর্যন্ত উত্তর পাবার আশায় আমরা এ প্রশ্ন করতে পারব?

ব্যবসায়ে বাঙালি মুসলমান

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন বেসামরিক বিভাগের সৃষ্টি হয়, তখনই এক্ষেত্রে তাদের প্রথম আগমন হয় এবং 'পারমিট' ও 'লাইসেন্স' বিক্রির মাধ্যমে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে বলে তারা মনে করেছিল। যুদ্ধের সহজাত দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ নেওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই তারা করতে পারেনি। স্বাধীনতার পূর্বে তারা ছিল হয় ঠিকাদার, নাহয় পারমিট বিক্রেতা। কাজেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও তাদের সেদিকে ঝোঁক রয়ে গেল। শুধু এজাতীয় ব্যবসায়ে সুযোগপ্রাপ্তির আশায় তারা কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতাসীন দলের নিকট পারমিট সংগ্রহে সফল না হলে তারা তৎক্ষণাৎ অন্য দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতে লাভের আশায় তাকে জয়যুক্ত করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করে। কালোবাজারি আর মুনাফাখোরিদের এই কার্যপ্রণালী দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করেছে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এখন এসেছে।

শোষক ও শোষিতের দার্শনিক ভিত্তি

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতাই সকল আন্দোলনের উৎস। বিভাগপূর্ব বাংলার চাষীরাই ছিল নিষ্পেষিত শ্রেণী। তাদের উৎপীড়ন করত জমিদার, মহাজন, আইনজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা। দুর্ভাগ্যবশত নিষ্পেষিত লোকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং নিষ্পেষণকারীরা ছিল হিন্দু। এই শ্রেণীসংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধে রূপ নিয়েছিল। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আবার। অস্তিত্ববাদীরা বলবে, মানুষের ইতিহাস হল ঘাটতির এবং ঘাটতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। অভাব যেমন একত্র করতে পারে, তেমনি বিভক্তও করতে পারে। মুসলমানেরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

একতাবদ্ধ হয়েছিল এবং লক্ষ্যে পৌঁছানের পর তারা আবার বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অভাব একতা আনয়ন করে ; কারণ শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব ; এই সফলতার পর অভাব ঐ দলকে বিভক্ত করে ফেলে, কারণ প্রতিটি খণ্ডদলই বোঝে যে, তাদের প্রাচুর্যের পথে অন্তরায় হচ্ছে অপর একটি দলের অস্তিত্ব। অভাব প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করে, আবার প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য বাধ্য করে। মানুষ হয় মানুষের শত্রু।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল কতকগুলি লোকের সমষ্টি, যারা বাহ্যিক নৈকট্যের মাধ্যমে একত্রিত হয়েছে। সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু প্রত্যেকে হচ্ছে প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী।

এর উপর আবার আছে রাজনৈতিক উপদল : শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরা দলে পরিণত হয় যখন তারা নিজেরা সমাজতন্ত্রবাদের নিকট প্রতিশ্রুত হয় অথবা যখন শিল্পপতিরা, বিরাট ব্যবসায়ীরা এবং অন্যান্য কায়েমি স্বার্থবাদীরা যারা একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়ে নিজদের ভার গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিবাদের নিকট অর্পণ করে। "আমাদের বাঁচতে হবে হয় একসঙ্গে কাজ করে অথবা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। অথবা আমাদের একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে"—এই নীতি হল উপদল গঠনের ভিত্তিস্বরূপ।

এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি খণ্ডবিখণ্ড হবার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আর একটি অভিমত আছে যা ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে প্রদত্ত Soekarno-এর এক ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন : "একদিকে স্বাধীনতার জন্য নবউন্মেষিত শক্তি, ন্যায়বোধ এবং অপরদিকে প্রভুত্ব করার পুরাতন শক্তির মধ্যে এই বিরোধটি বিদ্যমান রয়েছে।" এই মনস্তত্ত্বের আর একটি বিশেষ রূপ—যা চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে : "এশিয়া এবং আফ্রিকার নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে যে রক্তাক্ত কাণ্ড, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধ আমরা দেখছি, সেগুলোর জন্য দায়ী হল ঔপনিবেশিক চক্রান্ত ; স্বাধীনতা প্রদান করার পূর্বেই বিরোধের কারণগুলি যেন থেকে যায় তার ব্যবস্থা তারা করে রেখেছিল, যাতে হস্তক্ষেপ করার জন্য তাদেরই ডাকা হয়।"

বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলাদেশ সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। এমনকি, এর বিভাগের পরেও পূর্ববাংলাকেই সবসময় পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অঞ্চল বলে মনে করা হত। কিন্তু এই চেতনাবোধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল। কৃষকসমাজ তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত ছিল না; তাদের যেসব নেতারা পরিচালিত করেছেন তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল ছাত্রদল।

সামরিক অভ্যুথ্যান না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হয়নি। অনেকে মনে করেন যে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের সামরিক অভ্যুত্থান বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকদের উপর সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০-এর ফেডারেল শাসতন্ত্রের এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন, পূর্ববঙ্গে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ১৯৫১ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কমিউনিস্ট অনুপ্রাণিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য চীন ও স্টক্‌হল্‌ম গমন, সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন এবং তাঁর চীনসফর, ১৯৫৬ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর রাজকীয় সম্বর্ধনা এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম—এ সবই ছিল পূর্ব পাকিস্তান যে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিযে যাচ্ছে তারই ইঙ্গিত। শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী, মুসলিম লীগপন্থী, আমলা এবং আমেরিকা, যার সঙ্গে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক চুক্তি ছাড়াও রয়েছে দ্বিদলীয় এবং আঞ্চলিক কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তি, পূর্ব পাকিস্তানে এজাতীয় প্রবণতা এদের সকলকেই সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। আইয়ুব সরকার শিল্পপতিদের এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়ে দু'টি নীতি গ্রহণ করেছে :— (১) ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও (২) শিল্পায়নে স্বাধীন প্রচেষ্টা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, ছাত্র-সমাজ যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুত্রকন্যা নিয়ে গঠিত তারাও ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে নানা আন্দোলনের মাধ্যমে, কিন্তু তাদের হয়েছে শ্বাসরুদ্ধ। পৌরায়ন এবং তার ফলস্বরূপ পূর্ত-কাজকর্মের বৃদ্ধি এবং শিল্পায়নের জন্য ভূমিহীন কৃষকদের কর্মসংস্থান অনেক বেড়েছে, কিন্তু এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের এবং ভূমির মালিক কৃষকদের দুর্দশার কথা আমাদের আর মনে পড়ছে না।

শিল্পায়নের সামাজিক সমস্যা ও জীবনের নতুন গতিধারা

শিল্পায়ন পূর্ব পাকিস্তানের নারীসমাজে এক নবচেতনা এনে দিয়েছে। তারা এখন মুক্ত আর প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, প্রাচীনপন্থী লোকেরা সমাজের এই নতুন জাগরণকে ভাল চোখে দেখছে না। জনসাধারণের অশিক্ষিত অংশ সময়সীমা অতিক্রম করে অসদাচরণেও লিপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু নারীসমাজকে সেটা অতিক্রম করতেই হবে। তরুণীরা এখন ঢের বেশি সপ্রতিভ, তাদের কথায় আছে বুদ্ধির ছাপ, তারা যে-কোনো মজলিশকে সহজেই প্রাণবন্ত করতে পারে। আলাপ-আলোচনা বৈঠকে মহিলাদের উপস্থিতি এখন বিশ্বজনীন দাবি হয়ে উঠেছে। আধুনিকতার দাবি হল, তরুণীদের হতে হবে ক্ষীণাঙ্গি, সপ্রতিভ হাসিখুশি ভরা এবং মৃদুভাষিণী। স্বামীর কর্মজীবন গড়ে তুলতে নারীকে প্রেরণা যোগাতে হবে, সমাজকে সাহায্য করতে হবে, গাড়ি চালাতে হবে, সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যমে শারীরিক সৌন্দর্যের অভাবকে পূরণ করতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বে যারা স্কুল-কলেজে পড়ত তারা তাদের পোশাকের আড়ালে দেহকে ঢেকে রাখত, কিন্তু বর্তমানে রেওয়াজ হল দেহকে আবরণমুক্ত রাখা—একে টেডি-প্রবণতা বা অন্য কোনো নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু মেয়েদের ধারণা হল, এতে তাদের সৌন্দর্যই কেবল বাড়ে না, এতে তাদের নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কেও নিজেদের সচেতন করে তোলে।

শহর অঞ্চলে এসব পরিবর্তন বেশির ভাগ লক্ষ করা যাবে। সেখানকার সমাজ

www.nagorikpathagar.org

অধিকতর সঙ্কীর্ণতামুক্ত। কিন্তু যেখানে আমাদের জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগের বাস পল্লীঅঞ্চলে, সেই পল্লীঅঞ্চলে কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। সেখানকার মেয়েদের কোনো ধারণাই নেই কি করে প্রসাধনের সাহায্যে চেহারার উন্নতি করতে হয়। তারা আজ পর্যন্ত নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই করেনি। পরিবর্তন হয়তো আসবে, কিন্তু মনে হয় তা সময়সাপেক্ষ ; কারণ তাদের শহুরে ভগ্নীরা, যারা আধুনিক ফ্যাশনকে অবলম্বন করেছে, তারাই এখনও সুস্থির হয়নি।

কোনো কোনো লোকের মত যে, আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে মার্কিন জীবনযাত্রার ধারা প্রভাবিত করেছে। এতে হয়তো কিছুটা সত্য আছে, কারণ মার্কিনরা একটি নতুন জাতি এবং এশিয়ার অপরিণত বয়স্ক তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের একটি আকর্ষণ বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। মার্কিনদের লৌকিকতাবিহীন আচরণ আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে সম্ভবত আবেদনমূলক। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যে অপরাধপ্রবণতা, তা মার্কিন কিংবা ইউরোপীয় টেডিদের অনুকরণ নয়, সেটা সমৃদ্ধিশালী শিল্পায়িত সমাজের অংশবিশেষ। যান্ত্রিক যুগ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে বাধ্য এবং টেডিবাদ সম্ভবত একপ্রকার চিত্তবিনোদন কিংবা জীবনের পোতাশ্রয়হারা যুবকদের জন্য একপ্রকার মুক্তি।

পারিবারিক জীবন, বিবাহ, অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং উৎসবাদি-সংক্রান্ত প্রাচীন প্রথার অনেকখানি পল্লীসমাজে বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ বিবাহ পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত সুখ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কারণে বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু শহরাঞ্চলে পরিবর্তন ঘটছে। প্রাচীন যৌথ পরিবার প্রথার এখন অবসান হয়ে, তার বদলে একক পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতা গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পিতামাতা আর সন্তানদের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছে। এজাতীয় পরিবর্তন শহরাঞ্চলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পরিলক্ষিত হচ্ছে, কারণ শহুরে স্ত্রী, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরের স্ত্রী হোক, কিংবা কারখানার শ্রমিকের স্ত্রীই হোক, প্রায়ই লাভজনক পেশায় নিযুক্ত থাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে সে আর সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধীন নয়। বেতনভুক্ত চাকুরিরত মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী। তারা চায় অবসর সময়কে নিজেদের ইচ্ছামতো ভোগ করতে।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর শিল্পায়নের দরুন বর্তমান যুগের তরুণেরা পায়ের নিচের মাটি হারিয়ে ফেলেছে। পুরাতন মূল্যবোধ আর নেই, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে অন্তর্হিত। আজকাল পিতামাতা তাদের সন্তানদের সামাজিক 'মর্যাদা ও শান্তি' দিচ্ছে না, তারা শুধু তাদের শিক্ষিত করে তোলে যাতে নিজ চেষ্টায় তারা জীবনসংগ্রামে অংশ নিতে পারে। অথচ তরুণরা হচ্ছে মর্যাদার প্রত্যাশী এবং এই ইচ্ছাই অপ্রাপ্তবয়স্কদের পথ দেখায় অপরাধমূলক কাজের। এদের প্রবণতা হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করা, সক্রিয় আক্রোশ আর বিদ্বেষ, ঘৃণা আর ব্যঙ্গ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর তুচ্ছতামূলক মনোভাব এর অপরিহার্য উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মত বিদ্যমান। তার একটি

www.nagorikpathagar.org

হল—'সংস্কৃতির বিরোধ'। বিবিধ প্রকৃতির বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের মানুষদের রয়েছে বিচিত্র এবং বেখাপ্পা আদর্শ আর রীতি এবং সেইসব আদর্শ ও রীতিগুলির অসঙ্গতি রয়েছে স্কুল-কলেজে এবং দেশের শাসনব্যবস্থার আদর্শ ও রীতির সঙ্গে। এসব সংঘর্ষমূলক সংস্কৃতির বিশৃঙ্খলার মধ্যে তরুণরা বিভ্রান্ত আর হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জগৎ অগণিত দ্বন্দ্ব ও আদর্শের কবলগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তাদের কোনোরূপ সুস্পষ্ট কর্তৃত্ববাচক আদর্শ দিতে পারছে না। অতএব, তারা কাউকে সম্মান করছে না, কারুর অঙ্গীভূতও হচ্ছে না। আইনসঙ্গত শৃঙ্খলার প্রতি কোনোরূপ সম্মান তার মধ্যে জাগে না ; কারণ, তা হল এমন একটি সংস্কৃতির প্রতীক যার কোনো সামাজিক জগতে সমর্থন পাওয়া যাবে না। কাজেই সে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠেছে।

আর একটি মতবাদ হল 'পুরুষালি প্রতিবাদ'। সাধারণত ছেলেদের অপরাধ মেয়েদের তুলনায় চতুর্গুণ। এ অপরাধপ্রবণতা শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশি মাত্রায় প্রতীয়মান। সেখানে পিতামাতারা সুস্পষ্ট পার্থক্যমূলক এবং পুরুষোচিত কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। আবার পাড়ার ভিতর ও বাহিরের শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেদের স্বাধীনতা অনেক বেশি। যেহেতু সম্ভবত শ্রমিক-অধ্যুষিত পাড়াগুলির সহিত উঁচুতলার আবাসিক পাড়াগুলির ঘেঁষাঘেঁষি হতে পারে এবং যেহেতু দৈনন্দিন চলাফেরার ক্ষেত্রে এসব ছেলেদের স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যমূলক কাজকর্ম লক্ষ করা সম্ভব, অতএব তারা নিশ্চিতভাবে গড়ে তুলছে তাদের পুরুষালি ভাবকে। এটা খুব সম্ভব যে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের চেয়ে অতি শীঘ্র অবিচ্ছেদ্যভাবে নিজেদের পুরুষোচিত বলে গণ্য করতে সক্ষম হবে।

সামাজিক কাঠামোতে পরিবারের স্থান—বিশেষ করে অন্যান্য পরিবারের বিপরীতে, আর মর্যাদা কিছুমাত্রায় নির্ধারণ করে থাকে তার অভিজ্ঞতা এবং সমস্যাগুলিকে, যেগুলির সম্মুখীন হতে হবে পরিবারের সব লোককে পরিবারের বাহিরের লোকের সঙ্গে আচরণ করার সময়। পরিবারের ভিতরে শিশুর যে অভিজ্ঞতা বিশেষত তার ব্যক্তিত্বের উপর পরিবারের প্রভাবের এবং পরিবারের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তার যে অভিজ্ঞতা, এ দু'টির মধ্যে যে সম্পর্ক তা সময়-সময় তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

যেসব ছাত্র কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক নেতা, তারাও অপরাধপ্রবণ, যেহেতু তাদের এই নেতৃত্বের পেছনে সেই একই 'মর্যাদার চেতনা' রয়েছে। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে, বিশেষ করে ছাত্রীদের চোখে নায়ক হবার জন্য তরুণদের সহজাত প্রবৃত্তিই নির্ধারণ করে থাকে এজাতীয় অপরাধীদের ক্রিয়াকলাপ। অতি মেধাবী ছাত্র, ভাল খেলোয়াড় কিংবা ছাত্রনেতা হওয়ায় ব্যর্থকাম হলে সে সম্ভবত দুর্দান্ত প্রকৃতির হবে এবং অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে বেপরোয়া একটা কিছু করে বসবে। সে হয়তো তার মোটরসাইকেল বা গাড়ি চালাবে ভীষণ বেগে, দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আটকিয়ে রাখবে যানবাহন চলাচল অথবা কোনো মহিলাকে বিনা কারণে অপমান করে বসবে। রাস্তার দুরন্ত ছেলেরা পুরোভাগে থাকবে ধর্মঘটের দিনে ; মিছিল, বিক্ষোভের সময় তাদের দোকান লুট করার কিংবা যানবাহন পোড়াবার প্রবণতা হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ বিদ্বেষমূলক ও নেতিবাচক।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় দশকের শিক্ষাব্যবস্থা

একালের অরাজনৈতিক সরকারের সৃষ্ট নতুন বিত্তশালী সমাজ সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিষ্ফল। মৌলিক গুণের অধিকারী কোনো কোনো চিত্রকর, ভাস্কর, লেখক বা স্থপতির কদর নেই তাদের কাছে। লাভের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি ছাড়া কখনোই উৎসাহিত হবে না পুস্তক প্রকাশনার প্রতিষ্ঠান খোলায়, থিয়েটারের হল বা ধ্রাপদী সঙ্গীতের সমর্থক তারা নয়। তারা এমনকি পুস্তক অথবা পুরাতন জিনিসের সংগ্রাহকও নয়।

স্বাধীনতার পর শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি হয়েছে। অধ্যাপক, শিক্ষক, যাঁদের বেশির ভাগই হিন্দু ছিলেন, তাঁরা দেশত্যাগ করেছেন। বেশ কিছুসংখ্যক স্কুল-কলেজ বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। যেগুলো টিকে থাকল সেগুলোকে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল। স্বাধীনতা জীবনের এত পথ খুলে দিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের আকর্ষণ করতে শিক্ষায়তনগুলি একরূপ অসমর্থ হল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকেরা, যারা ঐসব নতুন পথে ঠাঁই পেল না, তারাই অনিচ্ছাসত্ত্বে যোগ দিল শিক্ষার কাজে, এ পেশার প্রতি অনুরাগবশত নয়—জৈব কারণে। ফলে গবেষণা ও শিক্ষাদানের পরিবর্তে তারা অধিকতর উৎসাহ দেখাচ্ছে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পদোন্নতি আর বেতন বৃদ্ধি করে নেওয়ার ব্যাপারে। এটা দুঃখজনক, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে গত্যন্তর নেই।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবল আকার ধারণ করেছে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এর ফলাফল যত বেশি ক্ষতিকর হয়েছে, তেমন আর কিছুতে নয়। শিক্ষক এবং পরীক্ষকদের বিশ্বাস করা যদি সম্ভব না হয়, তবে পরীক্ষার 'হলে' অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য ছাত্রদের উপর দোষারোপ করা বৃথা।

পাকিস্তান সরকার বিশেষত তার শিক্ষাবিভাগের মধ্যে কল্পনা আর ধারণার অপ্রতুলতা বিদ্যমান ; তাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নকারী হল অনভিজ্ঞ নির্বোধ কর্মচারীরা, যারা শূন্যগর্ভ ভাবের সৃষ্টি করে তাকে ইসলামি নাম দিয়েছিল। সর্বপ্রথম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উর্দু এবং আরবিকে স্কুলে বাধ্যতামূলক করার জন্য, আর নিম্নশ্রেণীগুলিতে ইংরেজি শিক্ষাদান বন্ধ রাখার জন্য। কয়েক বৎসর যাবৎ যাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকারক এই পরীক্ষা চালানোর পর এই পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হল। পরবর্তী চমৎকার পরিকল্পনা হল উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং সরকারি ভাষারূপে গণ্য করা। করাচি-দেবতাদের বেদিমূলে কয়েকজন ছাত্র বলি দেওয়ার পর এই নির্বোধ ধারণা পরিত্যক্ত হল। আরবি হরফে বাংলা লেখার পরিকল্পনা হল। তার পরীক্ষা এখনও চলছে, কিন্তু যারা এই পরিকল্পনার জনক তারা এখন জনসাধারণের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। তবুও এ ধারণা সক্রিয়ভাবে বর্তমান রয়েছে কিছু অবাঙালি বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কে।

পূর্ববাংলার ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; তার কারণ পুরাতন শিক্ষকদের দেশত্যাগ আর সরকারি শিক্ষা বিভাগের তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা সময়-সময় যেসব নির্বোধ পরীক্ষা করে এসেছেন তার জন্যে। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তুষ্টিবোধ জেগেছে।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ববাংলার তরুণদের এখন প্রয়োজন হল আরও বেশি বইপুস্তকের এবং বুলেট ও জেল প্রতিহিংসার তুলনায় ঢের বেশি স্কুল আর অপক্ষপাতিত্বের। তাদের প্রয়োজন আরও বেশি সুযোগ সেইসব গুণচর্চার যা পুরুষদের করবে আরও মনুষ্যোচিত আর মেয়েদের করবে আরও সুন্দর, মনোহর।

পাঁচসালা পরিকল্পনার মাধ্যমে যখন সমস্ত দেশের উন্নতিসাধন করা হচ্ছিল, শিক্ষা রয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণরূপে তার আওতার বাইরে। পূর্ববাংলা সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমনকি কখনও চেষ্টা করেনি দেশে চাকুরির অবস্থা কিরূপ তা জানার জন্য। তারা গ্রাজুয়েট উৎপাদন করে চলেছে—সাধারণ, ডাক্তারি, প্রকৌশলিক ইত্যাদি। ঐসব গ্র্যাজুয়েটরা কোথায় খাপ খাবে তা বোঝার জন্য কখনও চেষ্টা করেনি। পরিকল্পনাকারীরা চাইলেন বিজ্ঞান গ্র্যাজুয়েটদের চেয়ে অধিকসংখ্যক প্রায়োগিক কর্মী ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বেরিয়ে আসছে বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট, প্রায়োগিক বিদ্যায় শিক্ষিত লোক নয়। সরকার খুলতে চায়নি যথেষ্ট সংখ্যায় প্রয়োগিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু তারা ধার চাইল বিদেশের কাছে এ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের। যখন কোনো পরিকল্পনাকালের মধ্যে কোনো বেসামরিক ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন হবে না, প্রকৌশলিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে শত শত ইঞ্জিনিয়ার, সরকার তখন বুঝতে পারবে না কি করে সমাধান করতে হবে বেকারসমস্যার—যদিও তখন চাকুরির সম্ভাবনা বর্তমান থাকবে। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার জেনে ছাত্ররা তাদের আবেগ প্রদর্শন করে থাকে, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাদের চুপেচুপে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

যখন পশ্চিম পাকিস্তানে যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে তাগিদ এবং উৎসাহ দেওয়া হয় সমাজের শিল্পায়ন আর আধুনিকীকরণের জন্য পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে, তখন পূর্ব পাকিস্তানীদের অবিরত বলা হয়ে থাকে প্রথম চার খলিফার অনুরূপ সৎ মুসলমান হবার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায়োগিক এবং প্রকৌশলিক বিদ্যার উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হচ্ছে, আর পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামি শিক্ষা এবং ইসলামি জীবনযাত্রার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান যুগের যে সমাজ জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি করে না, তার তরুণদের জন্য প্রায়োগিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে অসমর্থ সে সমাজ পেছনে পড়ে থাকবেই। প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তান স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রায়োগিক কর্মী, সুদক্ষ কর্মচারী আর কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করতে হবে। আইয়ুব সরকারের শোষণ ও শাসন স্থিতিশীল করার জন্য উন্মত্ত ধর্মীয় নেতা আর প্রতিষ্ঠানগুলিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সাফল্যজনকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তাদের পূর্ব পাকিস্তানে উৎসাহিত করা হয়েছিল। মনে হয়, একই সরকার দেশের দু'অঞ্চল সম্বন্ধে দু'টি নীতি অবলম্বন করেছিলেন। পূর্ববাংলার ছাত্র এবং তরুণদের মধ্যে ব্যর্থতার মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সহায়তায় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন শুধু সুযোগ দিল সেখানকার যুবকদের কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বেকারত্বের গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করল।

www.nagorikpathagar.org

জায়গা খালি না থাকায় বহু ছাত্র ভর্তি হতে পারেনি। সদাবর্ধমান বেকারসমস্যা, শিক্ষালাভের সুযোগের অভাব, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর কর্তৃত্বস্থাপনের প্রচেষ্টা, এখানকার লোকদের বেপরোয়া করে তুলেছে। পূর্বাপেক্ষা অধিক খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে দেখে তারা সরকারকে শোনাতে চায় সেই কথা—যা একদা Edmund Burke বলেছিলেন তাঁর দেশের সরকারকে :

"যখন তোমরা সম্পূর্ণ করবে তোমাদের দরিদ্রকরণের পদ্ধতিকে, প্রকৃতি চলতে থাকবে তার গাতানুগতিক পথ ধরে। তা হলে দুর্দশার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় অসন্তোষ। সকল রাষ্ট্রের ভাগ্যেই আছে সঙ্কটময় মুহূর্ত, এখন যারা তোমাদের সমৃদ্ধিকে সহায়তা করার পক্ষে অতিশয় দুর্বল তারা যথেষ্ট সবল হয়ে উঠবে তোমাদের ধ্বংসসাধন সম্পূর্ণ করার জন্য। তোমাদের প্রজাদের দুর্দশাগ্রস্ত করে ফেলার অধিকার তোমাদের আছে কি না আমার প্রশ্ন তা নয়, কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করাই কি তোমাদের স্বার্থ নয়?"

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

(ক)

১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোরে গৃহীত মুসলিম লীগের প্রস্তাব যা পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে পরিচিত :

(১) "শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগস্ট, ১৭ই এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর এবং ২২শে অক্টোবর ও ১৯৪০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটি যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার প্রতি অনুমোদন ও সমর্থন জ্ঞাপন করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন জোরালোভাবে পুনরাবৃত্তি করছে যে, যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত যে পকরিকল্পনাটি ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত তা এদেশের স্বাতন্ত্র্যসূচক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং অপ্রযোজ্য এবং মুসলিম-ভারতের পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

(২) অধিকন্তু এই অধিবেশন আরও জোরালো মন্তব্য লিপিবদ্ধ করছে যে, ১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে বড়লাট মহামান্য ইংলন্ডেশ্বরের সরকারের পক্ষে যে বিবৃতি দিয়েছেন—বিশেষ করে ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে—যে ভিত্তির উপর ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন প্রণীত—তা পুনর্বিচার করা হবে বলে যে আশ্বাস দিয়েছেন, তাতে এ সম্মেলন বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট এমন কোনো গঠনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য হবে না, যা নতুন চিন্তাধারার উপর প্রণীত হবে না অথবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(৩) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এই সাধারণ সভা সর্বদিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাব উত্থাপন করছে যে, যে গঠনতন্ত্রে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলসমূহে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল ভৌগোলিক এলাকায় প্রদেশগুলির মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কিছুটা রদবদল করে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং সেসব আঞ্চলিক দেশসমূহের প্রদেশগুলিও হবে স্বায়ত্তশাসিত—এ মূল ভিত্তি মেনে না নেয়া হবে, তা কিছুতেই কার্যকর হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

এবং ঐসব অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থসমূহের সেসব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত কার্যকর রক্ষাকবচ থাকবে না বা ভারতে বা যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানেও উপরোক্ত ব্যবস্থা তাদের জন্যে থাকবে না, তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

অধিকন্তু এ অধিবেশন কার্যকরী কমিটিকে এ ক্ষমতা প্রদান করছে যে, ইহা যেন উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এমন একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে যাতে ব্যবস্থা থাকবে পরিশেষে স্ব স্ব অঞ্চল কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করার, যেমন—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অন্যান্য বিষয়।"

(খ)

১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট পাকিস্তানের গণপরিষদে কায়েদে আযম এম. এ. জিন্নাহ্ সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ :

"জনাব সভাপতি, ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়গণ,

এই সার্বভৌম পরিষদের পক্ষে যে মহত্তম সম্মান প্রদান সম্ভব, সেই সম্মানে আমাকে ভূষিত করার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যাঁরা আমার কাজের প্রশংসা করে বক্তৃতা করেছেন এবং আমার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য করেছেন, আমি সেই সমস্ত নেতাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এই গণপরিষদকে পৃথিবীর মধ্যে একটি আদর্শ হিসাবে হাজির করব। গণপরিষদের দুটো কাজ—(১) আমাদের পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ, (২) পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার অনুরূপ একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম পরিষদরূপে কাজ করে যাওয়া। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার একটি সাময়িক গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এই উপমহাদেশে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং স্থাপন করার পরিকল্পনা যার জন্য সম্ভব হয়েছে, সেই অভূতপূর্ব ঘূর্ণিবাত্যাসদৃশ বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে শুধু আমরা নই—সমগ্র বিশ্ববাসী অবাক হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিপ্লবের নজির নেই। সর্বপ্রকার জাতি-অধ্যুষিত এই বিশাল উপমহাদেশকে এক বিরাট অজ্ঞাত এবং অতুলনীয় পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা একে শান্তিপূর্ণভাবে অর্জন করেছি।

www.pathagar.com

এই পরিষদে আমাদের প্রথম কাজ সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি কোনো সুস্থ মত দিতে পারছি না, তবে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলব। প্রথম এবং সর্বপ্রধান বিষয় যার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাচ্ছি, তা হল—আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনারা এখন একটি সার্বভৌম বিধান পরিষদ এবং তার সকল ক্ষমতার অধিকারী।

এই পরিষদ আপনাদের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছে—তা হল কিভাবে আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমি যে মন্তব্য প্রথম করতে চাই তা হল, আপনারা নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সরকারের প্রথম কর্তব্য আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যা দ্বারা নাগরিকদের জান, মাল, ধর্মবিশ্বাসের নিরাপত্তাবিধান রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টি যা আমার মনে উদয় হচ্ছে তা হল, যেসব অতি বড় বড় অভিশাপের দরুন দেশ দুর্দশা ভোগ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল ঘুস নেয়া ও দুর্নীতি। আমি অবশ্য বলছি না যে, অন্যান্য দেশগুলি এ অভিশাপ থেকে মুক্ত, কিন্তু আমার ধারণা আমাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। এটা বড়ই দুঃখজনক। একে আমাদের অবশ্যই দমন করতে হবে লৌহহস্তে ; আমি আশা করি, যতশীঘ্র সম্ভব যাতে এই পরিষদ তা করতে পারে—তার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন আপনারা।

কালোবাজারি হচ্ছে আর একটি অভিশাপ। হ্যাঁ, আমি জানি, কালোবাজারিরা প্রায়ই ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ করে। তাদের বিচার বিভাগীয় দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, কিংবা কোনো কোনো সময় কেবলমাত্র জরিমানা করা হয়। আমরা প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে আছি খাদ্য ও জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর ঘাটতির মুখোমুখি। এই সময়ে এই দানবের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। যে নাগরিক কালোবাজারের কারবারি, তার অপরাধ বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অপরাধের চেয়েও বড়। এইসব কালোবাজারিরা হচ্ছে প্রকৃতপ্রক্ষে চতুর এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। তারা যখন কালোকালোবাজারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত, কারণ তারা খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের সম্পর্কিত আইনগঠিত ব্যবস্থাদিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে এবং ব্যাপকহারে অনশন, অভাব, এমনকি—মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

পরবর্তী যে বিষয়টি আমার মনে হচ্ছে সেটা হল স্বজনপোষণ ও দালালি। এটি আমাদের উপর উত্তরাধিকারসূত্রে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাল-মন্দ অন্যান্য বহু বস্তুর সঙ্গে এসে পড়েছে এই পাপ। এই পাপকে ধ্বংস করতে হবে নির্মমভাবে, আমি একথা সুস্পষ্ট করে বলতে চাই—দালালি, স্বজনপ্রীতি দ্বারা কিংবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আমাকে প্রভাবিত করা, এজাতীয় কোনো কাজ আমি কখনোই বরদাস্ত করব না। যেখানেই দেখব এজাতীয় আচরণ বিদ্যমান রয়েছে, তা উচ্চ, নিচ যে স্তরেই হোক না কেন, আমি নিশ্চয়ই সমর্থন করব না।

আমি জানি, এমন সব লোক আছেন, যাঁরা ভারতবিভাগ এবং পাঞ্জাব ও বাংলা-বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং বিপক্ষে বহু কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু

www.pathagar.com

এখন একে যখন গ্রহণ করা হয়েছে, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল বিশেষ আনুগত্য-সহকারে একে মেনে নেওয়া এবং যে চুক্তি এখন চরম এবং আমাদের সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, সেই অনুসারে যথাবিহিত আনুগত্যের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে, যা সংঘটিত হয়েছে—তা অভূতপূর্ব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যা করা হয়েছে তার বিপরীত অন্য কিছু করা সম্ভব এবং সুসাধ্য ছিল কি না। উভয় পক্ষেই বিভাগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ভারত এবং পাকিস্তানে এমন সব দলের লোক আছে যারা একে হয়তো মেনে নিতে রাজি হবে না, হয়তোবা পছন্দ করবে না, কিন্তু আমার বিবেচনায় এ ছাড়া অন্য কোনো সমাধান ছিল না এবং আমি নিশ্চিতভাবে জানি, ভবিষ্যতের ইতিহাসও এর সপক্ষে রায় দেবে। অধিকন্তু যতই আমরা এগিয়ে যাব, প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে এটাই ছিল ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। অখণ্ড ভারতের কোনো ধারণা কখনও কার্যকর হতে পারত না এবং আমার বিবেচনায় আমাদের এগিয়ে দিত ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে। এ অভিমত সত্য কি অসত্য, তা ইতিহাস বিচার করবে। সে যা-ই হোক, দেশ বিভাগের সময় সংখ্যালঘুদের পাকিস্তান বা ভারত থেকে চলে যাবার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু এ ছাড়া ছিল না অন্য কোনো সমাধান। এখন আমরা কি করব? যদি আমরা মহান পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে চাই, আমাদের সম্পূর্ণ এবং একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে হবে জনসাধারণ বিশেষত গরিবদের মঙ্গলসাধনের জন্য। আপনারা যদি একে অপরের সহযোগিতায় কাজ করেন অতীতের স্মৃতি ভুলে, আপনাদের জয় অনিবার্য। যদি নিজেদের অতীতকে আপনারা বিস্মৃত হয়ে এমন মনোভাব নিয়ে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে এমন এক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে পারেন, তা হলেই আপনারা উন্নতি করতে পারবেন।

এর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে আমি অপরাগ। ঐ মনোভাব নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত এবং ক্রমে ক্রমে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে সমস্ত জটিলতা অন্তর্হিত হবে। বস্তুত যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলব, এটাই হচ্ছে মুক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, এগুলি না থাকলে আমরা বহু পূর্ব হতে থাকতে পারতাম একটি স্বাধীন জাতি। সকলের স্মরণ রাখতে হবে একটি শিক্ষা—আপনারা স্বাধীন, আপনাদের স্বাধীনতা রয়েছে আপনাদের মসজিদে-মন্দিরে যাওয়ার, অথবা আপনাদের সম্মুখে কোনো বাধা নেই এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্য কোনো ভজনালয়ে যাবার। আপনি যে-কোনো ধর্ম, কিংবা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, তার কোনো সম্পর্ক নেই রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারের সঙ্গে। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, কিছুদিন পূর্বে আমাদের অবস্থার তুলনায় ইংল্যান্ডের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টরা পরস্পর নির্যাতন করত পরস্পরকে। এমনকি—এখন পর্যন্ত এমন কতকগুলি রাষ্ট্র বিদ্যমান, যেখানে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিকূল পক্ষপাতিত্ব করা হয় এবং বাধা-নিষেধও আরোপ করা হয়। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, আমরা যাত্রা শুরু করছি না সেই যুগে। যে যুগে আমাদের যাত্রারম্ভ,

www.pathagar.com

তাতে নেই কোনোরূপ পার্থক্যমূলকতা, কোনোরূপ পার্থক্য নেই এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের, এক জাতি বা ধর্মের সঙ্গে অন্য জাতি বা ধর্মের। কালক্রমে ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল ; তাদের পালন করতে হয়েছিল স্বদেশের সরকার কর্তৃক তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই অগ্নি-পরীক্ষা তারা অতিক্রম করেছিল ধাপে ধাপে। আজ ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অস্তিত্ব নেই, যা রয়েছে তা হল প্রত্যেক ব্যক্তিই হল নাগরিক, গ্রেট ব্রিটেনের সমতুল্য নাগরিক এবং তারা সকলেই হচ্ছে এক জাতির সদস্য।

এখন আমার মতে এই উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রাখতে হবে আমাদের আদর্শ হিসাবে এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে, এমন এক সময় আসবে, যেদিন হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে অবশ্য নয়, কারণ তা হল প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তা হবে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক অর্থে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের সময় আর অধিক নিতে চাই না। আপনারা যে সম্মান আমাকে দান করেছেন, সেজন্য পুনরায় আপনাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। ন্যায়-বিচার আর অপক্ষপাতমূলক নীতির দ্বারা আমি সর্বদা পরিচালিত হব, রাজনীতির ভাষা অনুযায়ী কোনোপ্রকার বিরূপ মনোভাব বা বিদ্বেষ অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব এবং নিজের লোকের প্রতি আনুকূল্যের দ্বারা নয়। যে নীতি আমাকে পথ প্রদর্শন করবে—তা হল ন্যায়বিচার এবং পূর্ণ অপক্ষপাতিত্ব। আমার নিশ্চিত ধারণা, আপনাদের সমর্থন ও সহায়তায় আমি আশা করতে পারি পাকিস্তান হবে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম মহান জাতি।”

www.pathagar.com

ISBN 984 410 297-9
9 789844 102972